কিশোর বিজ্ঞানী

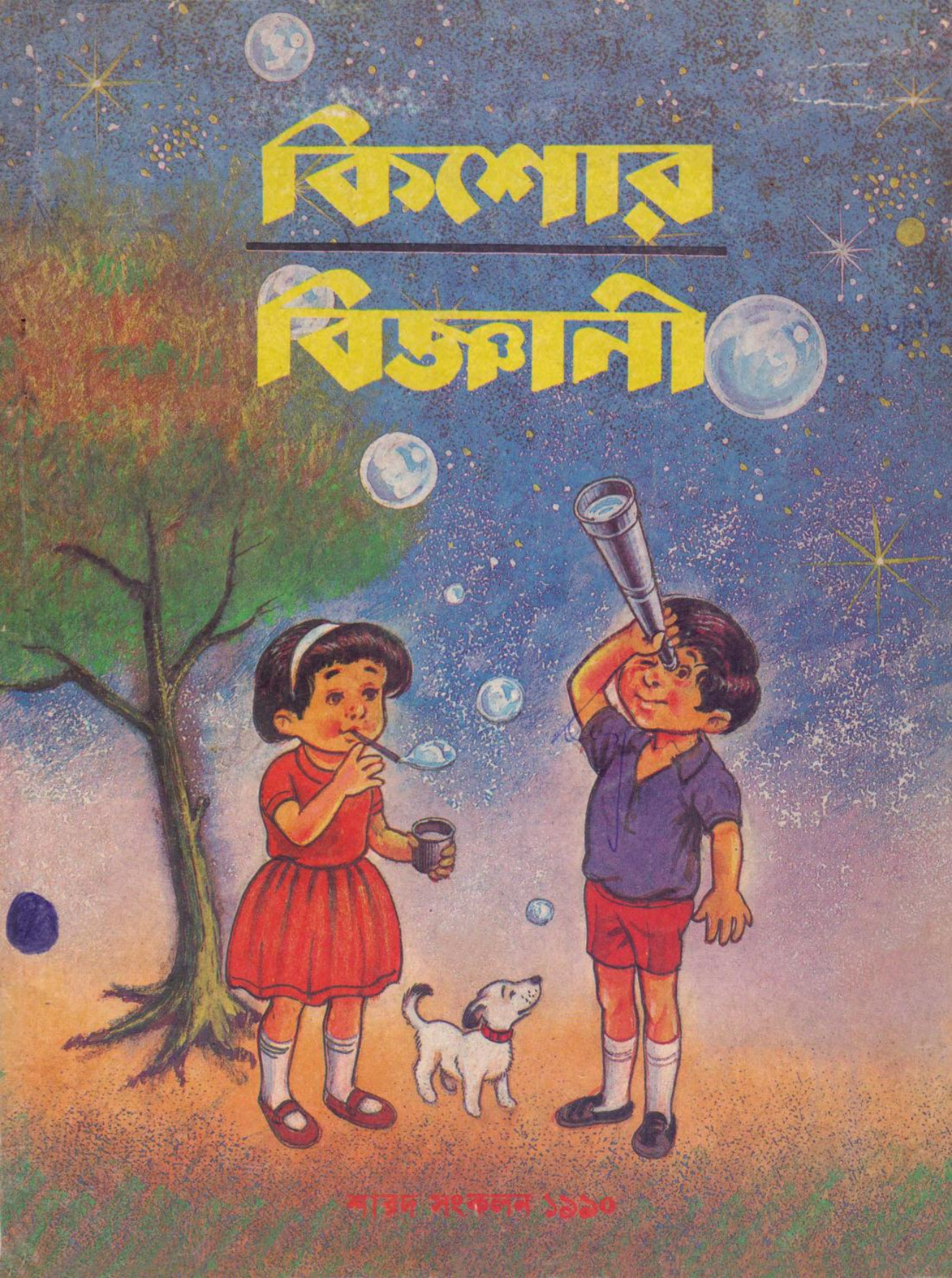

শারদ সংকলন ১৪১০

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন সুজিত কুণ্ডু

এডিট করেছেন অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোন পুরনো পত্রিকার কোন সংখ্যা থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের এই অভিযানে সঙ্গী হতে চান তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

কিশোর বিজ্ঞানী

শারদ সঙ্কলন ১৯৯০

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ প্রকাশনা

সম্পাদক

শ্যামল চক্রবর্তী

সহ-সম্পাদক

মৈত্রী ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক মণ্ডলী

শঙ্কর চক্রবর্তী
শ্রীদীপ ভট্টাচার্য
ধীরেন সুর
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
অমিত চক্রবর্তী
দীপক ভট্টাচার্য
অধৃষ্য কুমার
যোগেন দেবনাথ
নীহার রায়
সোমনাথ ভট্টাচার্য
রাহুল গোস্বামী
দীপা সরকার
সুদীপ্ত সেন

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় /৩

বিশেষ নিবন্ধ

বিজ্ঞান কোন্ পথে যাবে ? □ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/৪

ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ □ শঙ্কর চক্রবর্তী/৬

আকাশ মহাকাশ

রিমোট সেনসিং □ দিলীপকুমার বসু/৮৯

তারারা আমাদের বন্ধু □ রমাতোষ সরকার/১২

উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা □ প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়/৬৭

বিজ্ঞান বিজ্ঞানী সমাজ

গ্যালিলিও ও আধুনিক বিজ্ঞান □ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য/১৮

কিংবদন্তী ধন্বন্তরী □ দীপক ভট্টাচার্য/১৩১

উপেক্ষিত আভোগাড্রো □ প্রবীর গুপ্ত/৯২

ডেভির শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার □ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়/১০২

বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসু □ বিমলেন্দু মিত্র/৭২

মাইকেল গ্রিমেক □ ভবানীশঙ্কর জোয়ারদার/১৩৬

বিজ্ঞান উপন্যাস

মেঘের কোলে ঘরবাড়ি □ কার্তিক লাহিড়ী/[illegible]

আকর্ষণীয়

আরও বিদ্যুতের খোঁজে □ জয়ন্ত বসু/[illegible]

সি-এফ-সি এর কথা □ আলোকময় দত্ত/[illegible]

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
দিলীপ দাস

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে
শ্রীদীপ ভট্টাচার্য কর্তৃক
হেমন্তভবন (৪র্থ তল)
১২, বি বা দি বাগ
কলিকাতা-৭০০০০১
(ফোন ঃ ২০-০০৫০) হইতে প্রকাশিত
এবং
টাইপোগ্রাফার্স অব্ ইণ্ডিয়া,
৩৬ এ, কে জি বসু সরণী,
কলিকাতা-৭০০০৮৫
(ফোন ঃ ৩৬-৩৫৮৯/৩৫-৮৯৬২)
হইতে মুদ্রিত

কেন্দ্রীয় পরিবেশক
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

মূল্য
পনের টাকা

নিরাময় নিয়ে
মশা থেকে রোগ □ নিমাই দত্তগুপ্ত/৭৯
শব্দ চিকিৎসা □ রতন মোহন খাঁ/২২
আন্ত্রিক ঃ আতঙ্ক ও প্রতিকার □ কুণাল দত্ত/১১০
কাস্তেকোষ ও অ্যানিমিয়া □ গোপাল ভট্টাচার্য/১১২

বিজ্ঞান নির্ভর গল্প
গাইয়ে পাহাড় □ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/৮৫
বিনামেঘে বজ্রাঘাত □ ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়/১২৬

বিচিত্র নিবন্ধ
আলো আমার আলো □ প্রদীপ চক্রবর্তী/১০৮
উদ্ভট প্রশ্ন □ সৌমিত্র চৌধুরী/৮৩
খুনীর খোঁজে পোকা □ সুশান্ত গুপ্ত/১১৫
মাথার চুল □ সলিল মিত্র/১৩৫
পাখীর বিচিত্র বাসা □ সুদীপ্ত বসু/১৩৯

বিজ্ঞান কথা ছবিতে
ভণ্ডুলের বিজ্ঞান চিন্তা □ বিমল চক্রবর্তী, দিলীপ দাস/২৪

ব্যতিক্রম নিবন্ধ
বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর □ ধীরেন সুর/১০৫
সত্তরতম জন্মদিনে কবি ও বিজ্ঞানী □ দিবাকর সেন/১০

অনুবাদে বিজ্ঞান গল্প
আঁচড় থেকে শুরু □ রবার্ট শেক্‌লি/অনুবাদ ঃ অনীশদেব/১৪০

ছড়া ও কবিতা
পাঁচ লাইনের পাঁচ পাঁচালী □ ভবানীপ্রসাদ মজুমদার/৭৮
বিজ্ঞানী সমাচার □ শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়/২১
বন্ধু গদাইয়ের পলিউশন চিন্তা □ অরুণাভ মিশ্র/১৩৪
বলতে পারো কেন হয় □ সৈয়দ সাজ্জাদ জাহির আদনান/১৪৩

কিশোর বিজ্ঞানী
শারদ সঙ্কলন ১৯৯০
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ প্রকাশনা

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে একটি পুরো বছর পেরিয়ে গেল গত শরতের এমন দিনে আমরা তোমাদের হাতে 'কিশোর বিজ্ঞানী' তুলে দিয়েছিলুম। তোমরা পড়েছো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তোমাদের ভালো লাগা না লাগার কথা সব জানিয়েছো আমাদের। আমরাও তোমাদের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে ভেবেছি। পরের সব কয়টি 'কিশোর বিজ্ঞানী' তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবার আগে হাজার বার যাচাই করেছি, আমাদের লেখালেখি কতোটা দরকারী হচ্ছে তোমাদের।

সবই কি করে উঠতে পারছি আমরা ? না, পারছিনা। তবে জেনো, আমাদের আন্তরিকতার কিন্তু একটুও অভাব নেই। আর নেই বলেই আমরা খুব খোলামেলা। লেখালেখি নিয়ে যা মনে হয়, জানাতে দ্বিধা করো না।

বিজ্ঞানের কাগজ 'কিশোর বিজ্ঞানী'। পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য যে এতো বিজ্ঞানের বই আমাদের চারপাশে, 'কিশোর বিজ্ঞানী' কখনই তেমন আর একটি বই হতে চায় না। পুরোপুরি পেরে না উঠলেও নিত্য নতুন কথা বলাই 'কিশোর বিজ্ঞানী'র স্বভাব। স্বভাব বাইরের আরও অনেক জরুরী কথা বলা। মাপামাপির হিসেবে ঐ জরুরী কথার কিছু কিছু হয়তো তথাকথিত বিজ্ঞানের কথা নয় কিন্তু এতোটাই জরুরী যে এর উপর আমাদের বেঁচে থাকা না থাকা নির্ভর করছে।

একটা ভালো পরিবেশে, যুদ্ধের উন্মত্ততাশূণ্য পরিবেশে আমাদের কার না থাকতে ইচ্ছে করে! কিন্তু সব ইচ্ছেরই কি এমনি এমনি পূরণ হয় যুদ্ধ বাধিয়ে রাখলে যাদের খুব সুবিধে, তারা যুদ্ধ করবার জন্য বিজ্ঞানকে নানা ছলাকলায় ব্যবহার করতে চায়। বিজ্ঞান বাদ দিয়ে যুদ্ধ ? বলতে পারো ছায়ার সঙ্গে কুস্তি।

বিজ্ঞানকে অবহেলা করে একজনও এখন আধুনিক জীবন যাপনের কথা ভাবতে পারে না। শিল্পের কথা ভাবতে পারে না। সভ্যতা ও সমৃদ্ধির কথা ভাবতে পারে না।

এমনই হাস্যকর ভাবতে যে বিজ্ঞানের অন্যতম অবদান মুদ্রণশিল্পকে পুঁজি করে রাশি রাশি সুসজ্জিত কাগজ আমাদের অপবিজ্ঞান ও অলৌকিকতায় অবিশ্বাসী না হবার উপদেশ দেয়!

তোমরা এখন যারা বড়ো হচ্ছো, যাদের বয়স দশ থেকে আঠারো, এসব কথা তোমরা ছাড়া কে ভাববে ? আগামীদিনের স্বপ্নের পৃথিবীতো তোমাদের জন্যেই। তোমরাইতো সেই পৃথিবী গড়বার স্থপতি।

এই শারদ সংকলনেও আমরা অনেক লেখা সাজিয়ে গুছিয়ে দিলাম। শারদ ছুটির দীর্ঘ অবকাশে নিশ্চয়ই পড়া হয়ে যাবে। মতামত জানিও, আর মতামতই বা কেন শুধু দুচার কলম লিখবার জোর ও সাহস তোমাদেরতো অনেকেরই আছে। দেখিয়ে দাও একবার।

বিজ্ঞান কোন পথে যাবে?

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমরা ভালোই বলি বা মন্দ বলি—আমরা চাই আর নাই চাই—একটা কথা না-মেনে উপায় নেই। বিজ্ঞান আজ আমাদের জীবনে এমন জায়গা জুড়ে যে তা থেকে পিছু হটবার সত্যিই কোনো পথ নেই। এমন লোক অবশ্যই থাকতে পারেন যিনি কিনা বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ করবেন। অনেকে প্রকাশ করেছেন। এবং তার একটা বড়ো কারণও অস্বীকার করে লাভ নেই। এই বিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ মানুষের সামনে একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করেই আজ মানুষ এমন সব ভয়াবহ মারণাস্ত্র তৈরি করেছে যে চোখের পলকে পুরো পৃথিবীটাকেই ছাই করে দেওয়া যায়। পারমাণবিক মহাস্ত্র। তাছাড়া, জীববিজ্ঞানের কথাও আছে। রসায়ণের কথাও আছে। জীববিজ্ঞানীদের গবেষণা অবলম্বন করেই এমন অস্ত্র তৈরি করা আজ সম্ভব যা দিয়ে লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে দারুণ মহামারী সৃষ্টি করা যায়। তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়া হয়তো অসম্ভব। রসায়ণ বিজ্ঞানের আবিষ্কার ভাঙিয়েও রকমারি বিষাক্ত গ্যাস বা অ্যাসিড্-বৃষ্টির কথাও শোনা যাচ্ছে। তারও সর্বনেশে ফলাফলের সামনে পুরাণে প্রসিদ্ধ মারণাস্ত্রগুলোরও মাথা হেঁট হবার যোগাড়। কিন্তু আজকের অবস্থাটা পুরাণের কল্পনার মতো নয়। অতি বড় বাস্তব।

এই সব রকমারি বিভীষিকার কথা ভেবে আজকের দিনে কেউ কেউ বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে আতঙ্কিত। তাঁদের মতে মানুষের কল্যাণের কথা ভাবলে মানতে হবে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এতোখানি বাড়াবাড়ি না-হলেই বরং ভালো হতো। আসলে কিন্তু ফেরবার পথ নেই। বিজ্ঞান এগুচ্ছে এবং এগিয়ে চলবেই। হঠাৎ তার গতিপথ বন্ধ করে পিছু হটবার কোনো উপায়ই নেই। এবং দরকারও নেই।

কেননা, পুরো ব্যাপারটার অন্য একটা দিক আছে। তার কথা ভুলে গিয়ে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা ভেবে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকবার মানে হয় না। বিজ্ঞানের যে-অগ্রগতি আজ মানুষের সামনে অতি-বড়ো আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে ঠিক সেই অগ্রগতিই সৃষ্টি করেছে কল্পনার অতীত এক কল্যাণের সম্ভাবনা। এই অগ্রগতিই আজকের দিনে চোখের পলকে পৃথিবীতে একেবারে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারে। চোখের পলকে মানুষকে অভাব-অনটন, দুঃখ-দৈন্য, রকমারি মারাত্মক রোগভোগের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগে কলকারখানা থেকে যানবাহন পর্যন্ত সর্বত্রই অসাধ্য-সাধন সম্ভব। জীববিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ যেখানে পৌঁছেছে

চাষের ক্ষেত থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত সর্বত্রই একেবারে অঘটন ঘটাতে পারে—এমনই কল্যাণসাধন সম্ভব করতে পারে যে অতিবড়ো কল্পনাও তার নাগাল পাবে না। দীর্ঘ তালিকা তৈরী করা যায়। কিন্তু দরকার নেই। একটু ভাবলেই যে-কেউ কমবেশি চমকদার তালিকা তৈরি করতে পারেন।

তখন ব্যাপারটা আসলে বিজ্ঞানকে মানুষ কী ভাবে ব্যবহার করবে—আসল সমস্যা বলতে ওইখানেই।

বিজ্ঞান বলে ব্যাপারটা আকাশ থেকে গজায়নি। গ্রহান্তর থেকেও উড়ে আসেনি। মানুষই বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে আর তাই মানুষকেই ঠিক করতে হবে—আজকের বিজ্ঞানের প্রায় অনন্ত শক্তিকে কোন্ পথে নিয়ে যাওয়া হবে।

কিন্তু মানুষ বলতে আসলে কে বা কারা?

যদি শুধু মুষ্টিমেয় মুনাফার হয়, তাহলে একরকম। যদি খেটে-খাওয়া অসংখ্য সাধারণ লোক হয়, তাহলে আর একরকম।

বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে যারা টাকা লুটতে চায় তারা তো মারণাস্ত্র তৈরি করবার দিকে ঝুঁকবেই। কেননা, অমন রাশি রাশি টাকা লাভ করা আর কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। পরমাণু-শক্তি সজ্জিত একটা—শুধু একটা—যুদ্ধের জাহাজ বা উড়োজাহাজ তৈরি করতে পারলে এমন টাকা লাভ হয় যার সঠিক হিসেব আমাদের মতো সাধারণ লোকের জানা নেই। জানবার উপায়ও নেই। কেননা তা 'সামরিক গোপনতা' বলে সংরক্ষিত। কিন্তু এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে অঙ্কটা এমনই দাঁড়াবে যে তার কূল-কিনারা পাওয়া দুষ্কর। অতএব পুঁজিপতিরা অমন মওকা ছাড়বেন কেন? আর যাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্যে এই সব মারণাস্ত্র তৈরির আয়োজন, নেহাত নিরাপত্তার খাতিরে তাঁরাও পাল্টা ব্যবস্থা করতে বাধ্য: পাশের ঘরে বন্দুকধারী ডাকাত থাকলে পাল্টা বন্দুক ছাড়া উপায় কী?

অতএব, কাঠগড়ায় যদি কাউকে দাঁড় করাতে হয় তাহলে তা বিজ্ঞান নয়: পুঁজিপতিকে এবং অতএব পুঁজিবাদকেও।

ভালো খবর বলতে, দেশে দেশে আজ বিজ্ঞানী মহলেও এই অতি-বড়ো সত্যিটা আর ঢাকা থাকছে না। বিজ্ঞানীরাও ক্রমশ বেঁকে বসছেন। তাঁদের আবিষ্কারের এমন অপব্যবহার তাঁদের কাছেও অসহ্য হয়ে উঠছে। তাঁরাও দাবি করছেন, তাঁদের অমূল্য আবিষ্কার কীভাবে প্রয়োগ করা হবে সে বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য আছে। শুধু তাঁদের চেষ্টায় অবশ্য দুনিয়া থেকে পুঁজিবাদ মুছে দেওয়া যাবে না। কিন্তু দেশে দেশে ক্রমশই কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষও এগিয়ে আসছেন। চূড়ান্ত রায়টা দেবেন এই জনতা। তাঁরাই সিদ্ধান্ত করবেন, বিজ্ঞানকে কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ধ্বংসের পথে? না, সৃষ্টির পথে?

এহেন অবস্থায় অসহায়ের মতো হাত গুটিয়ে বসে থাকা কোনো কাজের কথা নয়। প্রতিটি মানুষকে হাতের আস্তিন গুটিয়ে হাত এগুতে হবে। উচ্ছেদ করতে হবে ওই দানবীয় পুঁজিবাদকে। আর তার ফলেই আসবে পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী। যেই পৃথিবীতে বিজ্ঞান অনন্ত কল্যাণের আকর।

তাই বিজ্ঞানের প্রয়োগ কীভাবে হবে—এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের মতো সাদামাটা লোকের ভূমিকাটা ভুললে চলবে কী করে?

ভারতের বিজ্ঞান চর্চা ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

শঙ্কর চক্রবর্তী

ঋগ্বেদ হল ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য গ্রন্থ। আর্যরা রচনা করেছিল আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর আগে। রচিত হয়েছিল মুখে মুখে। তারপর লেখা হয় সাত আটশ বছর বাদে। ঋগ্বেদে রয়েছে এক হাজারের ওপর গান, কবিতা, মন্ত্র প্রভৃতি। বেশির ভাগই দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত। কিন্তু তারই মাঝে মাঝে এমন সব প্রশ্ন উত্থাপিত করা হয়েছে, যেগুলো আমাদের বিস্মিত করে। এক অসাধারণ উন্নত মননশীলতার পরিচয়ও এর মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে।

উন্মেষ

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে এই জগতের সৃষ্টি কিভাবে হল তা জানার আগেই সূক্তকার প্রশ্ন করছেন "সৃষ্টির প্রারম্ভে কি ছিল? এই জগতের ওপর কিসের আবরণ ছিল? কে একে আশ্রয় দিত? অতল সীমাহীন জলরাশিই কি একে ঢেকে রাখত? তারপর নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, "তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না; দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। নিবিড় অন্ধকারে সমস্ত ঢাকা ছিল। আর ছিল অনন্ত সলিলরাশি। সৃষ্টির বীজ ছিল লুকিয়ে। একদিন তাপ লেগে তা বেরিয়ে পড়ার ফলে সৃষ্টির আরম্ভ হল। প্রথমে ছিল কেবল একটি সত্তা, তা থেকেই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হল, তারপরে হল দেবতাদের উৎপত্তি।" সূক্তকার এটুকু বলেই কিন্তু ক্ষান্ত হচ্ছেন না। আবার প্রশ্ন করছেন – "ঐ যে আদিম অদ্বিতীয় সত্তা, তিনি কোথা থেকে এলেন কে জানে? তাঁর শক্তিতেই কি সৃষ্টি হল, না তিনি ছিলেন নিষ্ক্রিয়? সর্বোচ্চ স্বর্গের অধ্যক্ষ হয়তো এর উত্তর দিতে পারেন। হয়তো বা তিনিও জানেন না।" নির্ভীকভাবে এজাতীয় প্রশ্নগুলো যে তোলা হচ্ছে তার মধ্য দিয়ে একটি মানসিকতার পরিচয় আমরা পাচ্ছি। দৃশ্যমান জগতের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য কে জানার আন্তরিক আগ্রহ এবং কোন ধরনের সংস্কারের বশবর্তী না হয়ে যুক্তির সাহায্যে সেই রহস্যভেদের চেষ্টা। খুব অপরিণত রূপে হলেও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বিকাশের একটা পরিচয় কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার আদি যুগ আজ থেকে প্রায়

৪৫০০ বছর আগে। কিন্তু যেহেতু সেই সভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার আমরা আজও করে উঠতে পারি নি, তাই আমাদের জানা নেই জীবন, সমাজ, ধর্ম এবং দৃশ্যমান জগত সম্বন্ধে এই অসাধারণ উন্নত সভ্যতার ধারক বাহকদের ধ্যানধারণা কি ছিল।

বৈদিক যুগের একেবারে প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার এই যে উন্মেষ, পরবর্তী এক হাজার বছরের ইতিহাসে আমরা দেখি সে ঐতিহ্য হারিয়ে বসে আছে। ব্রাহ্মণ শ্রেণী সমাজে তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে অর্থহীন যাগযজ্ঞ, আচার অনুষ্ঠান, পশুবলির প্রথায় স্বাধীন চিন্তাভাবনার বিকাশের সমস্ত পথকে রুদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যবর্তী ১০০০ বছরের পর্যায়কাল ভারতের ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ বলে চিহ্নিত। শুধু চিন্তাভাবনার জগতে স্থবিরতার জন্যে নয়। সিন্ধু সভ্যতার দুটি বড় মাপের অবদান—পোড়া মাটির ইট এবং লিপির ব্যবহার, সে ঐতিহ্যও হারিয়ে গিয়েছিল এই সময়কালটা জুড়ে।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে ভারতের ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগের অবসান ঘটল দুদিক থেকে। বৈদিক ব্রাহ্মণদের অনাচারের বিরুদ্ধে ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা পেলাম জৈন ও বৌদ্ধধর্মকে। আর জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুরু হল নতুন অনুসন্ধান পর্ব— পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষানিরীক্ষা, তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যে পৌঁছানো। আলোকবর্তিকারমত কয়েকটি নাম জ্বলজ্বল করে ওঠে— আত্রেয়, পাণিনি, পতঞ্জলি, চরক, সুশ্রুত, আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, নাগার্জুন।

মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ

ভারত ইতিহাসের এক সুদীর্ঘ পর্যায় কালকে পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। ভারতের চিন্তাভাবনা সংস্কৃতির জগতে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের তিন পথিকৃৎ—রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর। সমাজ-জীবনে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদী ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে তিন অসমসাহসী সংগ্রামী সৈনিক। প্রথমে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, তারপর ভাবতে হবে ইংরেজ শাসন অবসানের কথা – বললেন রামমোহন। প্রত্যক্ষ লড়াইতে নামলেন সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্যে।

মাত্র ২৩ বছরের যুবক ডিরোজিও। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। ছাত্রদের যুক্তিবাদী হতে বলছেন। যারা প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র ছিল না, তারাও নিজেদের ডিরোজিয়ান বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করত। ভারতের প্রথম দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন ডিরোজিও ইংরেজী ভাষায়। তার বাংলা অনুবাদ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমাজের রক্ষণশীল শক্তির চক্রান্তে এই মহাপ্রাণ মানুষটি অতি তরুণ বয়সে দারিদ্র্যে এবং প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। তবুও সমাজের অন্ধতা এবং জড়তার শক্তির কাছে মাথা নোয়ান নি।

ভারতীয় রেনেসাঁর এক প্রবাদপুরুষ বিদ্যাসাগর। টিকিধারী গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিবারে জন্ম অথচ কি আধুনিক মন। পরিপূর্ণভাবে নাস্তিক। যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, বলছেন –আমরা আমাদের ছাত্রদের বেদ বেদান্ত, উপনিষদ পড়াই। এই পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে পরকাল সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ জানানোর চেষ্টা হয়, কিন্তু ইহকালের সমস্যা সমাধানের জন্যে তাদের অনুপ্রাণিত করার কথা আদৌ ভাবা হয় না। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে এইসব পাঠক্রম বন্ধ করে আধুনিক অংক, পদার্থ বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতাম। অকুতোভয় বিদ্যাসাগর ঘোষণা করলেন, নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের চূড়ামণি রঘুনন্দন বেদের শ্লোক জাল করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, মেয়েরা পিতার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না। বেদের কোন অংশে কোথাও এ জাতীয় মন্তব্য নেই। এটা এক ধরনের প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

বাস্তব পরীক্ষা

আমরা আরো কয়েক দশক এগিয়ে এলাম। ১৮৭৬ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের প্রথম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স। প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। তাঁর স্বপ্ন—এই প্রতিষ্ঠানে মেধাবী তরুণ ভারতীয় গবেষকেরা অতি উন্নত মানের গবেষণা করবেন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে। দেশবাসীরা যোগাবেন প্রয়োজনীয় অর্থ। গবেষণালব্ধ ফল দেশের মানুষের প্রয়োজনেই নিযুক্ত হবে।

এক মহান মানুষের মহান স্বপ্নকে সার্থক করার জন্যে দেশের মানুষের কাছে প্রার্থী হয়েছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রলালের জীবদ্দশায় তাঁর স্বপ্ন সফল হয় নি। সফল হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর

পরে। চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামণের নেতৃত্বে কেন্দ্রটি হয়ে ওঠে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর অতি ক্ষুদ্র মাপের বেতার তরঙ্গ মাইক্রোওয়েভ নিয়ে গবেষণা এবং উদ্ভিদ শারীর বিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে পৃথিবীর বিজ্ঞান সভায় ভারতের গৌরবময় আসনকে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই ঐতিহ্যকে বহন করে আরো এগিয়ে দিলেন মহান সব বিজ্ঞানীরা প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, রামানুজন, বীরবল সাহানী, হোমী ভাবা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, শিশির কুমার মিত্র, নিখিল রঞ্জন সেন, কে এম কৃষ্ণান এবং আরো অনেকে।

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ

বিজ্ঞানের অবদান ও আবিষ্কারের কথা বাংলা ভাষায় জনপ্রিয়ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পেঁাছে দেবার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং শুরু করলেন প্রকাশনা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা। এই পত্রিকাটি এবং পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থমালা বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

পঞ্চাশের দশকের শেষে এবং ষাটের দশকের গোড়ায় পশ্চিমবাংলায় শুরু হল আর একটি নতুন পরীক্ষা। বিজ্ঞান ক্লাব নামে এক ধরণের সংগঠন গড়ে উঠল বিজ্ঞান অনুরাগী স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং সাধারণ মানুষদের উদ্যোগে। হাতে কলমে বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন ছিল এই বিজ্ঞান ক্লাব গুলোর প্রথম যুগের প্রধান কর্মসূচী।

১৯৭০-এর মাঝামাঝি একটি সমীক্ষায় পশ্চিমবাংলায় প্রায় ৪৭০-র মত বিজ্ঞান ক্লাবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এক বিপুল পরিমাণ তরুণ প্রানের মেলার হাট যেন বসেছিল এই সংগঠনগুলোকে কেন্দ্র করে। কিছু কিছু গভীর প্রশ্ন সমাজ সচেতনশীল তরুণ বিজ্ঞান কর্মীদের নাড়া দিতে শুরু করে। বিজ্ঞান ক্লাবদের কি কোন সামাজিক ভূমিকা আছে? বিজ্ঞানকে মানুষের কাজে কিভাবে লাগানো যায়? স্বভাবতই এই সব চিন্তাভাবনা থেকে ওঠে প্রযুক্তির কথা, গ্রামীণ প্রযুক্তির কথা, মানুষের স্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিয়োগের কথা। তবে মুষ্টিমেয় স্বল্পসংখ্যক কিছু বিজ্ঞানকর্মীর মধ্যেই এ জাতীয় ধ্যান ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল।

২৯শে নভেম্বর ১৯৮৬

উল্লিখিত তারিখটির তাৎপর্য একটিই। ঐ দিন কলকাতায় একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। নাম পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের গবেষক, ছাত্র, বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মী, সমাজবিদ, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বিজ্ঞান অনুরাগী বেশ কিছু মানুষ। ভারতে গত ৩৫০০ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, যুক্তিবাদী মননশীলতাকে প্রতিষ্ঠা এবং মৌলবাদী ধ্যানধারণা, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহ্যকে সংগঠনের স্রষ্টারা বহন করছিলেন। একই সঙ্গে তারা বহন করছিলেন পৃথিবী জোড়া সমধর্মী সংগ্রামের ঐতিহ্যকে —বহু মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের অবদানে যে ঐতিহ্যের বনিয়াদ হয়েছে তৈরী। এক ঐতিহাসিক যুগচেতনায় সমৃদ্ধ ছিল প্রতিষ্ঠানটির জন্মলগ্ন — সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবাংলার জনজীবনে কোন ভূমিকাকে অর্জন করার প্রথম পদক্ষেপগুলো কি হবে সমাজ সচেতন একটি জন বিজ্ঞান সংগঠনের কর্মীদের কাছে এই বিষয়টির বিচার, অনুধাবণ ও উপলব্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান মঞ্চর কাছেও বিষয়টি সেভাবেই উপস্থিত হয়।

জন বিজ্ঞান

জন জীবনে সমস্যার তো অন্ত নেই। সমস্যা রয়েছে খাদ্য, বাসস্থান, জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ নানাদি বিষয়কে নিয়ে। সব সমস্যার সমাধানের উপায়গুলো কি আমাদের জানা আছে? জানা না থাকলেও অনুসন্ধান এবং সমীক্ষার মাধ্যমে কিছু কিছু সমাধানের পথ হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

প্রথমেই ধরা যাক, জমির সমস্যা। জমি হল পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। জমির সবচেয়ে বড় কৌলীন্যের পরিচয় হল যদি সেখানে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের চাষ করা যায়। এর জন্যে চাই প্রচুর সার কীটনাশক ও জল। সারের মধ্যে অজৈব রাসায়নিক সারই হল বেশি। সব জমিতে সব রকমের সার ব্যবহার করা যাবে না। জমির অম্ল বা ক্ষার প্রবণতার ওপর তা নির্ভর করবে।

বিজ্ঞান কর্মীরা জেলায় জেলায় গ্রামে যাচ্ছেন, চাষীদের জমির রাসায়নিক চরিত্র যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে বলে দিচ্ছেন। ঠিক সারটা জমিতে পড়ছে। জমির নাইট্রোজেন সংরক্ষণের ক্ষমতা অব্যাহত থাকছে।

জলের আর এক নাম জীবন। জল ছাড়া বাঁচা যায়

না। তেমনি দূষিত জল ডেকে আনে নানাদি ব্যাধিকে। ভারতবর্ষে প্রতি বছর পনের লক্ষের মত শিশু মারা যায় আমাশাজনিত ব্যাধিতে পাঁচ বছর বয়সে পৌঁছবার আগেই। আমাশার মূলে রয়েছে দূষিত জল। জলের ব্যবহার সম্বন্ধে গ্রামের সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্যে বিজ্ঞান মঞ্চর কর্মীরা তাদের নিয়ে আলোচনায় বসছেন। জল দূষণ থেকে মুক্ত রাখা এবং পরিশোধনের উপায়গুলো বোঝাচ্ছেন।

ভারতের গ্রামাঞ্চলে বাস করে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ। জন বিজ্ঞান সংগঠনগুলোর কর্মীদের সব চেয়ে বড় মাপের দায়িত্ব হওয়া উচিত প্রতিটি গ্রামবাসীর আয়ত্তের মধ্যে রাসায়নিক বিচারে বিশুদ্ধ জলের সরবরাহ ব্যবস্থাকে পৌঁছে দেয়া।

গ্রামবাসী গরীব মানুষেরা কি চিরকালই খোড়ো ঘরে বাস করবেন? এই মানুষদের জন্যে সস্তায় ছোটমাপের পাকা বাড়ী তৈরির প্রযুক্তি নির্ধারণে হাত দিয়েছেন মঞ্চর কর্মীরা।

ছোট মাপের পানচাষী, রেশম চাষী, পশু চামড়ার সংগ্রাহক এদের কাজে প্রযুক্তিগত নানা সমস্যা রয়েছে। সমস্যা রয়েছে নদী ও সাগরের ভাঙ্গন এবং খনি এলাকায় ধ্বসকে নিয়ে। মঞ্চর কর্মীরা কর্মসূচী নিয়েছেন এই সমস্যাগুলোকে কেন্দ্র করে।

পরিবেশগত সমস্যারও তো অন্ত নেই। অনেক ছোট মাপের সমস্যা আছে। সাধারণ মানুষকে সে বিষয়ে সচেতন করা দরকার। সচেতন করার জন্যে প্রশ্নপত্র তৈরি করেছেন বিজ্ঞান মঞ্চ ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্যে। এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার আগে সাধারণ মানুষকে ভাবতে হয়েছে। পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতার মান নিজের কাছেই ধরা পড়বে তখন।

জলাভূমি একটি অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। জলাভূমি সংরক্ষণের গুরুত্বকে নানাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপিত করেছেন বিজ্ঞান মঞ্চ। মশা নিবারণ, নগরাঞ্চলে গাছপালাবহুল কোন অঞ্চলকে পাখীদের জন্যে সংরক্ষিত এলাকারূপে চিহ্নিত করা—এ জাতীয় কাজও হাতে নিয়েছেন বিজ্ঞান মঞ্চ।

জাতীয় স্ব নির্ভরতার প্রশ্নটা সামনে রেখে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে খনিজ তেলের সন্ধান কাজকে কেন্দ্র করে আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান ও করণীয় কাজের ব্যাপারে জাতীয় স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন বিজ্ঞান মঞ্চ।

একটি গ্রামীণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন বিজ্ঞান মঞ্চ বীরভূম জেলার মাড়গ্রামে। গ্রামের মানুষ কোন্ সমস্যাগুলো তাদের আসল সমস্যা রূপে চিহ্নিত করছেন এটা শুনতে হবে গ্রামের মানুষদের কাছ থেকেই, সে সঙ্গে সমাধানের উপায়টাও। নতুন কোন প্রযুক্তি গ্রামের মানুষ যদি গ্রহণ করতে আগ্রহী হন তবেই চলবে। নতুবা নয়। প্রযুক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশ্নটাও গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তি-তর্ক-বিচার

বস্তু জগত ও প্রকৃতি জগতকে ঘিরে মানুষের মনে অনন্ত প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসার ভিড়। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হল, কি তার পরিণতি, পৃথিবীতে প্রাণ এল কিভাবে, মানুষের ঠিকানাটাই বা কি, পরমাণুর শক্তি কি মানুষের ধ্বংস ডেকে আনবে! মানুষের বুদ্ধিটাকে ধরে নাড়া দেবার নানা হাতিয়ার রয়েছে—পত্র পত্রিকা, বই, পোস্টার, স্লাইড, বক্তৃতা, গানের ক্যাসেট, প্রদর্শনী, ভিডিও, ফিল্ম। এ বিষয়গুলোর কাজ মঞ্চ হাতে নিয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

সমাজ জীবনে পাশাপাশি বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞানের ভিড়। অপবিজ্ঞানের শিবিরের জৌলুষের যেন অন্ত নেই। সব প্রচার মাধ্যমকে তারা কব্জা করেছে। রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, যুক্তিবাদ বিরোধীতা ও মৌলবাদী ধ্যানধারণার কলগুঞ্জন। বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মীরা সবল লড়াই করছেন এই শিবিরের বিরুদ্ধে প্রকাশনা ও সাংগঠনিক কাজের মাধ্যমে।

১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারত জন বিজ্ঞান জাঠা। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ থেকে পূর্বাঞ্চলীয় জাঠার সংগঠক ছিলেন বিজ্ঞান মঞ্চ। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তৃতীয় সারা ভারত জন বিজ্ঞান কংগ্রেসের সংগঠকও ছিলেন মঞ্চ। সাক্ষরতার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে ভারতব্যাপী জ্ঞান বিজ্ঞান জাঠার অন্যতম সংগঠক বিজ্ঞান মঞ্চ।

পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে এত বড় মাপের একটি জন বিজ্ঞান সংগঠন ইতিপূর্বে হয় নি! সতেরটি জেলা জুড়ে ব্লকে ব্লকে, গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান মঞ্চর সংগঠন ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের জন্যে বিজ্ঞান, স্ব-নির্ভরতার জন্যে বিজ্ঞান, জাতীয় সংহতির জন্যে বিজ্ঞান, শান্তির জন্যে বিজ্ঞান—এই মূল বক্তব্যগুলো আপন কর্মসূচীর মধ্যে রূপায়িত করে, সমস্ত মত এবং পথের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ জনজীবনে আপন সামাজিক দায়বদ্ধতার তাগিদকে পালন করে চলেছে।

"Three score and ten!" তিন কুড়ি দশ। ইংরেজীতে কথাটার চলন আছে। ৭০ বছর বয়েস হলো মানুষের জীবনের পূর্ণতার বয়েস। ১৯২৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ৭০ বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র ১৯২৮ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, " ১লা ডিসেম্বর আমার ৭০ বৎসর হইবে। সেদিন আমি সমস্ত বোঝাপড়া ঠিক করিব, সেদিন তোমার সহিত দেখা হইলে সুখী হইব। তোমার শুভ ইচ্ছা যেন আমাকে সেদিন বলীয়ান করে। শেষ দিন পর্যন্ত-ও যে সাধনা আমরা আরম্ভ করিয়াছি

সপ্ততম জন্মদিনে কবি ও বিজ্ঞানী

দিবাকর সেন

তাহাতেই জীবন অবসান করিব। ম্রিয়মান হইব না। অন্ততঃ আমরা দুজন একে অন্যের ভার বহন করিব। "

এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন (২৪ অক্টোবর ১৯২৮), "···চলাফেরা আমার পক্ষে কঠিন হয়েছে—চুপ করে বসেই আমাকে কাজ চালাতে হয়।··· তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দন সভায় নিশ্চয়ই আমি যোগ দিতে যাব। তখন শীতের সময়, শরীরে এখনকার চেয়ে বল পাব বলে বিশ্বাস করি।" কিন্তু শারীরিক কারণে রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি। অনুষ্ঠানের আগে তিনি আবার জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন (১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫),

"আমার মনের কথা একটি কবিতায় লিখে পাঠিয়েছি, ···আমার অন্তরের কথা তুমি জানো—কিন্তু সবলকে জানিয়ে রেখে যেতে চাই। আমার সৌভাগ্য, তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়েছি, সেই গৌরবের কথাটিকে স্থায়ীরূপ দিয়ে আমার ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করেছি ভাবীকালের চিত্তে। তোমার স্মৃতির সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়িত হয়ে থাকবে এই আমার আনন্দ। তোমার কর্মে তোমায় সহযোগিতা করি এমন শক্তি আমার নেই, কিন্তু বন্ধুর প্রীতি সংসার পথের পাথেয়, অন্তর থেকে তাই তোমাকে নিবেদন করতে পেরেছি এই কথা মনে রেখো।" অনুষ্ঠানে জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লেখা "যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু " কবিতাটি (বণবাণী কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা) সভায় পাঠ করেন ডঃ কালিদাস নাগ। কিন্তু এই সার্থক জন্ম জয়ন্তীর প্রস্তুতির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। দেশবাসীর প্রতি এক আবেদনে বলেছিলেন,

"It is proposed to hold the 70th birthday celebration of Sir Jagadish Chandra Bose on the 1st December (1928) between 4-6 P.M. at the Bose Institute···In the darkest hour of India's intellectual degradation. he has set

a fire a flame which shows us the path to a greater future. His spirit of deep scientific inquiry, his profound love of universal humanity. his serene hopefulness have ever been a source of inspiratien to all who have come near him. It is only in the fitness of things that his pupils and admirers should assemble on his 70th birthday and express their feelings in a suitable manner. All communication in this connection should be addressed to Mr. Ashok Chatterjee. 91, Upper Circular Road, Calcutta.

S/D Rabindranath Tagore

* * *

রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছর পূর্ণ হয় ১৩৩৮ সালে। এই উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে ১১ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩১) বিরাট এক সভা ও প্রদর্শনী হয়। "রবীন্দ্র শিল্পপ্রদর্শনী ও মেলা"র উদ্বোধন হয় ৯ই পৌষ। উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার মহারাজা শ্রীবিক্রম কিশোর মাণিক্য। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হবার কথা ছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি ঐ মহতী সভায় যোগ দিতে পারেন নি। দেশবাসীর পক্ষ থেকে ঐদিন যে মানপত্রটি রবীন্দ্রনাথকে প্রদান করা হয় তার খসড়াটি রচনা করেছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মানপত্রটির প্রতিলিপি এইরূপ:

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

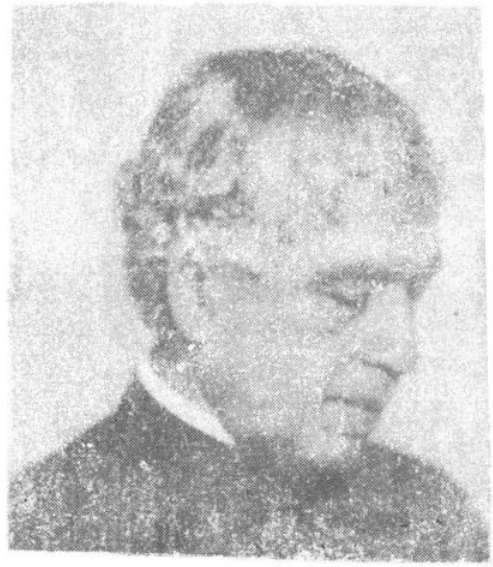

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারম্বার নতশিরে নমস্কার করি।

ইতি

কলিকাতা
রবিবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া
১১ই পৌষ, ১৩৩৮ সাল
(বঙ্গাব্দ)

রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পরিষদ পক্ষে
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
সভাপতি

এই রবীন্দ্রজয়ন্তীর নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বিশ্বজনীন উপহার হলো "গোল্ডেন বুক অব টেগোর", এই গ্রন্থের সম্পাদনা করেন শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থটির প্রস্তাবকদের মধ্যে ছিলেন, জগদীশচন্দ্র, গান্ধীজি, রমাঁ রল্যাঁ, আইনস্টাইন ও গ্রীক কবি কন্টাস পালামাস। পৃথিবীর ত্রিশটি দেশের কবি, লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী এই গ্রন্থটি অলঙ্কৃত করেন। দু'শোর বেশী খ্যাতনামা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য লেখকদের লেখা এতে রয়েছে। এক কথায় গ্রন্থটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন চেষ্টার ইতিহাসের একটি অনবদ্য সাক্ষ্য।

তারারা আমাদের বন্ধু

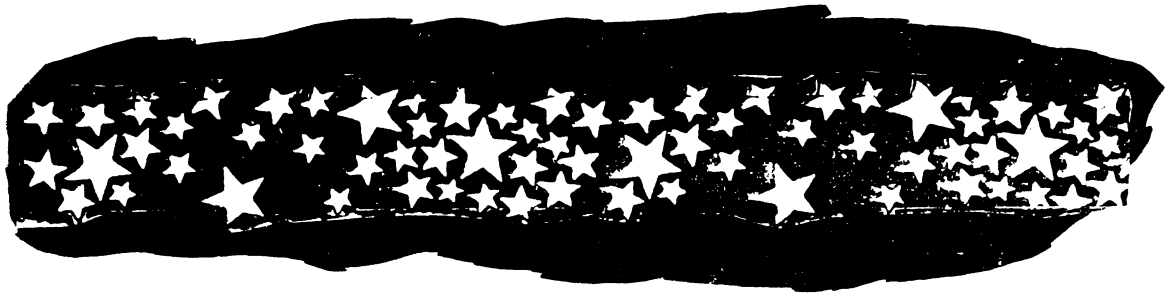

★ রমাতোষ সরকার ★

বন্ধু কে ? প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এক প্রাজ্ঞ পণ্ডিত বড় কঠিন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

তার মানে, উৎসবে এবং ব্যসনে অর্থাৎ অমঙ্গলে দুর্ভিক্ষে এমন-কি রাষ্ট্রবিপ্লবে, আবার রাজদ্বারে অর্থাৎ আদালতে এবং শ্মশানেও যে সঙ্গে থাকে সেই বন্ধু।

আমরা সচরাচর যাদের বন্ধু বলে থাকি বা বন্ধু বলে যাদের মনে করি, তারা কি সবাই বর্ণিত ঐ শর্তগুলো পূরণ করে বা করবে যে এমন ভরসা থাকে ? নিশ্চয় নয়। ঐ-তালিকা ধরে বন্ধু খুঁজতে—সেই যে কথায় আছে, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়, সেই অবস্থা হবে। শত্রু বা অবন্ধুরা ক্রমশ দলে ভারি হবে ; বন্ধুর খোঁজ মিলবে না। অথচ, আমার কোন বন্ধু নেই, এমন কথা ভাবতেও যেন খারাপ লাগে - তাই না ? তাই আমরা করি কি যাহোক তাহোক করে বন্ধু বানিয়ে নিই—আলাপ-পরিচয় আছে কিন্তু অনাত্মীয় এবং মোটামুটি ভাবে সমবয়সী, এমন হলেই তাকে বন্ধু বলে ধরে নিই, সহপাঠী বা প্রতিবেশী হলে তো কথাই নেই। এর ফলত অনেক সময় হাতে হাতে ফলে। অনেক সময়েই তথাকথিত এই বন্ধুদের দৌরাত্ম্যে এমন উত্যক্ত বা এমন ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় যে, দুঃখ করে বলি এমন বন্ধু থাকতে আর কোনও শত্রু লাগে ?

সমাজে বন্ধু কি-করে পেতে হয় তার সঠিক পথ বাত্‌লাতে পারবনা। শুধু একটা সূত্র ধরিয়ে দিতে পারি - বন্ধু পেতে হলে, বন্ধু হতে হয়। বন্ধুত্ব একটি পারস্পরিক সম্পর্ক।

কিন্তু আমাদের সমাজের বাইরে একদল বন্ধুর খোঁজ দিতে পারি। ওরা অবশ্যই আমাদের কারর সমবয়সী নয়—এদের বয়স সাধারণত কয়েক শ কোটি বছরের কোঠায়। প্রতিবেশী ? তাও নয়। ওদের মধ্যে যে আমাদের সবচেয়ে কাছে তারই দূরত্ব প্রায় ১½ কোটি কিলোমিটার। আর বাকিরা আরও আরও দূরে। পরেরটি আছে প্রায়

৪০ লক্ষ কোটি কিলোমিটার দূরে। কিন্তু দূরে থাকলেও সাঙ্গ ওরা দেয়—সর্বত্র সর্বক্ষণ। সেদিক থেকে ওরা যে কোন পণ্ডিতের যে-কোন কূট শর্তকে নিখুঁত ভাবে পূরণ করে। ওরা সঙ্গে আছেই।

ওরা আছে আকাশে। রাতেও আছে, দিনেও আছে। আকাশ ঢাকা না-পড়ে গেলে ওদের দেখা যায়—রাতের আকাশে অনেককে একসঙ্গে, দিনের আকাশে একটিকে একা। চাঁদনী রাতে তুলনায় বেশ কিছু কম, অন্য রাতে অনেক বেশি। তেমনি শহরাঞ্চল থেকে কম, অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশি।

ওদের মধ্যে একটির কাছে তো আমাদের ঋণের সীমা-পরিসীমা নেই। তাকে বাদ দিলে আমাদের জীবন একেবারে অচল। অন্যগুলোও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের নানা ভাবে সাহায্য করেছে অতীতে চাইলে আজও করে। হ্যাঁ, আমি আকাশের তারাদের কথাই বলছি।

যদিও সর্বক্ষণই ওরা আছে, তারারা কিন্তু দিনে-রাতে যেন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। দিনের আলোয় ওরা গা ঢাকা দিয়ে থাকে। এখন পৃথিবীর মাটি থেকে বা মাটির কাছাকাছি যে বায়ুমণ্ডল আছে সেখান থেকে ওদের দেখা সম্ভব নয়। সম্ভব শুধু পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ে বা গাগারিন, নীল আর্মস্ট্রং, রাকেশ শর্মার মত ঐ বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে যেতে পারলে। কিন্তু দেখা যাক বা না-যাক ওরা থাকেই। কবি ঠিকই বলেছেন, 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।'

আমাদের কর্মক্লান্ত দিনের শেষে যখন তারারা দল বেঁধে আত্মপ্রকাশ করে তখন আমরা স্বচ্ছন্দে ওদের টেনে নিতে পারি আমাদের অবসর বিনোদনের সাথী করে। তারা চেনা একটা সুন্দর 'হবি' বা শখ হতে পারে। ঋতুভেদে বা এমন কি রাতের প্রহর ভেঙ্গে যে-সব ভিন্ন ভিন্ন তারা পরপর দল বেঁধে দেখা দেয়, তাদের আলাদা আলাদা করে চেনা, তাদের নাম ও অন্যান্য পরিচয় সংগ্রহ করা ডাকটিকিট, মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করার মতই বা দেশভ্রমণ করার মতই আনন্দ দায়ক হতে পারে। কত বৈচিত্র্য আছে তারাদের মধ্যে—কোনটি রীতিমত উজ্জ্বল, কোনটি মাঝারি, কোনটি যেন মিট্‌মিট্‌ করছে; কোনটি লাল রঙের কোনটি নীলাভ, কোনটি আবার অন্য কোন রঙের। তাছাড়া কলাকৌশল ব্যবহার করলে জানা যায় কোন্‌টি কত দূরে, কোন্‌টি কত বড় বা কোন্‌টির ঐ-ধরণের আরও কি কি বৈশিষ্ট্য আছে।

তারাদের সবার আলাদা আলাদা নাম আছে। কারুর কারুর একাধিক। নামগুলো ওরা পেয়েছে বিভিন্ন সূত্রে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, একটি তারার নাম প্রাচীন ভারতবর্ষে দেওয়া হয়েছিল বাণরাজ; সেই তারাটিরই আরবদেশে নাম হয় রাইগেল (Rigel) আর সে-নাম ইউরোপেও প্রচলিত হয়। আবার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ওঁদের নিজস্ব আলাপ আলোচনায় ঐ তারাটিকেই সাধারণত বিটা অরাইয়নিস (Beta orionis) নামে অভিহিত করে থাকেন। ও-তারাটি আছে শীতের আকাশের সুপরিচিত মণ্ডল অরাইয়ন (orion) বা কালপুরুষের মধ্যে।

প্রসঙ্গত যে 'মণ্ডল' শব্দটি এখনই ব্যবহার করলাম, তারাদের প্রসঙ্গে তার ব্যাপক ব্যবহার এবং একটু বিশেষ অর্থ আছে। অর্থটা কি একটু বুঝিয়ে বলি। বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় 'মণ্ডল' ইংরেজিতে coustellation. এ-বলতে বোঝায় আকাশের মোটামুটি ভাবে একই দিকে বা একই অংশে অবস্থানকারী তারাদের আবেশ বা বিন্যাস, যে সমাবেশ বা বিন্যাসের সঙ্গে আমাদের পরিচিত বা কল্পিত কোন কিছুর সাদৃশ্য আছে বা সাদৃশ্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে আর সেই মত যার নাম হয়েছে। যেমন উল্লিখিত অরাইয়ন (orion) বা কালপুরুষ মণ্ডল। কাল-পুরুষ হচ্ছে যোদ্ধা মানুষ বা শিকারী মানুষ ইংরেজিতে বলা হয় the cellestial hunter। এক্ষেত্রে আকাশের এক জায়গায় কতকগুলো তারা এমন ভাবে অবস্থান করছে

এমন বিন্যাস যে একটু কল্পনার যোগসূত্র পেলেই তারা গুলো মিলিত ভাবে একটি আক্রমনোদ্যত যোদ্ধা বা শিকারীর রূপ পরিগ্রহ করে। শিকারীর মাথা ও কপাল নির্দেশ করতে গুটি তিনেক তারা আছে, দুটি তারা নির্দেশ করছে দুই বাহু। এক হাতে একটি অস্ত্র, অপর হাতে ঢাল—কতকগুলো অনুজ্জ্বল তারা দিয়ে এ-সব সুন্দর ভাবে গঠিত হয়েছে। নীচের দিকে আছে দুটি তারা দুই পা নির্দেশ করছে, আর মধ্যভাগে রয়েছে পর পর তিনটি তারা—যেন মানুষটির বেল্ট বা কোমরবন্ধ। ওখান থেকে ঝোলানো তলোয়ার বা তলোয়ারের খাপ সূচিত করতেও যথাস্থানে কয়েকটি তারা পাওয়া যায়। আকাশের বিভিন্ন দিকে এমন অনেক মণ্ডল গড়ে উঠেছে যদিও সব ক্ষেত্রে মণ্ডল গুলো কালপুরুষের মত দৃষ্টি আকর্ষক বা সার্থকনামা নয়। মণ্ডল আছে মোট অষ্টআশিটি, এরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে পুরো আকাশটাকে নিখুঁত ভাবে ঢেকে রেখেছে, ফলে আকাশের প্রতিটি তারাই কোন-না-কোন এক মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ ভাবে মণ্ডলদের সাহায্যেই

তারাদের সুনিশ্চিত ভাবে চেনা যায় বা শনাক্ত করা যায় আর তা করা যায় বলেই প্রতিটি তারার পৃথক নামকরণ সম্ভব হয়েছে।

তারা-চেনাকে এক মজার ব্যাপার করে নেওয়া যায়, আগেই পরোক্ষ ভাবে বলেছি সে-কথা। এই মজার কিছুটা আসে ওদের নামগুলো থেকে। কারণ নামগুলো অনেক ক্ষেত্রে খুবই সুন্দর, আর সে নামগুলো ঘিরে অনেক সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান আছে। হয়তো উল্টোটাও হয়ে থাকতে পারে। কিছু কিছু তারা নাম পেয়েছে জনপ্রিয় কিছু উপাখ্যানের প্রধান চরিত্রগুলোর নামানুসারে। কালপুরুষ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বাণরাজ নামের যে তারাটির উল্লেখ এখনি করেছি—তারাটি আছে কালপুরুষের ডান পায়ে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে—তার একটু উত্তরে, কালপুরুষ মণ্ডলেই প্রায় নিখুঁত এক সরলরেখায় সমদূরত্বে সাজানো পর পর তিনটি তারা আছে। ভারতবর্ষে তাদের নাম পশ্চিম থেকে পুবে যথাক্রমে চিত্রলেখা, অনিরুদ্ধ আর উষা। এরা মহাভারতের এক রোম্যান্টিক উপাখ্যানের তিনটি প্রধান চরিত্রের নামে নাম পেয়েছে। বাণরাজের সঙ্গে ও কাহিনীর যোগসূত্র আছে। উষা বাণরাজের দুহিতা অনিরুদ্ধ তার জামাতা—যদিও তার অমতে উষাকে বিয়ে করার দরুণ অনেকদিন পর্যন্ত জামাতা হিসাবে সমাদর বা স্বীকৃতি বঞ্চিত ছিলেন। আর চিত্রলেখা? সে ছিল রাজকন্যার সহচরী। এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে দেশি বা বিদেশি।

নামকরণের ব্যাপারেও অনেক মজার বৃত্তান্ত আছে। কতকগুলো নাম অবশ্য সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে; সে-নামগুলো কার, কিভাবে, কাদের দেওয়া, তা জানা নেই। কিন্তু কতকগুলো নাম প্রদত্ত হয়েছে বিগত কয়েক শতকের মধ্যে। ইতালির এক বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাম তাঁর পিয়াৎসি (Piazzi)—তাঁর এক সহকারীর কাজে খুব খুশি হয়েছিলেন। অনুগত সেই সেবককে পুরস্কৃত করতে উনি আকাশের পাশাপাশি দুই নামহীন তারার নামকরণ করেছিলেন সুয়ালোসিন (Saulocin) আর রোটানেভ (Rotanev)। সে নাম আজ প্রায় ২০০ বছর ধরে চলছে। পিয়াৎসি নিজে অমর হয়ে আছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর নানা আবিষ্কারের কৃতিত্বে; আর সেবক নিকোলাউস ভেনাটর (Nicolaus Venator) অমর হয়ে রয়েছে দুটি তারার নামে। তারই নামের দুটি অংশের বানান উল্টিয়ে ঐ তারা দুটির নাম হয়েছে—Nicolaus থেকে Sualocin আর Venator থেকে Rotanev।

এই রকম বিচিত্র সব তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে নতুন তারা চেনায় দারুণ মজা। আবার চেনা তারাদের বারবার দেখতেও ভালই লাগে/নতুন বন্ধুত্বের পরিবর্তে পাওয়া যায় পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা সাক্ষাতের ভিন্নতর স্বাদ। তারারা সঙ্গ দিয়ে আমাদের অবসর-বিনোদনে সাহায্য করে। ওরা সেই হিসেবে আমাদের বন্ধু। কিন্তু শুধু ঐদিক থেকেই নয়। তারারা অন্য ভাবেও আমাদের সাহায্য করে, বন্ধুর মত উপকার করে অতীতে করেছে দারুণ ভাবে, আজও আমাদের প্রয়োজন হলেই করতে পারে যদি আমরা চেনাশোনার সম্পর্কটা রাখি।

আজ আমাদের হাতে হাতে ঘড়ি, ঘরে ঘরে ক্যালেন্ডার; আর, দরকার হলেই ম্যাপ বা কম্পাস বার করতে পারি। আজ সব তৈরী। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসের ফেলে আসা দিনগুলো সব এমন ছিল না, অথচ দিকনির্ণয় বা কালনির্ণয়ের প্রয়োজন মানুষের সে যুগেও বিশেষ কম ছিল না। তখন মানুষের কাছে তারা-ভরা আকাশ ছিল একাধারে ঘড়ি ও ক্যালেন্ডার, ম্যাপ আর কম্পাস। তখন মানুষ মনোযোগ দিয়ে তারাদের লক্ষ করত, ভাল করে চিনে রাখত। ধ্রুবতারা বা পোলস্টার (Pole Star) এর মত তারা তাদের উত্তরদিক আর সেই সূত্রে অন্যান্য দিকের হদিস দিত। আর সপ্তর্ষিমণ্ডল বা আরসা মেজর (Ursa Major)-এর মত দলবদ্ধ তারারা সাহায্য করত ধ্রুবতারার মত বিশিষ্ট তারাদের খুঁজে পেতে। কথাটির কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে? যদি কারুর কারুর না-জানা থাকে, তো তাদের উদ্দেশে বলি—এখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ থেকে আকাশ লক্ষ করলে যে-কোন রাত্রের যে-কোন সময়ে দেখা যাবে যে, ধ্রুবতারা রয়েছে উত্তর আকাশ দিকচক্রের উপর যে উত্তরবিন্দু আছে তার প্রায় নিখুঁত উপরের কোন এক জায়গায় এবং রাতের প্রহরে প্রহরে তার অবস্থানের কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না, যা অন্য যে-কোন জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রে সহজেই দেখা যায়। আর, সপ্তর্ষির উত্তর প্রান্তের দুই তারা ক্রতু আর পুলহকে—Duble আর Merak-কে - কল্পনার সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করে ক্রতুর দিকে কিছুটা বাড়ালেই ধ্রুবতারায় উপনীত হওয়া যায়, তা সে আকাশে সপ্তর্ষির অবস্থান যাই হোক না কেন।

আবার ধ্রুবতারার মত তারারা আর একটি বৈশিষ্ট্যের

অধিকারী হয়. আর সে-বৈশিষ্ট্যও মানুষের যথেষ্ট কাজে লাগতে পারে লেগেছে আগের দিনে। বৈশিষ্ট্যটা এই যে. উত্তর দিকচক্র থেকে অমন তারার উচ্চতা নির্দেশ করে দর্শক পৃথিবী পৃষ্ঠের কোথায় আছে, তার অক্ষাংশ (Latitude) কত। যেমন কলকাতার অক্ষাংশ হল প্রায় ২২°৩০′ উঃ, আর কলকাতার আকাশে ধ্রুবতারা থাকে উত্তর দিকচক্র থেকে প্রায় ২২°৩০′ উচ্চতায়, দার্জিলিঙে থাকে প্রায় ২৭° উচ্চতায়, কারণ সেটাই দার্জিলিঙের অক্ষাংশ।

তারাদের সাহায্যে আগের যুগের মানুষ দিক নির্ণয় করত বলেছি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে কথাটা সপ্রমাণ করি। মহাভারতের জতুগৃহ-দাহের কথা নিশ্চয় সবার জানা আছে। কৌরবরা ছলে, বলে, কৌশলে পাণ্ডবদের বিনাশ ঘটাতে চেয়েছিল, আর তাদের নানা কুপ্রচেষ্টার মধ্যে একটি ছিল এই জতু গৃহদাহ। পাণ্ডবদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত শহর বারণাবতে জতু অর্থাৎ গালা দিয়ে একটি নকল বাড়ি তৈরি করিয়ে কৌরবরা তাতে পাণ্ডবদের কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য সহজ-দাহ্য পদার্থ দিয়ে গঠিত বাড়িতে পাণ্ডবরা থাকা কালে একদিন রাত্রে অগ্নিসংযোগ করে তাদের পুড়িয়ে মারা। কৌরবরা তাদের পরিকল্পনা মত যথাসম্ভব অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু পাণ্ডবরা মরে নি—তারা মাটির নিচে এক সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করিয়ে সুযোগমত সেই পথে পালিয়ে গেছল। এই বুদ্ধিটা পাণ্ডবদের আগে থেকে দিয়ে রেখেছিলেন তাদের পিতৃব্য—মহামতি এবং মহাজ্ঞানী বিদুর। বিদুর ছিলেন সর্বতোভাবে পাণ্ডবদের দিকে কিন্তু লৌকিক কারণে প্রকাশ্য ভাবে সে-সমর্থন জানাতে পারতেন না। উনি তাই কতকটা হেঁয়ালির ভাষায় পরোক্ষ ভাবে পাণ্ডবদের জানিয়ে দিয়েছিলেন কি-ভাবে রাতের অন্ধকারে ওরা পালাতে পারে। বলেছিলেন, 'চরন্ মার্গান বিজানাতি, নক্ষত্রৈঃ বিন্দতে দিশঃ।' অর্থাৎ চলাফেরা করলে—অবশ্যই দিনের বেলায় - রাস্তাঘাট চিনে রাখা যায়, আর রাতের আকাশে তারাদের দেখলে দিক ঠিক করা যায়।

মহাভারতের চেয়ে প্রাচীনতর এক রচনা থেকে পরোক্ষ এক সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা যাক। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত একটি কাহিনীতে আছে যে, ঋষি সনৎকুমারের কাছে 'ব্রহ্মবিদ্যা' শিক্ষায় আগ্রহী নারদ নিজের বিশেষ যোগ্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'নক্ষত্রবিদ্যা' অর্থাৎ তারামণ্ডলী চর্চায় ওঁর পারদর্শিতার উল্লেখ করেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তারাদের সম্পর্কে সম্যক পরিচয় থাকা সে-যুগে কি-রকম মূল্যবান বলে বিবেচিত হত।

শুধু দিকনির্ণয় নয়, তারাদের অবস্থান লক্ষ করে কাল-নির্ধারণও করা যায়- যদি তাদের গতিবিধির খোঁজ খবর ঠিকমত রাখা যায়। বুঝিয়ে বলি। ধরা যাক কোন এক সন্ধ্যায়, ছ'টা নাগাদ, রোহিনী বা আল্‌ডিবারান (Aldebaran) তারাটিকে দেখা গেল মাঝ-আকাশে—বা সেখান থেকে সরাসরি উত্তরে বা দক্ষিণে কোথাও। তাহলে মাঝরাতে মানে বারোটা নাগাদ—রোহিনী অস্ত যাবে. আর তার আগে যেকোন সময়ে রোহিনী পশ্চিমাকাশে কতটা নেমেছে তা থেকে সন্ধ্যার পর সময় কতটা কেটেছে তার একটা ভাল মত আন্দাজ করা যাবে। কারণ, আকাশের পটভূমিতে তারারা সমবেগ—কিছুটা সময়ে ওরা যতটা সরে যায় তার দ্বিগুণ সময়ে সরে যাওয়াটাও আগের তুলনায় ঠিক দ্বিগুণই হয়।

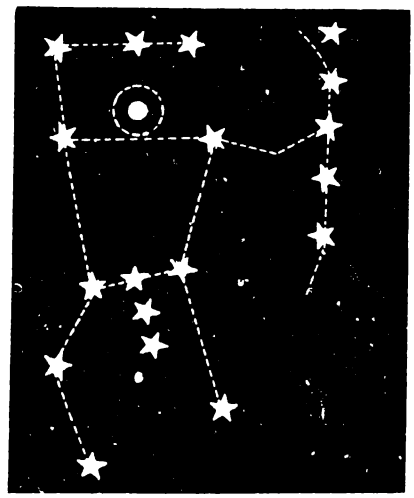

কালপুরুষ

আকাশ দেখে সময় নির্ধারণ করার কথাটা শুনতে আজ আমাদের অনেকের কাছে যতটা হেলাফেলার মত লাগছে বা লাগতে পারে, আসলে ততটা নয় কিন্তু। এক সময়ে কাল-নির্ধারণের এটা এক যথেষ্ট প্রচলিত পদ্ধতি ছিল - গ্রামজীবনে কোন কোন সম্প্রদায়ের কাছে এখনও একেবারে পরিত্যক্ত নয়। বিশেষতঃ দিনের আকাশের তারা অর্থাৎ সূর্যের সাহায্যে গঠিত sun-diel বা সূর্যঘড়ি একসময়ে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল—আজও তার কমবেশি ব্যবহার আছে। আর বর্তমান কালে সময় নির্ধারণের কাজে আমরা

যেসব ঘড়ি ব্যবহার করে থাকি, অনেকদিন পর্যন্ত—কোয়ার্টজের বিচিত্র ধর্ম আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত তাদের প্রধান ভিত্তি বা অবলম্বন ছিল আকাশে তারাদের সমবেগ আবর্তন।

তারাদের আবর্তন সংক্রান্ত আর একটি ঘটনা মানুষের অমোঘ উপকার সাধন করেছে সে-ঘটনা থেকেই মানুষের ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকার উৎপত্তি হয়েছে। ঘটনাটা এই যে আকাশের পটভূমিতে তারাদের আবর্তন সূর্যের চেয়ে একটু দ্রুততর। আসলে তারাদের আবর্তন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফল, আর সূর্যের ক্ষেত্রে আহ্নিক গতির সঙ্গে পৃথিবীর বার্ষিক গতিও কাজ করে—মূলের এই পার্থক্যের দরুন ফলেও পার্থক্য ঘটে। ফলটা হয় এই রকম: আজ সন্ধ্যা ৭টায় যদি একটি বিশেষ তারাকে মাঝ-আকাশে দেখি তবে কাল তাকে ঐ একই জায়গায় দেখব ৭টা বাজার প্রায় ৪ মিনিট আগে পরশু প্রায় ৮ মিনিট আগে, আর ঐভাবে পরের প্রতিদিনই উত্তরোত্তর আরও প্রায় ৪ মিনিট করে এগিয়ে এগিয়ে। অন্য ভাবে বলা যায়, আজ ৭টায় মাঝ-আকাশে দেখা তারাটিকে কাল ৭টায় দেখব মাঝ-আকাশ থেকে একটু—প্রায় এক ডিগ্রি পশ্চিমে সরে থাকতে, পরশু আরও প্রায় এক ডিগ্রি পশ্চিমে ইত্যাদি। এর পুঞ্জীভূত ফল হিসাবে একদিন ৭টায় আকাশে তারাটিকে কোথাও দেখা যাবে না। হয়তো ৬-৩০-এ বা ৬টায় দেখা যেতে পারে, কিন্তু পরে কোন একদিন তাও যাবে না। তখন বুঝতে হবে তারাটি দিনের আকাশে চলে গেছে—আকাশের সেই অর্ধে অবস্থান করছে যেখানে সূর্যও অবস্থান করছে, অতএব তাকে তখন দেখা সম্ভব নয়। শেষ যেদিন পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পরে স্বল্পক্ষণের জন্য তারাটিকে দেখা যাবে, তারাটির সেদিনের অস্তগমনকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় ইংরেজিতে বলা হবে heliacal setting—বাংলায় বলা যাক সূর্যাতিগ অস্তগমন। এরপর কয়েক মাস কেটে যাবে, তারাটিকে রাতের কোন সময়েই আকাশে কোথাও দেখা যাবে না। তারপর যেন অকস্মাৎ একদিন শেষ রাতের আকাশে সূর্যোদয়ের কিছু আগে পূর্বদিকে তারাটি আত্মপ্রকাশ করবে। অল্পক্ষণের জন্যে, কারণ একটু পরেই উদীয়মান সূর্যের প্রথম আলোর আভায় তারাটি ঢাকা পড়ে যাবে। কিন্তু ঐদিন থেকে প্রতিদিনই তারাটি দেখা দিতে থাকবে—প্রতিদিন প্রায় ৪ মিনিট করে আরও আগে আগে, অতএব দেখাও যাবে প্রতিদিন একটু বেশি সময় ধরে। এইভাবে এগোতে এগোতে তারাটি আবার একদিন তার পূর্ব অবস্থানে ফিরে আসবে—সন্ধ্যায় মাঝ আকাশে, তারপর আবার ধীরে ধীরে আসবে তার অদৃশ্য হওয়ার পালা অর্থাৎ তারাটি আবার দিনের আকাশে চলে যাবে। কয়েক মাস অদৃশ্য থাকার পর শেষ রাতে প্রথম দেখা দেওয়ার ঘটনাকে-পূর্ববর্ণিত অস্ত যাবার বিশেষ ঘটনার মত বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে! ইংরেজিতে বলা হয় heliacal rising, বাংলায় সূর্যাতিগ উদয়।

তারাদের সূর্যাতিগ অস্তগমন আর সূর্যাতিগ উদয়, তাদের সাময়িক ভাবে আত্মগোপন করা আর পরে আবার আত্মপ্রকাশ করা—পর্যায়ক্রমিক এই ঘটনাগুলো পৃথিবীতে সংঘটিত ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে তথা বর্ষচক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। বিভিন্ন তারার সাহায্যে ঐ ঘটনাগুলোকে ধৈর্যের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলে ঋতুদের আসা যাওয়ার হিসাব রাখা যায়—পূর্বাহ্নেই তার আভাস পাওয়া যায়। সেই ভিত্তিতে পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা যায়। সুপ্রাচীন কালে মানব সভ্যতার পীঠস্থানগুলোতে এ-কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করা হত!

আমরা ভারতবর্ষে যে তারাটিকে লুব্ধক বলি ইওরোপীয়রা বলেন সিরিয়াস (Sirius)—যার জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত নাম আলফা ক্যানিস মেজরিস (Alpha-canis Majoris)—সে তারাটিকে প্রাচীন মিশর দেশে দারুন সম্ভ্রমের চোখে দেখা হত। তারাটির নাম ছিল ওখানে সোথিস (Sothis)—ওটি নাকি ছিল শস্য সম্পদের দেবী আইসিস (Isis)-এর তারা। সে প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কথা। তখন দক্ষিণায়নের শুরু হত। আজকের হিসাবে ২৫শে জুন তারিখে, আর মিশর থেকে প্রায় নিখুঁত ভাবে ঐ তারিখেই তখনকার দিনে সোথিসের সূর্যাতিগ উদয় দেখা যেত। প্রাচীন মিশরীয়রা সেটা লক্ষ করত আর বুঝতো—এবার বর্ষা আসছে, আসছে নীলনদের দু'কূলপ্লাবী বন্যা তার যত কিছু ভাল মন্দের পসরা নিয়ে। প্রধানত নীলনদের অববাহিকার বসবাসকারী সেকালের মিশরীয়দের জীবনে সেটা ছিল এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যাঁরা মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন মিশরের সবিশেষ অবদানের কথা জানেন, তাঁদের উচিত সোথিস বা লুব্ধক নামের তারাটির কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখা। সভ্যতা ও-তারাটির কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী।

ইতিহাসের পাতা উল্টে পাঁচ হাজার বছর পার হয়ে

আসা যাক। চলে আসা যাক সুপ্রাচীন মিশর থেকে উনিশ শতকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে তখন ক্রীতদাস-প্রথা চলছে—কিন্তু কিছুটা বাধা-নিষেধের মধ্যে। উত্তরের রাষ্ট্রগুলোতে প্রথাটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে শুধু তার বিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়েছে আইন হয়েছে নতুন করে কাউকে ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খল পরানো যাবে না, তবে যারা আগে থেকেই ক্রীতদাস হয়ে রয়েছে, মালিক স্বেচ্ছায় মুক্তি না-দিলে আমৃত্যু ক্রীতদাসই থেকে যাবে, এমন-কি ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে তার বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততিদেরও। হতভাগ্য এই ক্রীতদাসদের জীবনে মুক্তির আর কোন পথই ছিল না – শুধু পালানোর পথ ছাড়া। পালাতে হবে—পালাতে হবে পেনসিল-ভানিয়া (*Pennsylvania*) বা ওহাইও (*Ohio*) বা ইলিনয় (Illinois) বা আরও উত্তরে কোথাও। সেই পথই বেছে নিয়েছিল শত শত কৃষ্ণকায় মানুষ। হিংস্র প্রভুদের চোখে ধুলো দিয়ে ওরা পালাত। অনেক সময়ে ধরা পড়ত, শাস্তি হিসাবে অনেককে চরম মূল্য দিতে হত কিন্তু তবু ঝুঁকি নিয়ে পালাবার চেষ্টা ওরা করত। কারণ ওদের কাছে বিকল্প জীবন ছিল মৃত্যুরই নামান্তর। ম্যাপ ছিল না, কম্পাস ছিল না – কিন্তু মাথার উপরে ধ্রুবতারা। ওদের চরম দুর্ভোগপূর্ণ সেসব অভিযানের অনেক মর্মন্তুদ কাহিনী রচিত হয়েছে। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের লেখনীতে, আর সেসব রটনার পাতায় পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে ধ্রুবতারা। কারণ ধ্রুবতারা ছিল বহু ক্রীতদাসের মুক্তির দিশারী।

ধ্রুবতারা বা অন্যান্য তারাদের বন্ধুত্বের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়নি। আজও বিদেশ-বিভুঁইয়ে ঠেকায় পড়ে গেলে ওদের সাহায্য পাওয়া যায়। তাই তো আজও সৈনিক, নাবিক প্রভৃতিকে এমন-কি বয়-স্কাউট বা গার্ল-গাইডদেরও কিছু কিছু তারা চেনানো হয়। মহাকাশ-*চারীদের প্রশিক্ষণেরও একটা অঙ্গ তারা-চেনা। মহাকাশেও* দিগ্‌ভ্রম হতে পারে; আর সেখানে কম্পাস থাকলেও, তা কোন কাজে লাগে না। তারারাই সেক্ষেত্রে ভরসা।

তারারা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েই আছে। শুধু বাড়ানো হাত ধরতে জানা চাই।

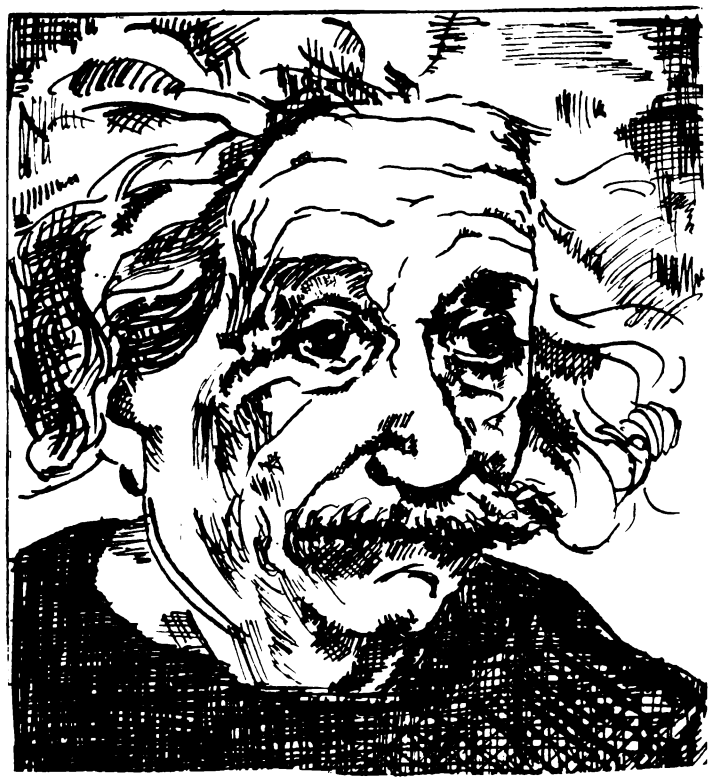

চন্দন
দাশগুপ্ত

গ্যালিলিও ও আধুনিক বিজ্ঞান

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞানের ইতিহাস লক্ষ্য করলে এটা দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের বিকাশ সমান ভাবে, সমবেগে কোথাও ঘটেনি। কোথাও দ্রুত বিকাশের পর হঠাৎ বন্ধ্যা দশা চলতে দেখা গেছে, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত বিজ্ঞান চর্চায় আবার নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এটা প্রায় সবসময়েই ঘটেছে যে বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশ যে সমস্ত স্থানে হয়েছিল, সেখানে ঐ সময় প্রযুক্তি ও অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতি ঘটে চলছিল। এই সূত্রেই ব্যাখ্যা করা যায় কেন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঞ্চারপথ প্রাচীন মিশর ও মেসোপোটেমিয়া থেকে গ্রীস হয়ে স্পেনে ; তারপর সেখান থেকে নবযুগের ইতালি ঘুরে জার্মানী ও ইংলণ্ডে এবং পরবর্ত্তীকালে এই শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকা ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে। ইউরোপের নবজাগরণই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। এসময় থেকেই মামুলী মধ্যযুগীয় চিন্তার বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। শিল্প, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি—অর্থাৎ মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সমগ্র চিন্তা ও চেতনার জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এই সময়েই। নবজাগরণের প্রথম যুগে ধ্বংসাত্মক কাজই ছিল প্রধান। এরপরই শুরু হয় নতুন চেতনার ভিত্তিভূমি গড়ে তোলার কাজ। এসময় কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের মতবাদকে গির্জা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা বড় জেহাদ হিসাবে ধরা হয়। কোপার্নিকাসের মতবাদকে কেপলারের গবেষণা আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। সংঘাত ও সংঘর্ষ আরো তীব্র হয়ে উঠে। কোপার্নিকাসের মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় ও ক্যাম্পানেলার ভাগ্যে জোটে দীর্ঘ কারাবাস।

এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়েই গ্যালিলিও গ্যালিলির আবির্ভাব (১৫৬৪-১৬৪২)। গ্যালিলিও ছিলেন ইটালির পাড়ুয়ায় পদার্থ বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক। তিনি খবর পেলেন যে দুটি চশমার কাচের ভেতর দিয়ে দেখলে দূরের জিনিষকে খুব কাছে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি এ খবর শোনার পরেই এ রকম দূরবীন বা দূরবীক্ষন যন্ত্র বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কিছু দিনের মধ্যে বানিয়েও ফেললেন। গ্যালিলিও ছিলেন কোপার্নিকাসের মতবাদের একজন দৃঢ় সমর্থক। তাই তিনি দূরবীনের সাহায্যে মহাকাশের গ্রহ ও উপগ্রহাদি পর্য্যবেক্ষনের সিদ্ধান্ত নিলেন। মাত্র কয়েক

রাত্রির পর্যবেক্ষন থেকে পাওয়া ফলাফলেই তিনি বুঝলেন বিশ্ব সম্পর্কে অ্যারিষ্টটলের প্রচলিত ধারণা কত অসার। চাঁদের মধ্যে পাহাড় ও সাগরগুলিকে তিনি দেখলেন। চাঁদের মত শুক্র গ্রহের বিভিন্ন কলা তিনি লক্ষ্য করলেন। সবচেয়ে চমৎকার বিষয় তিনি দেখলেন বৃহস্পতি গ্রহে। সেখানে তিনটি উপগ্রহ বৃহস্পতিকে পরিক্রমা করে চলেছে। এ যেন একটি ক্ষুদ্র কোপার্নিকাস-ব্যবস্থা। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তার পর্যবেক্ষণের ফলাফল "নক্ষত্র প্রেরিত সংবাদ" নামে একটি পুস্তকে প্রকাশ করেন। তার এই পরীক্ষালব্ধ ফলাফল এমনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যে অ্যারিষ্টটলের অন্ধ সমর্থকরা দূরবীন দিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকাতে পর্যন্ত অস্বীকার করত। গ্যালিলিও ভাবলেন - মহাকাশের গ্রহের গতি পর্যবেক্ষন করে কোপার্নিকাসের মতবাদের প্রমাণ দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি যে প্রতিনিয়ত পরিক্রমা করে চলেছে—এই স্থায়ী ব্যবস্থা কি করে সম্ভব এটাও মানুষকে বোঝানো দরকার।

এই উদ্দেশ্যেই তিনি স্থিতিশীল পদার্থের ধর্ম ও বল প্রয়োগে বস্তুর গতিপ্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ের মৌলিক নিয়মগুলি বার করার দিকে মনসংযোগ করেন। পতনশীল বস্তুর বিষয়ে গ্যালিলিওর ধারণা ছিল যে পতনশীল বস্তুর গতিবেগ, বস্তুটি যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে, তার সমানুপাতিক। কিন্তু পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন যে তাঁর ধারণা ভুল। বস্তুতপক্ষে বস্তুর গতিবেগ যতক্ষণ ধরে বস্তুটি পতনশীল থেকেছে, সেই সময়ের সমানুপাতিক। পরীক্ষালব্ধ সত্যকেই তিনি স্বীকার করে নিলেন। গ্যালিলিওই হলেন আধুনিক পরীক্ষামূলক পদার্থ বিজ্ঞানের জনক। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান শুধুমাত্র পরীক্ষককেই সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করে না, অন্যকেও এই সত্য উপলব্ধি এবং গ্রহণ করতে বাধ্য করে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে বিপ্লব ঘটে চলেছে তার মূলে ও রয়েছে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের মৌলিক গুরুত্ব।

গ্যালিলিও তার জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তিতে একটি বই লেখেন। এর নাম ছিল "টলেমি ও কোপার্নিকাসের দুই প্রধান বিশ্ব ব্যবস্থার আলোচনা" (Dialogue concerning the Two chief Systems of the world, Ptolemie and Copernican)। এই বইটি বিদ্বজ্জনের ভাষা ল্যাটিনে লেখা হয়নি। এই বইটি তিনি সাধারণ মানুষের কথা বলার ভাষা ইটালিয়ানে লিখেছিলেন। এ বইতে তিনি নির্দয়ভাবে সে যুগের প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিলেন। গির্জার পাদ্রীদের মধ্যে, এমনকি বিজ্ঞানী মহলেও গ্যালিলিওর অনেক শত্রু ছিল। এই বইটি প্রকাশনার সাথে সাথে তার শত্রুরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। শুরু

হল তাঁর বিচার। বিচারের ফলাফল ছিল পূর্বনির্ধারিত। তাঁকে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা জ্ঞাপন করতে বাধ্য করা হল এবং অন্তরীণ থাকতে হোল। গ্যালিলিওর বিচার বিজ্ঞান ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর দ্বন্দ্বকে নাটকীয়ভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে তুলে এনেছিল। গ্যালিলিওর মতবাদই পুরোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারণার উপর চরম ও শেষ আঘাত হেনেছিল। গ্যালিলিও তাঁর সারা জীবনের দীর্ঘ তিরিশ বছরের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল নিয়ে একটি

পুস্তক রচনা করেন। এ বইটিতে শিক্ষক ও তার দুই ছাত্রের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে বস্তুর স্থিতাবস্থা ও গতিশীল অবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপনা করা হয়েছে। বইটির নামকরণ হয়েছিল "দুই নতুন বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচ্য (Dialogues concerning Two New Sciences) জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অন্তরীণ অবস্থার মধ্যেও তিনি এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন এবং বিদেশে পাচার করেন। সেখান থেকেই এই বই প্রকাশিত হয়। ১৬৪২ সালে গ্যালিলিও মারা যান। ঐ বছরেই আইজ্যাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই প্রায় চল্লিশ বছর পরে মহাকর্ষ তত্ত্বের সাহায্যে কেপলারের পরীক্ষালব্ধ নিয়মকে দৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞানে আর একটি বিপ্লব ঘটালেন।

নবজাগরণের সময় যে আধুনিক বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছিল তার যাত্রা আজো অব্যাহত রয়েছে। এ সময় থেকেই বিজ্ঞানের ব্যবহারিক গুরুত্ব বাড়তে শুরু করেছিল। তখন থেকেই বিজ্ঞানকে উৎপাদনের সহায়ক শক্তি হিসাবে ব্যবহার করেই ইউরোপ তার অর্থনীতির বিরাট অগ্রগতি ঘটিয়েছে। আজকের বিজ্ঞান আর শুধু সহায়ক শক্তি হিসাবে থেমে থাকেনি, বিজ্ঞান সরাসরি উৎপাদিকা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের পরিতাপের বিষয় এই যে স্বাধীনতা পাবার তেতাল্লিশ বছর পরেও, ভারতে বিজ্ঞান চর্চার আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছে না। এর একটাই কারণ যে বিজ্ঞানে মহান সৃষ্টির প্রেরণা শুধু ব্যক্তিগত বৈষয়িক উন্নতির চাহিদা থেকে আসতে পারে না। গ্যালিলিওর মত বিজ্ঞানীরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির পরিবর্তে নির্যাতিত হয়েই মহৎ সৃষ্টি করে গেছেন। আজকে যারা কিশোর ও তরুণ তাদের বুঝতে হবে যে যদি নতুন অবদান কিছু রাখতে হয়, তবে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়েই সৃজনের বিষয় বেছে নিয়ে তিক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। স্থিতাবস্থা বজায় রেখে প্রচলিত পথে ধাবিত হয়ে আমাদের দেশের বা জাতির স্বার্থের অনুকূল মহান সৃষ্টি সম্ভব নয় বলেই, বর্ত্তমানে আমাদের বিজ্ঞান চর্চা আজও এত নিষ্প্রভ। অমসৃন ও বন্ধুর পথে পথ চলার মানসিকতা এ দেশের বিজ্ঞানীরা হারিয়ে ফেলেছেন। বিদেশের অন্ধ তৃতীয় শ্রেণীর অনুকরণ করেই নাম যশ পেতে চাইছেন। আমাদের দেশের শাসকবর্গও যে যত বিদেশের জমিতে থেকেছে তাদেরকেই বাহবা দিচ্ছেন। অন্যদিকে আমাদের দেশ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, আত্মত্যাগী ও সমাজসচেতন আগামীদিনের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। আজকে যারা তরুণ তাদের মধ্য থেকে নতুন ধাঁচের বিজ্ঞানীর আবির্ভাব জাতিকে ধন্য করবে। তারাই হবে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ভারতীয় মনীষীদের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

বিজ্ঞানী সমাচার

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

সাত তলা বাড়ীটার ছাদে গিয়ে,
সারা রাত, দূরবীণে চোখ দিয়ে,
একভাবে, আকাশে, কী দেখে যান !
সে খবর, সকলে তো জানে না !
আর কিছু, তাকে বেশী টানে না, —
চান, শুধু তারাদেরই সন্ধান !

কত কী যে লিখে যান কাগজে !
দেখলেও, সকলে কী, তা বোঝে ?
বোঝেনা তা, ঠিক কেউ বোঝে না !
জানেন, বোঝেন কত কী, নিজে !
কত বড় বিজ্ঞানী তিনি, যে !
তারা-টারা, সকলে তো খোঁজে না !

এক ডাকে চেনে তাকে, পাড়া-তে।
মন তার ডুবে আছে —
'তারা'-তে !
নীল—'তারা' খুঁজে, কাজে লাগাবেন।
চোখ রেখে শুধু দূরবীনে, যে,
কত দিনে, কত 'তারা' চিনে, যে,
বিজ্ঞানে, সাড়া, তিনি জাগাবেন !!

শব্দ চিকিৎসা

রতন মোহন খাঁ

মানুষ কথা বলে, শব্দ হয় আর ঐ শব্দে কেউ হয় অনুরাগী কেউ হয় অনুযোগী। আসলে কোন বস্তু কাঁপলে ঐ কাঁপন বা কম্পন বিশেষ মাধ্যমের (যেমন বাতাস) মধ্য দিয়ে তরঙ্গাকারে বাহিত হয়ে আমাদের কানের মত কোন গ্রহণযন্ত্রে আঘাত করলে গ্রাহকের মধ্যে যদি অনুভূতি জাগে, তবেই সেটি শব্দ বলে প্রতিভাত হয়। শব্দ তরঙ্গ রেডিও তরঙ্গ বা তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ হয়। শব্দের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা যথাক্রমে কম্পন বিস্তার ও কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে। মানুষ তার স্বরনালী দিয়ে তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে অঘটন ঘটায় সুরের মূর্ছনায়, গুরু-গম্ভীর আলোচনায় ও বিবাদের বাঞ্জনায়। অন্যদিকে শব্দ শুনে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি উৎসের চরিত্র।

শব্দ তরঙ্গাকারে বাহিত হয় বলে শব্দের গতি আছে। মাধ্যম ছাড়া শব্দ তরঙ্গ বাহিত হয় না। শব্দের বেগ মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সমুদ্রতলে শীতল সমীরণে শব্দের গতি ১১০০ ফুট / সেকেণ্ড বা ১২০০ কিমি. / ঘণ্টা, সমুদ্রজলে শব্দের গতি প্রায় ৪৭০০ ফুট / সেকেণ্ড বা ১,৪৩২ মিটার / সেকেণ্ড। ষ্টীলের মধ্যে শব্দ প্রবাহিত হয় ১৬,৪০০ ফুট / সেকেণ্ড বা ৫,০০২ মিটার / সেকেণ্ড গতিতে। কিন্তু শব্দের গতি কখনই আলোর গতির ধারে কাছেও যেতে পারে না। শব্দ শক্তিরই এক রূপ। আমাদের কানের শব্দ শক্তি সহ্য করার একটা সীমা আছে। $১০^{-১১}$ কিলোওয়াট / ঘণ্টা শক্তিতে আমাদের কানের ক্ষতি হয়। আমাদের কানে শব্দ অনুভূত হয় ২০ থেকে ২০,০০০ কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গ। বাতাসে শব্দের বেগের থেকে কম বেগে ধাবমান বিমানকে বলে সাব-সোনিক, অধিকতর বেগে ধাবমান বিমানকে বলে সুপার সোনিক। কয়েক মিলিয়ন কম্পাঙ্কের তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট শব্দকে বলা হয় আলট্রা সোনিক। এসব নানা ধরনের শব্দকে মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগিয়েছে বহু ক্ষেত্রে, যেমন – সমুদ্রের গভীরতা মাপতে, বস্তুর অবস্থান জানতে, গর্ত খুঁড়তে (drilling), ক্লান্তির উপশম করাতে বিনোদনে মাধুর্য সৃষ্টিতে। গভীর সমুদ্রে

মাছের ঝাঁকের ব্যাপকতা জানা যায় শব্দের প্রতিধ্বনির সাহায্যে। শব্দোত্তর তরঙ্গ সমুদ্রে পাঠালে মাছের দেহের ভিতরের পটকা ফেটে যায় আর মরা মাছ জলে ভেসে ওঠে। এভাবে অনেক জায়গায় মাছ শিকার করা হয়। অধুনা শব্দকে মানুষের রোগ নিরূপণে ও নিরাময়ে কাজে লাগান হচ্ছে। এ চিকিৎসার নাম শব্দ চিকিৎসা।

শব্দের প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে বহুদিন আগেই চিকিৎসকের স্টেথোস্কোপ তৈরি হয়েছে। কিন্তু গত তিন দশকে চিকিৎসার নানা ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য গবেষণা বেশ দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে। যদিও শল্যচিকিৎসায় স্থান করে নিচ্ছে লেসার পদ্ধতি কিন্তু আরো নিখুঁত ফল পাওয়া যাচ্ছে শব্দ পদ্ধতিতে। রোগীর দেহে একটি চোঙ লাগিয়ে নানা কম্পাঙ্কের শব্দ পাঠানো হলে সুস্থ কোষগুলি সক্রিয় হয়ে অসুস্থ কোষগুলিকে উদ্দীপ্ত করে এবং ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্থ অংশ সেরে ওঠে। এরকম এক পদ্ধতি ইনট্রাফল—১ মূত্রনালীর রোগ নিরাময়, কিডনী, পিত্তনালী ও প্রস্টেটের চিকিৎসায় বিশেষ সহায়ক।

ইতিমধ্যে কয়েকটি আলট্রাসোনিক মেডিকাল যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। সাধারণতঃ শরীরে ইনজেকশন মারফৎ ওষুধ দেওয়া হয়। এই ওষুধ সারা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ওষুধের কার্যকারিতা কমে এবং আনুষঙ্গিক ক্রিয়া দেখা দেয়। আলট্রাসোনিক ব্যবস্থায় ওষুধটি নির্দিষ্ট স্থানে সরাসরি ক্রিয়াশীল হয়। আলট্রা সাউন্ড জৈব টিস্যুকে কাঁপিয়ে তোলে একবার সংকুচিত একবার প্রসারিত করে। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় যাবার সময় টিস্যুর কণিকাগুলির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এই চাপ পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের কয়েক লক্ষ গুণ হওয়ায় টিস্যুতে রক্তের প্রবাহ বাড়ে, বিপাক ক্রিয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ফলে ওষুধের ভেদ্যতা ও প্রয়োগগত তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয়ভাবে ওষুধ বেশি কার্যকরী হয়। আলট্রাসোনিক ব্যবস্থার প্রয়োগ হচ্ছে ইউরোলজি (মূত্ররোগ বিদ্যা), গাইনীকোলজি (স্ত্রীরোগ বিদ্যা), স্টমাটোলজি (যে চিকিৎসাবিদ্যার বিষয় মুখ ও তার পীড়া), পেডিয়াট্রিকস (শিশুরোগ বিদ্যা) এমন অনেক চিকিৎসাবিদ্যায়। যারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনায় কষ্ট পায়, যারা স্নায়ুরোগে আক্রান্ত, যে সব মায়েরা শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াতে ইচ্ছুক অথচ দুধ নেই তারা এই চিকিৎসায় উপকৃত হয়ে থাকে।

প্যানক্রিয়াটাইটিস হল প্যানক্রিয়াসে এক জটিল ভয়াবহ রোগ। এই রোগে প্যানক্রিয়াস ফুলে যায়, নালী ঘা ও পুঁজ হয়! এ রোগের চিকিৎসায় অপারেশন খুব বিপজ্জনক! এখন এ রোগের চিকিৎসায় এনডোস্কোপ যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এর সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গ পাঠিয়ে ক্ষতস্থান চিহ্নিত করা যায় এবং ওষুধ ঢোকান যায়। তবে প্যানক্রিয়াসের রোগের চিকিৎসায় অত্যাধুনিক যন্ত্র হল লেপারোস্কোপ।

অপারেশনের নামে আমরা সবাই ভয় পাই। কিডনীতে পাথর হলে অপারেশনই আরোগ্যলাভের পথ। সম্প্রতি অপারেশন ছাড়াই পাথর দূরীকরণের জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, নাম ইউরাটিস। এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন মাত্রার আঘাতকারী তরঙ্গ (বিশেষ করে সুপারসোনিক তরঙ্গ) পাথরের উপর বর্ষিত হয়। ফলে পাথরের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয় এবং পাথর চূর্ণ হয়ে যায়। সমস্যা হচ্ছে চূর্ণ পাথরের বহিঃনিষ্কাশন ও আশেপাশের টিস্যুর উপর প্রতিক্রিয়া। আশা করা যাচ্ছে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে এবং ইউরাটিস কিডনীর পাথরের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হবে।

ব্রেনের অপারেশনেও আলট্রাসোনিক শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। খুলিতে গর্ত করে আলট্রাসোনিক শব্দ তরঙ্গের চারটি গুচ্ছ পাঠান হয়। একটি গুচ্ছের তীক্ষ্ণতা টিস্যুর কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু একটি বিন্দুতে চারটি গুচ্ছ যখন একসঙ্গে পতিত হয় তখন যে তাপমাত্রা সৃষ্টি হয় তাতে ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু বিনষ্ট হয়। এ পদ্ধতি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পারকিনসন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

আশা করা যায়, সহজ সরল ও পার্শ্বক্রিয়া বর্জিত শব্দ চিকিৎসা অচিরেই চিকিৎসা জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

ভণ্ডুলের বিজ্ঞান চিন্তা

লেখায়: বিমল চক্রবর্তী। রেখায়: দিলীপ দাস

উজবুক কোথাকার!
এটা ডি.সি. বলে খুব জোর বেঁচে গেলি, নয়তো ঐখানেই মরে ঝুলে থাকতে হতো!
ঝাপস্!
তোর এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ভাল, তবে বিদ্যুৎ নিয়ে কাণ্ডজ্ঞান-হীনভাবে এরকম নাড়া-চাড়া খুব ভেঞ্জারাস!
আয়, ওসব ছেড়ে তোকে বিদ্যুতের একটা মজার খেলা দেখাই!
ওতে আবার শক্ মারবে না তো?
এই চিরুনীটা দিয়ে চুলটা আঁচড়া।
কেন মাম্মু? কোথাও যাবে নাকি?
দূর্ হতভাগা! যা বললাম কর্।
এবার চিরুনীটা ঐ কাগজের কুঁচোগুলোর ওপর ধর্।
ওম্মা, কুঁচোগুলো কেমন লাফাচ্ছে দেখ!
এর কারণ হলো ঘর্ষণের ফলে চিরুনীটা ইলেকট্রিফায়েড হয়ে চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ঐ কাণ্ড!
চিরুনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ!
ঘর্ষনই আসল কথা!!!
এটা হল স্থির বিদ্যুৎ। পদার্থ মাত্রই সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এর ভেতর আবার রয়েছে ইলেকট্রন প্রোট্রন নিউট্রন ইত্যাদি।
তার মানে সব পদার্থেই একটা শক্তি রয়েছে?

আরও জেনে অবাক হবি, এই শক্তি শুধু পদার্থেই নয় জীবজন্তু এমন কি মানব দেহেও বর্তমান।
ব-বল কি মামু ?
কিছু সামুদ্রিক মাছ আছে যাদের গায়ে হাত দিলে ইলেকট্রিক কারেন্টের মত শক্ লাগে।
তবে তো . . . . আমরা তো খুব সহজেই অনেক বিদ্যুৎ পেতে পারি তাহলে এই লোডশেডিং-এর যন্ত্রণা দূর হতে পারে।
বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য নানাভাবে আরও সহজ উপায়ে বিদ্যুৎ পাবার ভাবনা চিন্তা করে চলেছেন
ওরা যখন এতদিনেও কিছু করে উঠতে পারেনি তখন আর পারবেও না। এখন দেখতে পাচ্ছি আমাকেই এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে।
খবরদার বলছি ভণ্ডুল, বিদ্যুৎ নিয়ে খেলা নয়! তাছাড়া এক জন বৈজ্ঞানিক হতে গেলে অনেক পড়াশোনা করতে হয়।
ফুঃ, মামু আমার এলেম জানে না, তাই এমনি বলছে। মামুর একটি কথাতেই আমি বিদ্যুৎ-এর উৎস পেয়ে গেছি। তবে এর জন্য একটু ঝুঁকি নিতে হবে, এই যা।
উপায় নেই, গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা কত কি করে! যাক যন্ত্রপাতিগুলোসব ঠিক ঠাক করে রাখি।
সব রেডি। এবার খালি এই তার দুটো জায়গামত জয়েন্ করে এবং একটু কষ্ট করে বিদ্যুৎ টেনে নেওয়া, ব্যাস্।

কিরে ভণ্ডুল, এই সাত-সকালে এত সব লট-বহর নিয়ে কোথায় চলেছিস ?
মামু, তোমার ঐ বিদ্যুৎ-এর নতুন একটা আবিষ্কার প্রায় করে ফেলেছি! এখন তোমার একটু সহযোগিতা প্রয়োজন
নিশ্চয় করবো। তুই নতুন একটা জিনিস আবিষ্কার করতে চলেছিস বলে কথা!
এ আবার কী ?
প্রথমে এই তার দুটো তোমার দু'হাতে জয়েন করে দেব। তারপর—
ওফস্, এ-এ-একি হচ্ছে? থাম্ থাম বলছি!
সরি মামু নড়ো না এখুনি তোমার দেহে ইলেকট্রনের প্রবাহ শুরু হবে, আর সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ—
হেঁইও-হেঁইও! আর শুধু ক'বার। আমার এই গবেষণা সফল হলে দু'জনেরই কত নাম-হবে। বিশ্বশুদ্ধু—
গর্দভ মানুষ মেরে বিদ্যুৎ!
অ্যাঁ!
মা-মা-মামা! আমাকে ছেড়ে দাও, আর করবো না!
আজ তোর সব বিদ্যুৎ টেনে বের করে ছাড়বো!
ফের যদি এ সব করতে দেখি তো তোর বৈজ্ঞানিকগিরি জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব!
ব্রাপস; মামু ঠিকই বলেছে, বিদ্যুৎ নিয়ে যাচ্ছেতাই খুব বিপজ্জনক!

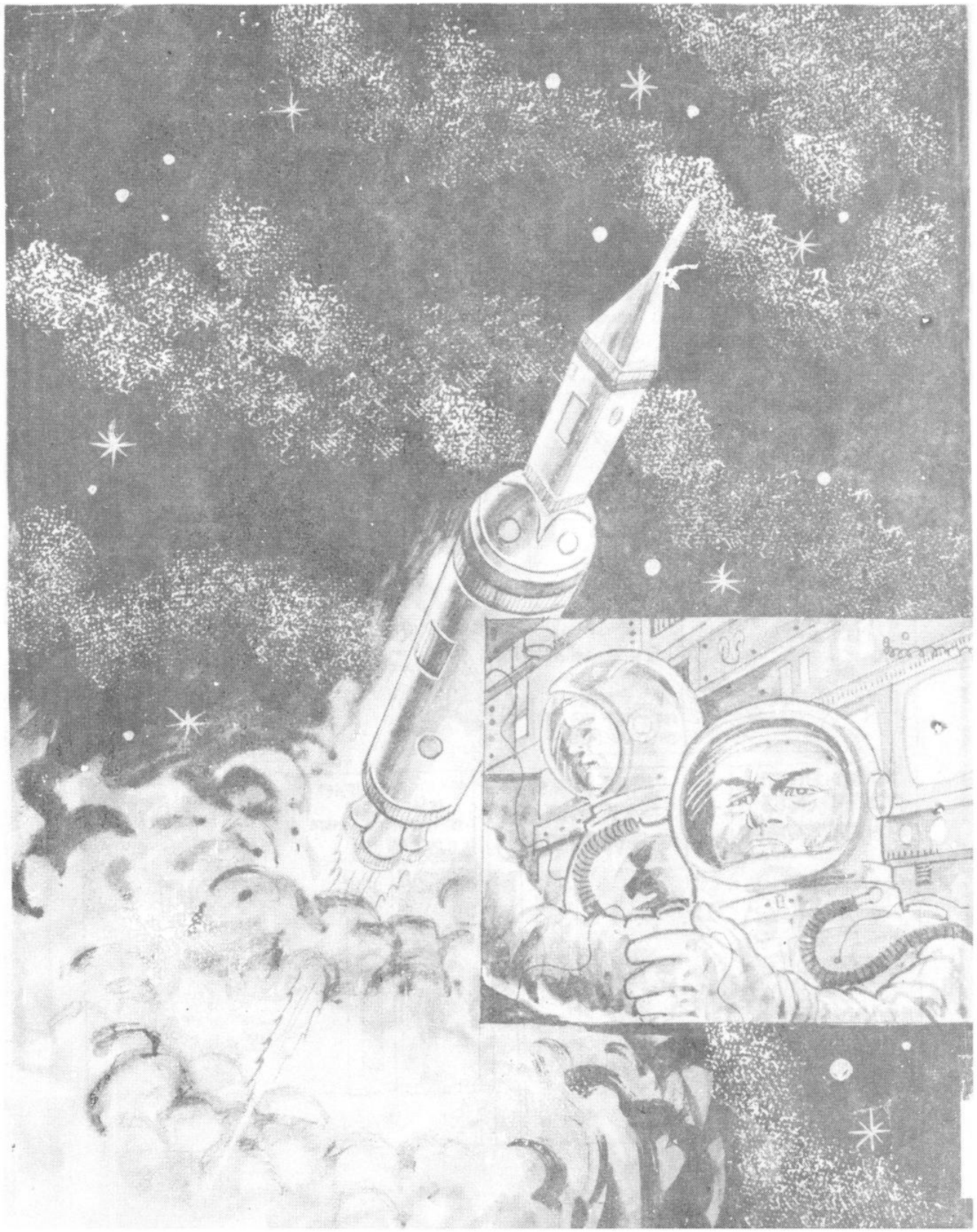

তোচন মহা চিন্তায় পড়ে।

বেশ কিছু দিন আগে সে নির্মাণ পরিকল্পনার একটা খসড়া পাঠিয়েছিল পরিবেশ ও আবাসন মন্ত্রকে। আশা করেছিল, খুব জলদি পরিকল্পনাটি অনুমোদন পাবে, এবং সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে সানন্দে। কিন্তু উত্তর পাওয়া দূরের কথা, প্রাপ্তি সংবাদটুকু আজ অব্দি পায় নি। অথচ রেজিস্ট্রি করেই পাঠিয়েছিল কাগজপত্তর সব।

প্রথমে ঠিক ছিল সে নিজেই যাবে দিল্লী। কিন্তু তখন 'মায়ামুগুর'-এর শেষ ছোঁয়া দিতে খুব ব্যস্ত ছিল। তাই ডাকেই পাঠিয়ে দেয় শেষমেশ। কাজু অবশ্য গাঁইগুঁই করেছিল, দু-একবার না-ও করেছিল কাগজপত্তর দিল্লী পাঠাতে। তবু বেশি পীড়াপীড়ি করেনি। জানে, বেশি বললে তোচনদা বেশি বেঁকে বসবে, শেষে হয়ত কাজটাই ছেড়ে দেবে।

আর এদিকে তোচন 'মায়ামুগুর' কাজের এক ফাঁকে পোস্টাপিস চলে যায় কাউকে না জানিয়ে, রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেয় খসড়াটা। বাড়ি ফিরে কাজুকে একটা 'সারপ্রাইজ' দেবে এই ছিল তার মতলব। আর সেটা দিতে গিয়েই খেয়াল হয়, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে, বিনা 'এ. ডি.'-তেই রেজিস্ট্রি করেছে চিঠিটা। 'এডি' সঙ্গে থাকলে সেটা ফিরে এলে বোঝা যেত – কাগজপত্তর পৌঁছে গেছে যথাস্থানে। গোড়ায় গলদ, সেই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে এখন। একটার পর একটা দিন যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক থেকে একটা জবাব বা প্রাপ্তি সংবাদ কিছুই আসছে না। রোজ চিঠির জন্য হা-পিত্যেশ অপেক্ষা করতে হচ্ছে, সব চিঠিপত্র-পত্রিকা আসে, কিন্তু যেটার জন্য হামলে আছে, সেটা-ই আসছে না শুধু। কেবল 'টেনশন্' বেড়ে চলেছে তোচনের।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক উত্তর দেবে না, এটা কি হতে পারে? তার উপর ব্যাপারটার গুরুত্ব আছে। আবাসন নিয়ে, মুক্ত জায়গা খোঁজা নিয়ে সবাই এখন উদ্বিগ্ন। তার পরিকল্পনা ঐ বিষয় নিয়ে। অথচ তার কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না গভর্মেণ্ট, অবাক লাগে খুব।

বোধহয় চিঠির গড়বড় হচ্ছে···

তোচন ডাক - পিয়নকে জিজ্ঞেসও করে। তাতে ডাক পিয়ন যেন একটু রুষ্ট-ই হয়। সে আরো ভয় পেয়ে যায়। চিঠিপত্র যাও বা আসছিল, এবার হয়ত তাও আসবে না ঠিক মত। ভাবে, আর ছটফট করতে থাকে।

এর মধ্যে অবশ্য 'রিমাইণ্ডার'-ও দিয়েছে। কাকস্য পরিবেদনা, কোনো জবাব নেই তার-ও। অথচ তর সয়না আর। কাজটা আরম্ভ করে দিতে হবে, নইলে অন্য কেউ এমন কাজ ধরে ফেললে, তার কৃতিত্বটাই মাঠে মারা যাবে। মন্ত্রকের সম্মতি পেলে আর্থিক দিকের কিছু সুরাহা হতো। তাছাড়া গভর্মেণ্ট অনুমোদন করলে নানা ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু সেজন্য আর কতদিন অপেক্ষা করা চলে!

তোচন মনে মনে ফুঁসতে থাকে, আরে বাবা, ভব্যতা সভ্যতা বলে তো একটা ব্যাপার আছে, উত্তর না দিস চিঠির, প্রাপ্তি সংবাদ তো দিবি, দিন দিন কি যে হয়ে যাচ্ছে দেশটা···

এখন নিজের হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় কী।

ডাকে চিঠিপত্র, জার্নাল আসে নিয়মিত। আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তো সব কিছু, মায় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত। তার ধারণা, বিজ্ঞাপন থেকে অনেক সময় 'আইডিয়া' লাফ দিয়ে উঠতে পারে, খুব ছোট-খাটো জিনিষ হঠাৎ বড় একটা কিছুর জন্ম দিতে পারে। তাই সে কোনো কিছু হেয় জ্ঞান করে না। গল্প আছে, গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখেই নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সূত্র পেয়ে যান। আর্কিমিডিস-ও নাকি তাঁর তত্ত্বের সূত্র আবিষ্কার করে ফেলেন, আর 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলতে বলতে সিরাকিউজের রাস্তা দিয়ে রাজবাড়ির দিকে দৌড়তে থাকেন।

এ সব জানলে তোচনের চোখের উপর দিয়ে অনেক কিছু ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে কোথা থেকে কোথায়। সে কিছু দেখছে না, ওসব নিয়ে ভাবছে না, জার্নালের বিশেষ বিশেষ লেখা পড়া দূরের কথা তখন।

তোচনের ব্যাপারটা আশ্চর্য ঠেকছে কাজুর কাছে। কী হয়েছে? সে দেখছে তাকে, অবাকের মাত্রা বাড়ছে কেবল। কিন্তু অবাক হলে চলে না শুধু, কাজ করে যেতে হবে তাকে। খাতায় ঠিকঠাক টুকে রাখছে কোন্ চিঠি কখন এসেছে এবং জার্নাল। একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় লিখছে যেন।

সে জানে, যে কোনদিন তোচনদা তলব করবে, তখন দেখতে হবে কোন্ তারিখে কখন কী এসেছে। তার মুড্ বোঝা ভার, এই হাসিখুশি তো এই গোমড়া। তবে সব সময় নয়, মধ্যে মধ্যে এমন হয়।

তোচনদার সঙ্গে অনেকদিন আছে কাজু--সে তার একান্ত সহকারী, ডানহাত, আজকালের ভাষায় চামচা—এই সব। তোচন তাকে পছন্দ করে খুব, সে ও তোচনকে ভালোবাসে, ভক্তি করে। তার মতে, তোচনদা লোকটা পেঁচুক নয়, খুল্লামখুল্লা সব কিছু বলে, সহজ সরল। মধ্যে মধ্যে মেজাজ খিচড়ে যায়, এই মাত্র। তো কী করা যাবে তাতে। ভালো মানুষের মেজাজ এমনটি হতেই পারে।

তোচনের মেজাজের ওঠা নামার বিষয়টা কাজুর প্রায় ঠোঁটস্থ। তবু সে কোন ঝুঁকি নেয় না। ছোট্ট একটা ডাইরিতে তারিখ দিয়ে খুব সংক্ষেপে লিখে রাখে—তোচনের 'মুড' কেমন ছিল বা সে কী করছে। অবিশ্যি তোচনের মেজাজ যখন বিগড়োয়, শুধু সেই সব দিনের কথা লিখে রাখে। যেমন এখন লিখছে নিয়মিত প্রায়—

১২ অক্টো

একটা টোস্ট ও ডিমে মাত্র এক কামড়, খাওয়া শেষ, পায়চারি কেবল।

১৩ অক্টো

ঘরময় পায়চারি অসংখ্যবার, খাবার পড়ে আছে তেমন।

১৪ অক্টো

কয়েক দলা ভাত ডাল দিয়ে মাত্র, মাছের বাটি তেমনই থাকে।

ক্যাসেট-এর সুইচ্ অন্ করে দেয়।

১৫ অক্টো

মর্জিনাদিকে আসতে লিখতে হবে, হাল ধরা মুস্কিল।

১৬ অক্টো

কেবল বিড়বিড় করছে, শেষমেশ না মাথা খারাপ হয়।

১৭ অক্টো

দুটো টোস্ট ও একটুকরো অমলেট মাত্র, তারপর পায়চারি ও যথারীতি বিড় বিড়।

১৮ অক্টো

কিছু খায় নি, পায়চারি করছে ও মধ্যে মধ্যে চুলে হাত দিচ্ছে, এইভাবে লিখে চলে কাজু।

মর্জিনাদির উত্তর এসেছে। তিনি জানিয়েছেন এখন আসতে পারছেন না, হাতে বহু কাজ আছে ইত্যাদি, তবে কাঁড়িকাঁড়ি উপদেশ দিতে ভোলেন নি মোটে--এটা কোরো, ওটা কোরো না, তোচনদার দিকে খেয়াল রেখো, স্বাস্থ্য যেন ভাঙে না তার।

চিঠি পেয়ে কাজু গজরাতে থাকে, খালি উপদেশ, এদিকে আমি মরছি নিজের ঠেলায়, কী যে হচ্ছে

তো কাজুর কিছু করার নেই। তোচনদাকে কী ভাবে বলবে, ভরসা পাচ্ছে না। বললে যদি রেগে যায়, রেগে গিয়ে যদি মেজাজ আরো খিঁচড়ে যায় তবে দফা রফা হবে তার, কেউ তা বুঝবে না, উপদেশ দিয়ে যাবে শুধু···

কাজুর হয়েছে জ্বালা। সে ব্যাপারটা গিলতে পারছে না, পারছে না উগরে দিতে। ছটফট করতে থাকে, কি করবে সে? ছেড়ে চলে যাবে নাকি?

ভাবতেই কেমন ভয় করতে থাকে। চলে গেলে তোচনদাকে দেখবে কে তবে? আর বাবা-মা-কে গিয়েই বা সে কী কৈফিয়ৎ দেবে? রঘুদা তেমন দড় নয়, সে কিছুতেই সামলে সুমলে রাখতে পারবে না তাকে।

অগত্যা কাজুকে থেকে যেতেই হচ্ছে, এসব দেখতে হচ্ছে, অথচ কিছু করতে পারছে না। তবু রোজের কাজে

ঢিল দেবার উপায় নেই, যে কোন মুহূর্তে তোচনের 'মুড' ভালো হয়ে যেতে পারে। ভালো হলেই সব তলব করবে তখন। কাজু কাজ করে চলে তাই।

চিঠি এলে খুলে পড়ে। তারপর খাতায় লেখে কখন এলো, বক্তব্য কি। আর পত্রিকা বা জার্নাল এলে টুকে রাখে পত্রিকার নাম-ধাম, সংখ্যা ইত্যাদি, তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেয়। তার বুদ্ধি মতো যে প্রবন্ধ গুলো গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরি, সেই প্রবন্ধ গুলিতে 'ফ্ল্যাগ' লাগিয়ে রাখে 'ভি আই' কিংবা 'আই' লিখে।

রোজই গুচ্ছের গুচ্ছের আজে বাজে চিঠি আসে। তবু চোখ বুলিয়ে যেতে হয় অন্তত, আর তাতে মেজাজ খাট্টা হতে থাকে খুব। কিন্তু সেদিন অবস্থা আরও সংগীন হতে থাকে কেন না তোচনদা কিছুতেই সহজ স্বাভাবিক হচ্ছে না, অন্যদিকে এ ব্যাপারে সে কিছুই করে উঠতে পারছে না। তার উপর এত বাজে চিঠি, বেশির ভাগই কেমিক্যাল ও সায়েন্টিফিক্ ইন্‌স্ট্রুমেণ্টের ক্যাটালগ। এ সব চিঠির কথা খাতায় টুকে রাখতে কার আর ভালো লাগে।

দুৎ তেরি, নিকুচি করেছি চিঠির, মেজাজ তিরিক্ষি হতে সে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়াতে গিয়ে চোখ গিয়ে পড়ে একটা খামের উপর। লম্বা খাম, কিন্তু খামের রং বাদামী সাদা বা ধূসর নয়, কয়েকটা রঙের ছিটে ফোঁটা মিলে মিশে বেশ চোখ-কাড়া। ঠিকানাটা বোধ হয় ইলেক্‌ট্রনিক টাইপরাইটারে টাইপ করা, চোখের সামনে তুলে ধরলে অক্ষর গুলো বাঁকা বাঁকা ঠেকে, অথচ 'ইটালিকস্' এর মতো নয়।

কাজু খুব সাবধানে ছোট কাঁচি দিয়ে খামের মুখ কাটে ফুঁ দিয়ে ফাঁক করে খামের মুখ, তারপর বুড়ো আঙুল তর্জনী সাঁড়াশীর মতো করে তুলে আনে চিঠিটা। দামী বণ্ড কাগজের নিচে ভারি মোলায়েম, ভাঁজ খুলতে সাবধান হতে হচ্ছে, যেন আঙুলের ছোঁয়ায় ময়লা হয়ে যাবে তখুনি। একই ছাঁচে টাইপ করা, ঠিকানায় যেমন। বাংলা করলে দাঁড়ায়—

প্রিয় বিজ্ঞানী তোচন,

আপনাকে চিঠি লিখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পৃথিবীর এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী আপনি। আমি একজন সাধারণ মানুষ, তবু আপনার গুণমুগ্ধ। আপনার সঙ্গে কি একবার দেখা করতে পারি? আপনাকে প্রথমে ফোনে পেতে চেষ্টা করি। ফোনে রিং হয়ে চলে, কেউ ধরে না অথচ। বুঝতে পারি ফোন খারাপ। তাই চিঠি দিচ্ছি। কি করে দেখা হতে পারে, তা জানালে সুখী হবো তারিখ ও সময় জানিয়ে দিলে আমি চলে যাবো আপনার আবাসে। আমার ফোন নম্বর ও ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। আমি সচরাচর বাড়িতেই থাকি, যে-কোনো দিন যে কোনো সময় এলে অসুবিধে হবে না। আগে ফোন করে জানালে অবশ্যই খুশি হবো। আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

ইতি—আপনার একান্ত সৎপৎ লাল।

তোচনের অনেক অনুরক্ত এমন চিঠি লিখে থাকে। কিন্তু চিঠিটা পড়া ইস্তক কাজুর মনটা যেন আনচান করতে থাকে। খুশি খুশি ভাবটা ছড়াতে থাকে সারা শরীরে। কী আছে এতে, মামুলি গতে লেখা, তবু সব দুলে দুলে উঠছে। কাজু ধরতে পারে না।

কিন্তু কেন যেন মনে হয়, তোচনদাকে এখুনি দেখানো দরকার। অথচ দেখাবে কেমন করে ভেবে পায় না, ভরসাও পাচ্ছে না। তোচনদা যদি আমল না দেয়, বা রেগে ওঠে 'ডিস্‌টার্ব' করছি বলে, তাহলে কেলেঙ্কারী কেচ্ছা হয়ে যাবে একটা।

তাই অপারক হয়ে শেষে অন্য চিঠির মতো এটা কখন পেলো কোন্ তারিখে লিখে রাখে শুধু। তারপর জার্নাল গুলো টেনে নেয়।

মন কি মানে তাতে? বারবার চিঠিটার দিকে মন চলে যায়, কে যেন ভিতর থেকে উসকে দিচ্ছে - আছে আছে, খবর আছে ওতে, তোচনদাকে দেখানো দরকার এখুনি।

টানাপোড়েন চলে অনেকক্ষন যাবে কি যাবে কি যাবে। না। শেষে আর পারে না কাজু। পর্দার ফাঁকে এসে দাঁড়ায়। দেখে – তোচনদা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে, চোখ তার বোঁজা, ডান হাত কপালের উপর, নিঃশ্বাস পড়ছে থেকে এবং ঘন, ঘুমলে যেমন হয়, মধ্যে মধ্যে মুখ ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, কখনো কখনো নাক ডাকার মৃদু শব্দ। তোচনদাকে কেমন বাচ্চা ছেলের মতো দেখাচ্ছে, যেন অনেক খেলেটেলে ঘেমে নেয়ে শেষে ঘুমের কোলে নেতিয়ে পড়েছে আহা, অনেকদিন ঘুমোয় না, ঘুমোক্ তোচনদা, ঘুমোক্ আরো। পর্দার কাছ থেকে সরে আসতে যাবে, এমন সময় শুনতে পায়, কাজু।

অনেক অনেকদিন পর এমন আদুরে ডাক শুনছে সে কাজু যেন কেমন বিমূঢ় হয়, সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাড়িয়ে দেয় পর্দার ফাঁক দিয়ে।

আয়, খুব স্নেহময়;

কাজু থতমত খেয়ে কি করবে ভেবে পায় না। হড়-

বাড়িয়ে ঢুকে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ প্রণাম করে বসে তোচনকে।

আরে, আরে কী করছিস্, তোচন পা সরাবার ফুরসৎ পায় না। ততক্ষণে প্রণাম সেরে ফেলেছে কাজু।

তোচনও তাকে তুলে ধরেছে। গালে ঠোনা মেরে বলে, দুষ্টু কোথাকার।

অনেক অনেকদিন পর কাজু তোচনদার চোখ মুখ ও মায়া মমতায় উথলে উঠতে দেখে।

নিশ্চয় দোষ করেছিস ?

কাজু চুপ করে থাকে।

তবে এত প্রণামের ঘটা যে ? কি করেছিস ?

কিছু না, কাজু সহজ হচ্ছে বেশ।

তবে ?

কি ভাবে পাড়বে চিঠির কথা, তার মক্স যুত করে উঠতে পারে না ঝটিতি।

তাকায় তোচনের দিকে, সরাসরি বলে ফেলবো কি ? বললে যদি চটে ওঠে ?

চুপ করে আছিস যে ?

কাজু একটু ইতস্তত করে, মানে একটা চিঠি, জরুরি মনে হচ্ছে···

চিঠি ? দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে কাজু দৌড়ে গিয়ে চিঠিটা আনে।

তোচন চিঠি নেয়, এবং পড়ে ফেলে দ্রুত।

পড়া শেষ হলে তাকায় কাজুর দিকে। সেই চাউনিতে কাজুর বুক ধক্ ধক্ করে ওঠে।

তোচনদা কি খেপে গেল ? ওরকম ভাবে তাকাচ্ছে কেন তবে ?

কাজু মনে মনে এতটুকু হয়ে যেতে থাকে, কি দরকার ছিল তোচনদাকে চিঠি দেখানোর, মা বলতেন—আগ বাড়িয়ে সব করা তোর একটা দোষ। মা-র কথা যে কত সত্যি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন।

ছি ছি, কী দরকার ছিল, একটা মামুলি চিঠি হয়ত, লজ্জায় সে তোচনের দিকে তাকাতে পারে না।

তোচন তার দিকে তাকায় কি তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, তোর মত কি ?

প্রশ্ন শুনে কাজু ঘাবড়ে যায়, তোচনদা কি সম্বন্ধে মত চাইছে তার ? সে তাকায় তার দিকে তখন।

কি, বল্ ?

কাজু এতক্ষণে বোঝে যে তোচনদা চিঠির সম্বন্ধে তার মত চাইছে। সে হড়বড়িয়ে বলে ওঠে, মানে যখন ডেকেছে।

তখন যাওয়াই উচিত, তাই না ? তোচন সস্নেহে তাকায় কাজুর দিকে।

হাঁ, সেটাই তো···

টেলিফোন কর্ তবে, সম্পৎলাল কী বলেন একবার দেখাই যাক্।

তোচন আর কথা বাড়ায় না। ইজি চেয়ার থেকে উঠে পড়ে।

বোধহয় পাবি, ততক্ষণে আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি, তোচন এগিয়ে যায় আলনার দিকে জামা কাপড় পরতে।

আর কাজু চলে আসে টেলিফোনে।

দুই

সম্পৎলালের বৈঠকখানা বেশ জমজমাট-ই বটে। আর পাঁচটা বড় বাড়ির বৈঠকখানার মতো জবড়জঙ সাজানো নয়, ছিম-ছাম, রুচির পরিচয় আছে। সোফা, কৌচ, সেণ্টার-টেবিল, এ্যাসট্রে আছে এবং টেলিফোনও ঘরের এক কোণে নীচুতে পায়ার উপর। কিন্তু সব বেশ দামী কাঠের এবং তাদের আদি পালিশ অটুট আছে বেশ। সামনের দেয়ালে কেবল একটা জল ছবি, অন্য দেয়াল ফটফটে পরিষ্কার।

এক ভদ্রলোক তাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন। তিনি বোধ হয় সম্পৎলালের সচিব কিংবা রিসেপসনিস্ট। নইলে তিনি তোচন ও কাজুর আসার খবর জানবেন কি করে ? টেলিফোন সোজা সম্পৎলালই ধরেছিলেন, তিনি নিশ্চয় এঁকে বলে দিয়েছেন এদের আসার খবর।

ব'সে কাজু একটু উত্তেজনা বোধ করতে থাকে। অথচ ঘর নিস্তব্ধ, ভিতর থেকেও কোনো শব্দ আসছে না, মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই।

কেন, কী জন্যে তিনি ডাকলেন—সেটা তখুনি জানতে চায় কাজু, তার যেন তর সইছে না মোটে। অথচ তোচন কিন্তু নির্বিকার ভাবে বসে আছে। মনে হচ্ছে, সে যেন জানে সম্পৎ কী বলবেন। তবে তোচন মধ্যে মধ্যে কাজুকে দেখছে। কাজুর নড়াচড়া, উস্খুশানি নজরে পড়ছে খুব, আর মনে মনে বলছে - অত অস্থির হচ্ছিস কেন, ধীরে বন্ধু ধীরে।

তবে তোচনের স্থৈর্য একটু টাল খাচ্ছে এখন। সম্পৎলাল আসতে যেন একটু বেশি সময় নিচ্ছেন। তার

শুধু একটু কেঁচকায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শান্ত স্বাভাবিক করে নেয়। এ-সময় মেজাজ ঠিক রাখতে হবে সে জানে।

তোচন তাকায় কাজুর দিকে। তার চোখে চোখ পড়তে কাজু থামকা হেসে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটে এমনি।

এর পরই সম্পৎলাল ঘরে ঢোকেন, এক্সকিউজ মী, দেরি হয়ে গেল মিস্টার তোচন।

তা তেমন দেরি নয়, আর একটু হলে হয়ত

সম্পৎ তার দিকে তাকিয়ে হাসেন, আপনি তো আবার উপাধি ব্যবহার করেন না প্রোফেসার তোচন।

উঁহুঁ, আমি কিন্তু ম্যাজিশিয়ান নই, ইউনিভারসিটি কিংবা কলেজেও পড়াই না বুঝেছেন, কিন্তু আপনিও তো

সম্পৎ হেসে ওঠেন বেশ জোরে, খেয়াল করেছেন?

তোচন কাজুকে দেখায়, কাজু, আমার বন্ধু সহকারী সব কিছু।

আচ্ছা আচ্ছা, নমস্কার মিস্টার কাজু, সম্পৎ একটু থামেন, আপনিও বোধ হয় 'সায়েনস্' ব্যবহার করেন না?

কাজু হেসে সমর্থন করে।

সম্পৎ বসলেন সামনের কৌচে, রঘুদাও বোধ হয়...

কাজু ও তোচন তাঁর কথায় অবাক হয়েই সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক হয়।

তার কথাও জানেন দেখছি?

জানবো না কেন, রঘুদা তো আপনার—

আরেক বন্ধু ও সহকারী, তোচন সম্পৎকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে ওঠে। জানি, জানি। আপনাদের অনেক কথাই জানি। এরকম একটা টিম্ সত্যি ঈর্ষার। সম্পৎলাল একটু থামেন, তারপর তাকান তোচনের দিকে, তা কী ভাবছেন এখন?

উঁ, তোচন একটু চমকায়।

আপনি নিশ্চয় উদ্বিগ্ন আছেন কোনো ব্যাপারে।

তোচন তাকায় তার দিকে, না তো।

কিন্তু আপনার চোখ মুখ বলছে সে-কথা।

হবেও বা।

আপনার মতো বিজ্ঞানী কি চুপচাপ বসে থাকতে পারেন? কিন্তু

এরপর অনেকক্ষণ কোনো কথা হয় না।

সকলেই চুপচাপ, থামথা বসে নেই তবু;

তোচন ভাবছে, যে ডেকেছে তারই দায় কথা বলার। আমি কেন সেধে সেধে জিজ্ঞেস করবো।

সম্পৎ ভেবে কূল পাচ্ছে না, কী ভাবে প্রস্তাবটা পাড়বে তোচনের কাছে? গুছিয়ে উঠতে পারছে না কথা।

কাজু উস্‌খুস করছে খুব। কথা বলা উচিত হবে কিনা ভাবছে। আর কি-ই বলবে সে? ব্যাপারটা সম্পৎ ও তোচনদার মধ্যে।

একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। কালকে তো ভাঙতে হবে নীরবতা।

তখন ট্রে-তে চা, কাজুবাদাম নিয়ে বেয়ারা ঢোকে ঘরে।

সম্পৎ ট্রে থেকে চা-র কাপ নামিয়ে কাজু ও তোচনের সামনে রাখেন। তারপর নিজের কাপটা তুলে নেন, একটু চা

বেয়ারা একটু নীচু হয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

কাজু দু-একটা বাদাম তুলে নেয়।

তোচন চায়ে চুমুক দেয় আলতো ভাবে।

আপনি তো সেই নির্মাণ-প্রকল্প নিয়ে মেতে আছেন?

অবাক হবার পালার শেষ নেই কাজু তোচনের। তারা দুজনেই একই রকম ভাবছে মনে মনে, এত খবর রাখেন সম্পৎলাল আমাদের সম্বন্ধে? তবু মুখ ফুটে কিছু বলে না।

আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই, সম্পৎলাল প্রস্তাবটা পাড়ছেন এবার, গভর্মেণ্টকে তো লিখে দেখলেন, তারা প্রাপ্তি সংবাদটুকু পর্যন্ত দেয় না, উপরন্তু আপনি দেখছি অনেক খবর রাখেন আমাদের ব্যাপারে, অনেক চর লাগিয়েছেন বুঝি?

সম্পৎলাল তাতে এতটুকু আহত হন না, বরং হাসতে থাকেন, চুনো পুঁটি হয়ে আপনাদের মতো মানা গণ্য লোকের খবর রাখতে পারছি, এতেই আমি ধন্য।

কিন্তু কেন? সোজা প্রশ্ন করে তোচন।

আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই, আপনার গবেষণার কাজ যাতে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে চলে, তাই।

এত কৃপা আমার উপর! তোচন কথার মধ্যে হুল ফোটায়।

সম্পৎ তা গায়ে মাখেন না যেন, তিনি বলতে থাকেন, আমাদের কয়েকটা ইণ্ডাস্ট্রি আছে, আমরা মিলে মিশে একটা ফাণ্ড করেছি—সায়েন্স প্রোমশন ও বিজ্ঞান গবেষণার উন্নতির জন্য।

বাহু, বেশ।

সেই তহবিল থেকে আমরা বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সম্মানিত করে থাকি।

তা এ ব্যাপারে আমার কর্তব্য কি ?

কর্তব্য তো আপনার নয়, কর্তব্য আমাদের। আপনার গবেষণা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাই আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

আর্থিক ?

সম্পৎলাল খানিকটা লজ্জিতভাবে বলেন, হাঁ, মানে...

এটা খয়রাতি, না, শোধযোগ্য ? অর্থাৎ এটা এমনি দান, নাকি ঋণ ?

মানে ধরুন

ও সব ধরুন টরুন নয়, ঝেড়ে কাশুন।

তোচন বড্ড রূঢ়ভাবে কথা বলছে যেন, কাজুর তাই মনে হচ্ছে। এতটা রূঢ় না হলেও পারে তোচনদা। ভদ্রলোক এখন অব্দি বিনীত ভাবেই কথা বলছেন, এবং বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে। সে কি ইশারা করবে তোচনকে একটু নম্র হতে।

বললামই তো···

তোচন একটু চুপ থেকে বলে, তা এত সায়েন্টিস্ট থাকতে আমাকে ধরলেন কেন আপনারা ?

আপনার নাম আমাদের এক্সপার্ট কমিটি সুপারিশ করেছেন।

বটে ? তো এক্সপার্ট কারা জানতে পারি কি ?

সম্পৎ একটু ম্লান হাসেন, তাঁদের নাম বলা চলে না, কারণ ব্যাপারটা গোপনীয়। অন্য কেউ যাতে মেম্বারদের ইনফ্লুয়েন্স করতে না পারে তাই আমরা গোপনীয় রাখি তাঁদের নাম।

আচ্ছা, আচ্ছা...

তাছাড়া একজন বাঙালী বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করতে পেরে আমরা গর্ববোধ করছি

রাবিশ্, তোচন ফেটে পড়ে যেন, বিজ্ঞানীর কোন দেশ নেই জাত নেই। আমরা বিজ্ঞান চর্চা করি মানুষের কল্যাণে, সেটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র পরিচয়, বুঝলেন ?

না না, আমি তা বলতে চাইনি, সম্পৎ তাঁর সহজভাব বজায় রাখছেন, আমি জানি বিজ্ঞানী হচ্ছেন বিজ্ঞানী।

জাতের কথা তুললেন কেন তবে ? সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিতে ?

বড্ড চটে যাচ্ছেন আপনি।

তোচন তীক্ষ্ণভাবে তাকায় সম্পতের দিকে, আমাদের পরিকল্পনার কথা জানলেন কি করে আপনারা ?

কে জানে না আপনার কাজের কথা। এমনকি আপনার 'মায়ামৃগুর' যে শেষ পর্যন্ত···ও সব কথা থাক্, সে সম্পতের কথার মধ্যে বলে ওঠে, আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দিন—আপনি জানলেন কী করে আমাদের পরিকল্পনার কথা ?

জানার কি শেষ আছে ? এক্সপার্ট কমিটি আপনার নাম সুপারিশ করলেন। আমি ফাণ্ডের চেয়ারম্যান। তাই আমার উপর দায়িত্ব পড়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার।

আমি যা জিজ্ঞেস করেছি, তার উত্তর পেলে খুশি হবো, তোচনের চোখ মুখ রাগে লাল হয়ে ওঠে।

বলুন, সম্পৎ এবার খাড়া হলেন যেন।

আমাদের পরিকল্পনার কথা জানলেন কি করে ?

কোন্ পরিকল্পনার কথা জানতে চাইছেন, বলুন ?

তোচন একটু থতমত খায়। সম্পতের পাল্টা প্রশ্নে সে টের পায়, একজন ধুরন্ধরের মুখোমুখী হয়েছে সে। এমন প্রশ্ন করে প্রতিদ্বন্দ্বী তার মুখ থেকেই উত্তর টেনে বের করে নিতে চাচ্ছে।

তোচন সাবধান হতে চেষ্টা করে, যার জন্য আপনি সাহায্য করতে চাইছেন ?

আমরা আপনার সামগ্রিক প্রচেষ্টা, গবেষণার জন্য সাহায্য করতে চাই।

বাব্বা, মা-র চেয়ে মাসির দরদ বেশি তা আমি জানতাম, কিন্তু খোদার উপর খোদকারি যে···

সম্পৎ হেসে ফেলে, যাক্, কথায় ও বুদ্ধির অনেক খেলা এতক্ষণ হলো। এবার আসল কথা হোক্।

তাইতো আমি জানতে চাইছি।

আচ্ছা, তা আপনি তোপ ২৫ সম্বন্ধে বলছেন তো ?

তোপ ২৫ শুনে তোচনের চেয়ে কাজু বেশি চমকে ওঠে।

সম্পৎ হাসলেন, মাননীয় কাজু অবাক হচ্ছেন কেন ? তোপ মানে তোচন পরিকল্পনা আর ব্যঞ্জনবর্ণের ২৫ তম বর্ণ হচ্ছে ম, তোপ ২৫ ডিকোড্ করলে দাঁড়ায় তোচন পরিকল্পনা মেঘের কোলে ঘরবাড়ি, কি তাইতো ? তাতে কি ? আমি জানতে চাইছি আপনি জানলেন কি ভাবে ? আমি তো কাউকে জানাই নি···

আপনি নিজে না জানালে কী হবে, জানার যে জেনে যায়, কস্তুরী মৃগ কি জানে যে সে গন্ধ ছড়াচ্ছে অথচ···

আহ্ স্তাবকতা আমার পছন্দ হয় না, তোচনের বিরক্তি আর চাপা থাকে না। সে একটু থামে, তারপর বলে,

আমাদের কাজের খোঁজ খবর রাখার জন্য এত চর নাই লাগালেন মিস্টার সম্পৎলাল।

সম্পৎ হাসতে থাকেন, এত সহজে কি আমাদের বুঝতে পারবেন মিস্টার তোচন ?

আপনাদের বুঝে আমাদের কোনো দরকার নেই, তোচন এবার কাজুর দিকে তাকায়, আমাদের এবার ওঠা উচিত, কি বল্ ?

সঙ্গে সঙ্গে কাজু উঠে দাঁড়ায়।

আমাদের পেছনে লেগে আর সময় নষ্ট করবেন না প্লিজ, আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দিন, তোচন উঠে পড়ে, নমস্কার।

কাজু-ও নমস্কার করে।

আপনি মিছি মিছি রাগ করছেন, সম্পতের বিনয়ের মাত্রা এতটুকু কমে নি, আমরা আপনার ভালো করতে চাই।

যথেষ্ট ভালো করেছেন, এখন নিজের চরকায় তেল দিলে খুশি হবো। সম্পতের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, আমাদের কপাল, ভালো করতে গেলে লেখকে মন্দ বোঝে।

তার কি কারণ নেই মিস্টার সম্পৎ ?

কি জানি, তিনি করুণ ভাবে তাকান তোচনের দিকে, আমাদের অফার নিঃশর্ত, একটু ভেবে দেখবেন দয়া করে।

আপনার অফার প্রত্যাখ্যান করছি, এ-বিষয়ে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না কখনো, অনুরোধ করছি একান্ত ভাবে।

বলেই হনহনিয়ে বেরিয়ে আসে তোচন, কাজুও।

সম্পৎ তবু বলতে থাকেন, আমাদের অফার থাকছেই কিন্তু, গ্রহণ করা না করা আপনার খুশি।

আরো অনেক কিছু বলে চললেন সম্পৎলাল, তা শুনতে পায় না তোচন কাজু, ততক্ষণে তারা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

তিন

তোচন প্রায় দৌড়ে নিজের ঘরে এসে ঢোকে।

ঘরের চারদিকে তাকিয়ে হাঁক দেয়, কাজু···তাড়াতাড়ি।

তার ডাক শুনেই কাজু জামা কাপড় না ছেড়ে পড়ি-মরি ছুটে আসে। নিশ্চয় কোনো বিপদ হয়েছে, নইলে তোচনদা এভাবে ডাকবে কেন ?

এসে—দেখে চারদিকে জিনিষপত্র ছড়ানো ছিটনো, ড্রয়ারগুলো হাট করে খোলা বিছানার তোষক—বালিশ সব ওলটানো, চাদর খাট ছেড়ে মেঝেয় লুটোচ্ছে, লেখার টেবিলে কাগজ পত্র তছনছ ইত্যাদি।

কাজু ভ্যাবলার মতো তাকায় তোচনের দিকে।

তোচন কাজুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে, ভড়কে গেলি যে ?

এর মানে কি ?

মানে তারা এসেছিলো। আমি অবশ্য আগেই আন্দাজ করেছিলাম,—এরকম কিছু একটা ঘটবে।

তুমি জানতে ? অবাক হয় কাজু।

বটেই তো ? এসে দেখলাম সত্যিই হয়েছে।

কাজু তাকিয়ে থাকে তোচনের দিকে।

ফাইলটা নেই।

নেই ? আঁতকে ওঠে কাজু, রঘুদা রঘুদা।

রঘুদা বোধ হয় বাড়ি নেই। তুই ভাবতে পারিস না, তাই না ?

কি করে ভাববো ?

প্রোজেক্টর কপি তো কয়েকটা করেছিলি ?

হ্যাঁ।

তাহলে আর ভয় কিসের ? নিক্ না যত পারে।

কিন্তু, কাজু একটু অস্থির হয়ে ওঠে, দেখে আসি, সেগুলো ঠিক আছে কিনা, বলে সে চলে আসে নিজের ঘরে।

খুঁজতে থাকে সম্ভব অসম্ভব জায়গায়। নাহ্ কোথাও নেই। আরো খোঁজে, খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়।

তাই তো কোথায় যেন রেখেছি, রঘুদা রঘুদা।

আবার এসে ঢোকে তোচনের ঘরে এবং মাথা নীচু করে দাঁড়ায়।

পেলি না বুঝি ?

নাহ, কিন্তু রেখেছিলাম ঠিক, মনে আছে।

তোকে নিয়ে আর পারা গেল না, এত ভুলো মন, তোচন হাসে এবার তাহলে তোর বিয়ে দিতে হবে তাতে যদি...

কাজু লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়, সত্যি এত ভুলো মন আমার ··

বিছানার তলায় টলায় নেই তো ?

সব জায়গায় খুঁজেছি, ব'লেও সে খুঁজতে থাকে।

বাক্স-টাক্সগুলো দেখেছিস্ ?

হ্যাঁ দেখেছি, বলতে বলতে চলে যায় রান্নাঘর পর্যন্ত। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে আবার। তোচনের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে। তাকে বেশ চিন্তিত দেখায়. পেলি না তাহ'লে ?

নাহ্ হতাশায় ভেঙে পড়ে কাজু, আমার দোষেই এত বড় একটা সর্বনাশ হলো অথচ আমি কপি করিয়ে রেখেছিলাম।

তোচন কী যেন ভাবে হঠাৎ-ই বলে ওঠে, নো পরোয়া, হিম্মৎ হারিস না আর ঠিক তক্ষুণি কাজু লাফ দিয়ে উঠলে যেন, মনে পড়েছে মনে পড়েছে ও-বাড়িতে রেখেছি হাঁ ঠিক ঠিক মনে পড়েছে।

দেখ্ ভেবে, ও-বাড়িতে গিয়ে আবার বলবি না তো এ বাড়িতে আছে ?

না-না ঠিক মনে পড়েছে, তুমি বলেছিলে ও-বাড়িতে রাখতে।

আমি বলেছিলাম ?

বোধ হয় তুমিই বলেছিলে।

তা'হলে আমার বুদ্ধি আছে বল্, তোচন কাজুর পিঠ চাপড়ায় সস্নেহে, একটা এক্সট্রা খাটুনি থেকে বাঁচালি আমায় নইলে এখুনি কাগজ কলম নিয়ে বসতে হতো আবার, তবে, সে গলার স্বর নামায়, ও ফাইল নিয়ে বাবুদের কোন লাভ হবে না।

কেন ?

আরে বুদ্ধু এটা বুঝলি না, কাজুকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তোচন বলে, ফাইলের দু-তিনটে পাতা সরিয়ে রেখেছিলাম, এই দেখ্, ব'লে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে সে তিনটে পাতা তুলে দেখায়, এবার বুঝলি।

তাই বলি, তুমি অত কাঁচা কাজ করবে কেন ?

তোচন ততক্ষণে কি যেন ভাবতে থাকে।

কাজু জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে যায়। এ সময় তোচনদাকে ডিসটার্ব করা উচিত নয়, অথচ সে চলেও যায় না। জানে, তোচনদা এরপর কিছু বলবেন তাকে

বি রেডি কাজু, পাততাড়ি গোটাতে হবে এখান থেকে কয়েকদিনের জন্য, কাজু কোন প্রশ্ন করে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একবার আসবে নিশ্চয়, সহজে ছাড়বে না আমাদের।

তাই কি ?

আলবৎ, যা ঘটবে তাই বলছি।

তাহ'লে আমরা ধরার চেষ্টা করি না কেন হাতে নাতে ?

তোচন হেসে ওঠে, পাগল হয়েছিস ? আমরা ধরবো ওদের ? আর ওদের ধরতে গেলে সব কাজকর্ম ছেড়ে রাতদিন পুলিশ গিরি করতে হবে, কি পারবি দিতে চৌকি রাতদিন ?

কাজু হেসে ফেলে।

দেন্ ব্রাদার, যাবার অ্যারেঞ্জমেণ্ট করো, রঘুদা থাকবে এখানে, তবে আমাদের খাবার যেন পৌঁছে দিয়ে আসে, একটু থামে তোচন, এট্লিস্ট সাতদিনের, এখন তুমি তোমার করণীয় করো, আমি আমার।

তোচন টেবিলে গিয়ে বসে।

আর কাজু চলে আসে পাশের ঘরে। সে-ও কাগজ কলম টেনে লিস্ট করতে থাকে কী কী নেবে সঙ্গে। তবে ও-বাড়িতে দরকারী সব জিনিষই আছে, তবু অধিকন্তু ন দোষায়। তাছাড়া ক-দিন থাকতে হবে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না এখন।

তোচনদের প্ল্যান কী, তোপ ২৫-এর কাজ হবে, নাকি তোপ ২২-এর, নাকি অন্য কোনো মতলব আছে—কাজ তার কিচ্ছু জানে না। এখুনি সে কথা তোচনদাকে জিজ্ঞেস করা যায় না।

সবচেয়ে বড় কথা, ফাইল চুরি হবে—তা সে ভাবতেই পারে না। কেন চুরি করবে, কী লাভ হবে চোরের ইত্যাদি প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। আরো আশ্চর্যের যে তোচনদা জানে একটা ঘটনা ঘটবে, অথচ বলে নি কাউকে নিশ্চয় গূঢ় রহস্য আছে, তোচনদা তার সন্ধান ঠিকমত পায় নি, তাই বলে নি, ভেবেছে রহস্যের কিনারা হলে বলবে, নাকি ভুলেই গেছে ? ভুলে যাওয়াটা অবশ্য স্বাভাবিক।

কিন্তু ফাইলটা সরাবে কে ? সম্পৎলালের লোকজন ? তাই কি তোচনদা ওর উপর কেমন খাপ্পা হয়েছিল ?

ডোর বেল্ বেজে ওঠে।

কে ? কে ?

আমি, রঘু।

ছিটকিনি সোজা আছে, নিজের দিকে টানো।

টক করে শব্দ হয়, তারপর ছিটকিনি লাগানোর। রঘু ঢুকে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

রঘুদা, একটু শুনে যেও।

লিস্ট-টার উপর আর একবার চোখ বোলায় কাজু। কী বাদ পড়তে পারে মনে মনে আবার আওড়ে লিস্ট দেখতে থাকে।

রঘুদা এসে দাঁড়ায়, কি জন্য তলব হলো ?

কাজু রঘুকে একবার দেখে, বলি বাড়িতে কিছু হয়েছে জান কি ?

কি ? কি হয়েছে ? রঘু ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কাজু আবার দেখে রঘু কে।

আরে চোখ ফেড়ে ফেড়ে দেখছো কী বটে, বলছো না কেন কী হয়েছে ? তোচনদার শরীর খারাপ নাকি ?

তোচনদার শরীর ভালোই আছে।

তবে?

ফাইল চুরি গেছে।

ফাইল? চুরি? কখন?

তুমি কতক্ষণ বাড়ি ছিলে না রঘুদা, রঘু একটু ইতস্তত করলে কাজু হেসে ওঠে, নিশ্চয় আমরা বেরিয়ে যাবার পরই বেরিয়েছিলে?

নাতো, এই কিছুক্ষণ আগে মাত্র বাজার গিয়েছিলাম।

সকালেও তো গিয়েছিলে বাজার?

তা গিয়েছিলাম, কিন্তু···।

আমরা বেরুনো মাত্র তুমিও হাওয়া হলে, ব্যাস্ সেই ফাঁকে।

এখন কি হবে? রঘু ভ্যাবাচ্যাকা খায়, কোনদিনও এমন হয় নি, কতদিন দরজা খোলা রেখেই গেছি দোকানে, হায়রে, কে জানতো যে···

এখন হায় হায় করে কী লাভ! যা যাবার তা গেছে, ওদিকে তোচনদা···

রঘু ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তোচনদা নিশ্চয় রেগে কাঁই হয়েছে আমার উপর, তুমি-ই বলো, যদি জানতাম তবে কি যেতাম কখনো।

কিন্তু তোচনদা জানতো।

তাহ'লে বলে নি কেন?

সেটাই তো কথা, কাজু বিজ্ঞোচিত ভাব করে, বোধ হয় গভীর রহস্য আছে··

রঘু বিমূঢ়ের মতো তাকায় কাজুর দিকে।

রহস্যটা ভেদ করবে তোচনদা, তারপর বলতে বলতেই হেসে ওঠে কাজু।

রঘু ধড়ে প্রাণ পায় যেন, তাহ'লে চুরি যায় নি ফাইল।

নাহ্, তা গেছে, তবে···

তা তুমি হেসে উঠলে যে?

তোমার ভ্যাবলামি দেখে, কাজু একটু থামে, তবে হুকুম হয়েছে বাড়ি ছাড়ার।

মানে?

আমরা এখুনি চলে যাবো ও-বাড়ি, তুমি থাকবে এখানে। এখন কিছু খাবার প্যাক করে দাও আমাদের, আর, কাজু লিস্ট দেখে, রাত্রে গিয়ে আরো খাবার দিয়ে এসো অন্তত সাতদিনের, বুঝতে পারলে কিছু?

খুব বুঝেছি।

কি বুঝলে?

এই যে তোমরা ও-বাড়ি যাচ্ছো, তার মানে তোচনদার কাজ আছে, আমি এখানে থাকবো, কেউ এলে বলবো তোমরা দিল্লী গেছো কাজে··

দ্যাটস্ লাইক এ গুড বয়, কাজু অন্তরঙ্গ সুরে বলে, একটা কাজ কিন্তু বেমালুম ভুলে গেলে ব্রাদার।

কি ভুললাম আবার?

আমাদের খাদ্য সাপ্লাই-এর ব্যাপারটা

খাদ্যটাদ্য বয়ে নিয়ে যেতে হবে, এই তো·

নিশ্চয়।

একসঙ্গে দিন সাতেকের, রঘু হাসে, ঠিকঠাক যাবে। আমি প্যাকেট করে দেবো, বুঝলে? কোন্ দিন কোন্ প্যাকেট নেবে প্যাকেটের উপর লেখা থাকবে··· ··

বটে?

নইলে তোমরা যা, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবে, আর না খেয়ে থাকবে।

কাজু রঘুকে জড়িয়ে ধরে, এই না হলে রঘুদা···

আহ্, ছাড়ো ছাড়ো, লাগছে।

কাজু রঘুকে ছেড়ে দেয়। রঘু কাজুর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই না কেন?

ও কি রাজি হবে? কাজু তোচনের ঘরের দিকে ইশারা করে।

প্রথমে রাজি হবে না নিশ্চয়, তা তুমি বলে দেখো না একবার!

আমি? পাগল হয়েছো? একবার যখন বলেছে, তুমি এখানে থাকবে তখন কি...

রঘুকে একটু চিন্তিত দেখায়, একা থাকা, বুঝলে না? আর এই অবস্থায়?

বুঝেছি, কিন্তু আমি বললে যদি বেঁকে বসে? কাজু কাতর স্বরে বলে, বরং তুমি বললে হয়ত শুনবে, তুমিই চেষ্টা করো প্লিজ, তুমি থাকলে দারুণ হবে।

যা গোঁয়ার, আচ্ছা দেখি ম্যানেজ করতে পারি কিনা, রঘু হাসে, কিছু কৌশল করতে হবে হয়ত, দেখি কোনো প্যাঁচ করতে পারি কিনা?

কাজু জানে, রঘুদা বললেই প্রথমে একটু গাইগুঁই করবে তোচনদা, তারপর দিব্বি রাজি হয়ে যাবে। কাজু দেখেছে, তোচনদা রঘুদার কথা ফেলতে পারে না, আর ভালোও বাসে খুব। রঘুদাও তাই, তোচনদার মুখ থেকে বেরুলেই হয় কিছু, সেটা করার জন্য প্রাণও দিতে পারে সে।

তোচনদার কাছে কাজু শুনেছে রঘুদার গল্প ঃ

খুব ছোট্ট বয়সে রঘুদা এসেছিল তোচনদাদের বাড়ি। তোচনদার বাবাই তাকে নিয়ে এসেছিলেন। রঘু-কে দেখার কেউ ছিল না সেই ছোট্ট বেলায় মা-কে হারায়, বাবাও বেশিদিন বাঁচে নি তার। রঘুদার বাবা একবার ভীষণ বিপদ থেকে তোচনদার বাবাকে বাঁচায়। তখন থেকেই তোচনদার বাবা রঘুদার বাবাকে খুব মান্য করে চলতেন। রঘুদার বাবা অসুখে পড়লে রঘুকে দেখার কেউ ছিল না। তখনই তিনি রঘুকে নিয়ে আসেন বাড়িতে। আর ঐ অসুখে রঘুদার বাবা মারা যান। রঘুদা থেকে যায় এখানে সেই থেকে।

রঘুদা ও তোচনদা একসঙ্গে মানুষ হতে থাকে। রঘুদা তোচনদার মার খুব ন্যাওটা ছিল। উনি রঘুদাকে খুব ভালোবাসতেন, প্রায় ছায়ার মতো রঘুদা থাকতো মায়ের সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুর পর রঘুদা আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে। যে ছিল হাসিখুশি চটপটে খুব, সে ক্রমে চুপ মেরে যেতে থাকে। লেখা পড়ায় তেমন মন দেয় না। চুপচাপ বসে থাকে আর ভাবে। তোচনদার বাবা ঘাবড়ে গিয়ে ডাক্তার দেখান। তাতেও বিশেষ লাভ হয় না। রঘুদা পিছিয়ে পড়তে থাকে লেখা পড়ায়। অথচ আস্তে আস্তে ঘরের কাজ কর্মে বেশ দড় হতে থাকে। বিশেষ করে যে-সব কাজ মা করতেন, সেই কাজ সব রঘুদা করতে আরম্ভ করে, আর এক সময় সংসারের গৃহিনীর কাজগুলো সে নিজের কাঁধে তুলে নেয়।

তোচনদার বাবা লেখাপড়া করলে কী কী হয়—খুব বোঝালেন তাকে, কিন্তু রঘুদার মোটেই মন নেই তাতে, বিশেষ করে পাশের পড়া। তোচনদা একটার পর একটা ক্লাশ পেরিয়ে যেতে থাকে, রঘুদা সে চেষ্টা করল না মোটে, তবে তোচনদার তালে তালে সে-ও পড়াশুনো করে যেতো আড়ালে আবডালে। রঘুদা ভালো ছবি আঁকতে পারতো। তোচনদার বিজ্ঞান খাতার প্রায় সব ছবি সে এঁকে দিতো। তোচনদার উপর ভীষণ টান ছিল। তোচনদাও তাকে ভালোবাসতো, মান্য করতো।

তোচনদার চেয়ে সে বয়সে বড়ই ছিল কয়েক বছরের। তাই তোচনদা রঘুকে রঘুদা বলেই ডাকতো, রঘু-ও তোচনদা বলে ডাকতো ঐ ছোট্ট থেকেই। এতে দুজনে ভারি মজা পেতো। খেলা চলতো দুজনের। আজও তারা আগের মতোই আছে, যদিও তাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা হয়ে গেছে বেশ।

তবে রঘুদা কেবল রান্নাই করে না। তোচনদার গবেষণার কাজে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে, কখনো কখনো লেখা কপিও করে দেয়। আর আজকাল রান্নায় বেশি সময় পায় না, কারণ এখন খাওয়াটা গৌণ তাদের কাছে। কাজে ডুবে গেলে খেয়ালই থাকে না খিদে পেয়েছে কিনা, খেয়েছে কিনা তাও ভুলে যায় মধ্যে মধ্যে। সমস্ত দিন কাজ আর কাজ, সন্ধ্যেয় কিছু ফুরসৎ পায় এরা।

অবশ্য খাটনি বেশি পড়ে তোচন ও রঘুর, তোচনের বেশির ভাগ মানসিক, রঘুর দৈহিক। তোচনের গবেষণা মূলক কাজ ও লেখা ছাড়াও আজকাল দৈনিক সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকায় কিছু লেখা লিখতে হয়। এর উপর মধ্যে মধ্যে উপদেশনের কাজ, ফলে পয়সার কিছু মুখ দেখতে পাচ্ছে তোচন। তুলনামূলক ভাবে কাজুর খাটনি কম, যদিও সে গবেষণার সহায়কও বটে তোচনের।

দিনের বেলায় খাটাখাটনির জন্য খাওয়া কিছু সংক্ষিপ্ত হয়—

সকালে চা বিস্কুট

দুপুরে ডিম সেদ্ধ টোস্ট কিংবা মাছ ও তরকারি সিদ্ধ একসঙ্গে একটা মিশ্টি হয়ত বা

বিকেলে চা বিস্কুট।

তবে ফ্ল্যাস্কে চা ভরা থাকে, এবং টিনে বিস্কুট। যার যখন দরকার, চা খায় হয়ত বিস্কুটও

রাত্রে ভাত মাছের ঝোল, কোনো কোনো দিন মাংস।

সপ্তাহে একদিন খিচুড়ি ও মাছ ভাজা তাদের উপাদেয় খাদ্যের মধ্যে পড়ে। অবশ্য শুকনো খাবার-ই তিনজনের পছন্দ বেশি। তাতে শরীর 'ফিট' থাকে, অনেক কাজ করা যায়, আলসেমি লাগে না।

অবশ্য রঘু কলা আনবেই—যে-কোনো ধরনের কলা, আর ঋতুর ফল, যে ঋতুতে যা ফলে। রঘু বলে, প্রকৃতি দিচ্ছে মানুষের জন্য, অতএব তার শরীরের জন্য সে ফল খাওয়া উচিত।

তবে রাত্রে খাওয়ার শেষে কফি খুব প্রিয় তিনজনের কাছেই।

খাওয়ার ব্যাপারে তিনজনের মিল দেখে কাজু ভীষণ অবাক হয়ে যায়। এক সঙ্গে থাকে বলে কি এই মিল সম্ভব হয়েছে। তখন টের পায়, কাজ-ই তাদের প্রায় সব ব্যাপারে মিল ঘটিয়ে দিয়েছে। যদি কাজ না থাকতো, তবে নানা বায়নাক্কা এসে হাজির হতো—এটা ওটা সেটা ইত্যাদি, আর তাতে শরীরেও যুত থাকতো না।

তোচন বলে, একটাই জীবন যখন পাওয়া গেছে, তখন

কিছু কাজ করে যাওয়া যাক্. যতদিন বাঁচি কাজ করে যাই। দেখবি, কাজের মধ্যে থাকলে আনন্দে থাকা যায়, কোনো নীচতা হীনতা সংকীর্ণতা জন্মাবার সুযোগ পায় না, কী বলো রঘুদা ?

রঘু সমর্থন করে জুড়ে দেয়. কাজের মধ্যে আছো বলে চারদিকের পাঁকের মধ্যে থেকেও পদ্ম ফোটাতে পারছো। ব্রেভো রঘুদা ! তবে আমড়াগাছি করার কি দরকার, বলে তোচন রঘুকে জড়িয়ে ধরে, রঘুদা তুমি যে কী···

কাজু দেখেছে, তোচনদা কাউকে ছোট ভাবে না। যে যার ক্ষেত্রে রাজা, যে জুতো সেলাই করে, যে তাঁত চালায়, যে যে-কাজেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, কেউ-ই ছোটো নয় কারুর চেয়ে, অন্তত দু-পাতা পড়া কারুর চেয়ে।

এর প্রভাব কাজুর উপরও পড়ে। তোচনদা যেন অনেক বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছে অগোচরে তার।—প্রথম যখন সে তোচনদার কাছে আসে, তখন সে রঘুদাকে চাকর বাকর বলেই মনে করতো। অথচ আশ্চর্য, তোচনদা তাকে যথেষ্ট মান্য করে, তার কথা শোনে। এজন্য অবাক হতো খুব, ক্ষুব্ধও।

মনে মনে বলতো, ঠেলা বুঝবে একদিন, চাকরকে লাই দিলে মাথায় চড়ে বসবে

কিন্তু তোচনদার সঙ্গে থাকতে থাকতে একদিন সে নিজেই আবিষ্কার করে, রঘুদা তার বন্ধু হয়ে উঠেছে, ওদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। সে দেখে, রঘুদা দারুন, মাঝে মাঝে দারুন দারুন সমস্যার জট খুলে দেয় সামান্য কথায়। রঘুদাকে ছাড়া সে ভাবতেই পারে না এখন. কারণ সে না থাকলে মিনিট খানেকেই তাদের সংসার অচল হয়ে যাবে।

কাজু লিস্টটা দেখে নিয়ে লেখে—ডাইরি, তার পাশে ছোট বন্ধনীর মধ্যে লেখে -রুলটানা বাঁধানো একসার-সাইজ খাতা একটা আট নম্বরের। তার মানে এবার সে পুরো ব্যাপারটা লিখবে, যতটা পারে বিশদভাবে। 'মায়া মৃগুর'-এর সময়ও কাজু ডাইরি লিখতো, কিন্তু খুব সংক্ষেপে। এখন পড়লে হয়ত সবটা সে ধরতেই পারবে না। তোচনদার মেজাজের চড়া-নামার কথা সংক্ষেপে লেখা চলে, পরে তা পড়লে অনেক বোঝাও যাবে ঐ সংক্ষিপ্তির মধ্যেও। কিন্তু 'মায়া মৃগুর' ছিল জটিল ব্যাপার, তাও সংক্ষেপে লেখা উচিত হয়নি মোটে। ভাগ্যিস ঐ পরিকল্পনা থেমে যায় মাঝ পথে। এবার সে আর ঐ ভুল করবে না, যত খাটনি পড়ুক লিখবেই লিখবে, শোবার আগেও অন্তত লিখে রাখবে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হলেও পরোয়া করবে না।

রুলটানা খাতার কথা লিখে আর কী কী জুড়বে লিস্টে তা দেখতে গিয়ে নীচু হতে তখন ঘরে ঢোকে তোচন ও রঘু। দু-জনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয়, তবে বুঝতে পারে রঘুদা তাকে মানিয়ে ফেলেছে, অর্থাৎ রঘুদাও যাচ্ছে ও বাড়ি—তাদের সঙ্গে।

সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তোচন বলে উঠে, ও-বাড়ির যাবার প্রোগ্রামটা আপাতত স্থগিত থাকছে।

হঠাৎ ?

বুঝে নাও, কেন, তোচনের মুখে দুষ্টু হাসি যেন

কাজু বোঝে, তোচনদা তাকে দিয়েই উত্তরটা বের করাতে চায়। এরকম সময়ে তাই তোচনদা 'তুই' থেকে 'তুমি'তে উঠে আসে। তবে এটা নিয়মের মধ্যে পড়ে না, তুই তুমি—বলা সব 'মুড্'-এর উপর নির্ভর করে।

মনে হচ্ছে, কাজু একটু দম নেয়, হামাদি-রা আর একবার চেষ্টা করবে, আর তুমি তাদের মোকাবিলা করতে চাও

দ্যাটস্ লাইক এ গুড্ বয়।

তোচনের কথার সঙ্গে সঙ্গে রঘুও লাফিয়ে ওঠে যেন, ধরতে পারলে তুমি ?

পারবো না, তাই ভেবেছিলে বুঝি -

না-না, মানে···, রঘুদা আমতা আমতা করে।

রঘুদা তুমি-ও তো বুঝেছিলে ? তোচন সস্নেহে তাকায় রঘুর দিকে।

প্রথমে অবশ্য ধরতে পারিনি, তবে তারপরই, রঘু লাজুক ভঙ্গিতে বলতে বলতে থেমে পড়ে।

তোচন তখন চুপ করে গেছে। রঘু কাজুর ইঙ্গিত ধরতে পারে না। রঘু চোখের মণি ঘুরিয়ে ইশারায় জানতে চায় কি বলছো।

কাজু চোখের কোন দিয়ে তোচন-কে দেখায়, জানতে চায় তার মুডের কথা। রঘু মাথা নাড়িয়ে বলে, সে কিছু জানে না। কাজু তখন চোখ পাকায়, তাতে বলতে চায়, এতক্ষণ তাহলে ওঘরে গিয়ে ঘাস কাটছিলে ?

রঘু অপ্রতিভ-র মতো হাসে —নিঃশব্দে।

কাজু রঘুর ইশারার খেলা চলার মধ্যে তোচন বলে, প্ল্যানটা একটু নড়চড় করতে হবে—ভায়া।

কাজু তাকায় তার দিকে।

সম্পৎলাল ওটা হাতালেও কিছু জানতে পারবে না, কারণ

কথার মধ্যে কাজু বলে ওঠে, ভ্রূণ অবস্থায় ছিল, জাস্ট খসড়াও নয় ঠিক

কারেক্ট, তুই জানলি কি করে ?

আমি আর রঘুদা জানবো না, তো জানবে পাড়ার লোক ?

তাই তো তাই তো, ভুলে যাই তোরা না থাকলে আমি খোঁড়া এবং কানা।

অতো বিনয় ভালো নয়, রঘুর স্বর অনুকরণ করে তোচন। আবার গম্ভীর হয়, আমাদের সজাগ থাকতে হবে খুব। তারপর আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে, আমাদের বোকা ঠাওরালে নিজেরাই বোকা বনবে···

তারপর কথা না বাড়িয়ে চলে যায় ঘর ছেড়ে।

ব্যাপার কি ? মাথায় কি অন্য প্ল্যান এসেছে, কাজু রঘুর কাছে এসে ফিসফিসায়, একটু নজর রেখো, আমিও ঐ ব্যাটাদের সায়েস্তা করার ফিকির খুঁজি।

কাজু একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা রঘুদা, তোমার কি মনে হয় সম্পৎলালের লোক চুরি করেছে ফাইলটা ?

রঘু ভাবে মাথা নীচু করে, হতে পারে, কিন্তু সে কী এত বোকার মতো কাজ করবে ?

আমারও মনে হচ্ছে তাই, তবে কি কোনো···

থার্ড পার্টির কাজ, তাই না ?

দুজনেই হেসে ওঠে খুব তখন।

চার

তোচন যথারীতি ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বুঁজে কিছু ভাবছে।

খুব আস্তে অনুচ্চে ক্যাসেট চলছে রবীন্দ্র সংগীতের— আকাশ ভরা সূর্যতারা বিশ্ব ভরা প্রাণ, দেবব্রত বিশ্বাসের—

কাজু পা টিপে পর্দার পাশে এসে দাঁড়ায়, একবার ফিরে যায়। এইভাবে কয়েকবার করে নিজের অজান্তে সে ঘরে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই খেয়াল হয়— তোচনদা আরাম করছে, এসময় তাকে 'ডিস্টার্ব' করা উচিত নয়। সে তেমনই পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসছিলো, এ সময় তোচন ডাকে।

কাজু ভাই, যাচ্ছিস কেন ? তোচন এবার চোখ খোলে, পালিয়ে যাচ্ছিলি যে বড় !

তুমি ঘুমোচ্ছিলে, তাই

কে বললে আমি ঘুমোচ্ছিলাম, এই দেখ্, বলে সে চোখ বড় বড় করে তাকায়। খুব হয়েছে, কাজু হেসে ফেলে, আমার চোখ-কে ফাঁকি দিতে পারবে না

তোচন হা-হা করে হেসে ওঠে, যা বলেছিস, তোর কেন রঘুদার চোখকেও ফাঁকি দিতে পারবো না।

কাজু বেশ তীক্ষ্ণভাবে তাকায় তোচনের দিকে।

চোখ বিঁধিয়ে দেখছিস কি ? আমি বাঘ, না ভাল্লুক ? গিলে খাবি নাকি আমাকে ?

কাজু উত্তর দেয় না, কেবল টেপ্‌টা বন্ধ করে।

আরে রে, রে, গানও শুনতে দিবি না ?

গান শুনছিলে না ছাই, আমি সব বুঝি।

কি বুঝিস্, বল্ তবে।

তুমি কেবল ভেবে চলেছো, এতো ভাবার কী আছে, কাজ ঠিক হবে···

না রে, তোচনের মুখ কেমন ম্লান হয়ে ওঠে, আমার কি একটাই ভাবনা ?

বটে ? তবে বলো, কি ভাবছো ?

অনেক অনেক, সহজ হতে চায় তোচন

যথা ?

যথা তোকে খাটাচ্ছি এতো, অথচ ঠিক মতো প্রেস করতে পারছি না, শুধু বেগারই খেটে যাচ্ছিস।

আচ্ছা তো, এই, কাজু চোখ পাকায় প্রপ্রয়ের।

নয় তো কি ? আজকাল মিছিমিছি কেউ বেগার খাটে ? তুই খেটেই চলেছিস, খেটেই চলেছিস

এই তোমার ভাবনার বিষয় ?

কিছুটা, বিবেক দংশাচ্ছে, তোচন থামে, সত্যি তো তোর জন্য কিছুই করিনি, হাত খরচের বাইরে ··

কাজু ম্লান ভাবে বলে, তোমার কাছে কি সেজন্য এসেছিলাম ? টাকা কামানোর অজস্র রাস্তা আছে, ইচ্ছে করলে কি কামাতে পারতাম না ?

তোচন করুণ ভাবে তাকায় কাজুর দিকে।

কাজু বলা থামায় না। বলেই চলে, টাকা পয়সার নিশ্চয় দরকার আছে, কিন্তু সেটাই জীবনের সব নয়, তোমার সঙ্গে আছি, কত জ্ঞানী গুণীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, কত কনফারেন্স সভায় যাচ্ছি—এগুলো কি কম ? কত লোক চিনছে, তা ছাড়া হাতে কলমেও কাজ করছি, কটা ছেলে এমন সুযোগ পায় ?

তার মানে তুই বেগার খেটে যাবি ?

বেশ করবো, একটু ঝাঁঝিয়ে ওঠে কাজু।

আহা, চটিস্ কেন ? তোচন তাকে শান্ত করে, এখন তো কিছু পয়সায় মুখ দেখা যাচ্ছে, তাই ভাবছি···

থাক্ তোমার ভাবনা।

তোচন বলতে চায়, তার আগেই কাজু তাকে থামিয়ে দেয়, টাকা-পয়সার দরকার থাকলে চেয়ে নেবো, হয়েছে

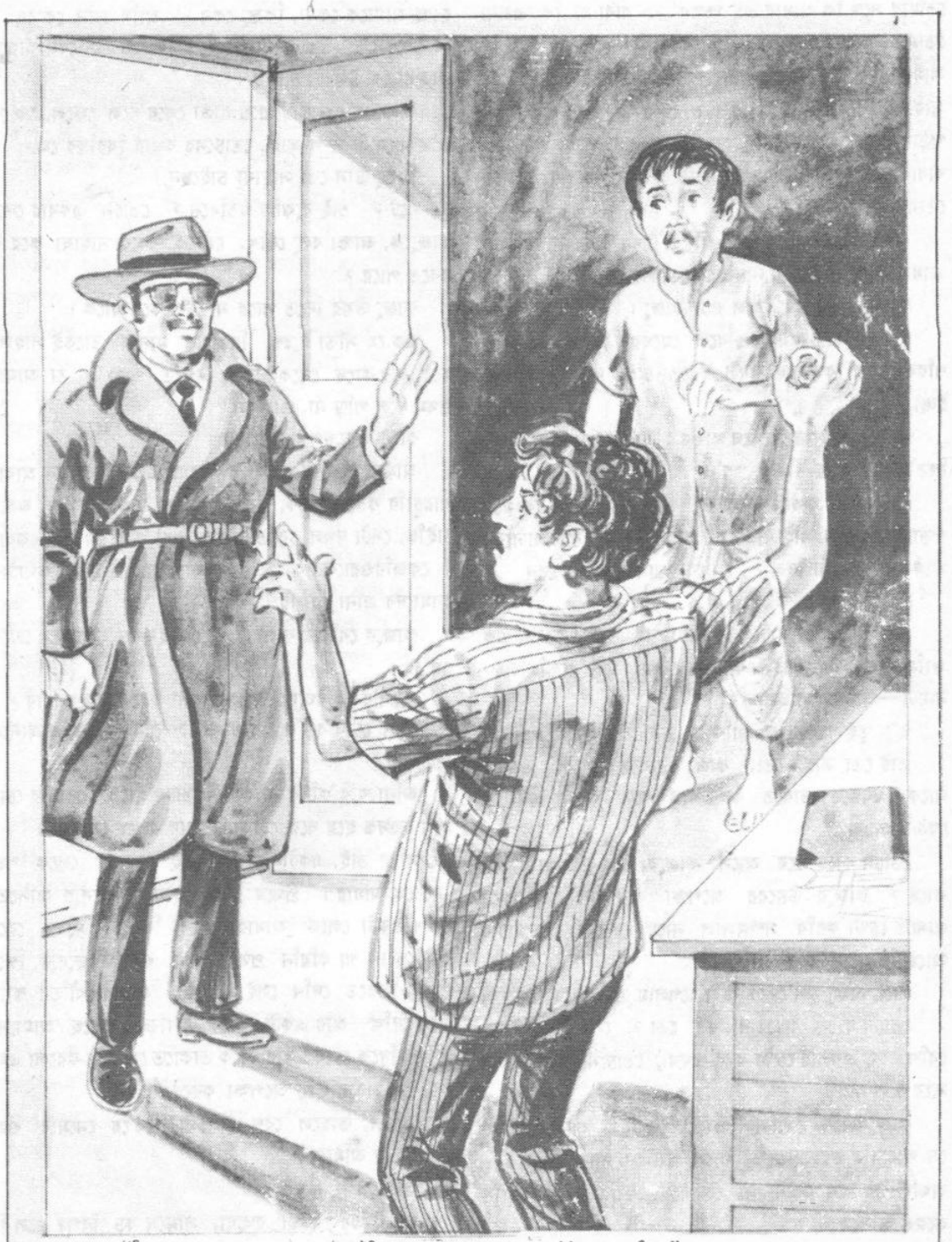

"কি করবো ভাবতে ভাবতেই টেবিল থেকে পেপার ওয়েটটা তুলে নি।"

তো ? সে এবার তীক্ষ্ণভাবে তাকায় তোচনের দিকে, তোমার সঙ্গে কি আমার এই সম্পর্ক ? বাবা মা কি এজন্য তোমার কাছে আমাকে দিয়েছিলেন ? তাছাড়া, এখুনি আমার টাকার দরকার কোথায় ? টাফির বিয়ে হয়ে গেছে, আর বাবা তো এখনো অ্যাক্টিভ, দেখলেই তো বি. এস সি পড়ার সময় কেমন মস্তান হয়ে উঠছিলাম, তাই দেখেই না বাবা-মা দুজনেই তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন; নিশ্চয় তোমার মনে আছে ?

আচ্ছা থাক্ সে কথা, থামিয়ে দেয় তোচন, ভাবছি আমাদের পরিকল্পনার নাম হবে তোকার, অর্থাৎ।

তোচন কাজু রঘু, বলে ওঠে কাজু।

হ্যাঁ তোকার নাম হচ্ছে বলে মেঘের কোলে ঘর বাড়ি পরিকল্পনার কিছু রদ বদল করতে চাই, দু-ধাপে করার ইচ্ছা।

প্রথম ধাপ হচ্ছে মেঘে যাওয়ার অর্থাৎ আরোহণ পর্ব, দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে নির্মাণ পর্ব।

তোচন তার কথা খেয়াল না করে হঠাৎ তার কি মনে পড়ায় বলে ওঠে, বাই দ্য ওয়ে, তোর না কোন্ প্রোমোটারের সঙ্গে জানা শোনা ছিল ? কি যেন নাম তার, কি যেন

প্রোমোটার ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রোমোটার, ঐ যারা হাই রাইজ করছে, এক ফালি জায়গা পেয়েই, কী যেন নাম, তুই বলেছিলি··· নামটা—আমি বলেছিলাম ?

হ্যাঁ, তুই বলেছিলি, নাকি, তোচন থেমে পড়ে।

তাই তো তাই তো, কাজু ভাবতে থাকে, ভাবতে থাকে, ভাবতে ভাবতে ঝট করে বলে ওঠে, এন সি কেজরিওয়াল...

তোচন কাছে সরে আসে কাজুর, একবার যাবি তার কাছে ? কাজুর উত্তরের অপেক্ষা করে না সে, গিয়ে জানতে চেষ্টা করবি সম্পৎলাল নামে কোনো প্রোমোটার আছে কিনা ?

কাজু একটু চুপ থেকে বলে, গেলাম তার কাছে, কিন্তু।

তোচন হাসে, বলবে না, এই তো ? সেটার সম্ভাবনাই বেশি, তবু একবার চেষ্টা করে দেখা, তোচনের দৃষ্টি এবার দূরে চলে যায়।

কাজু জানে, তোচনদা ভাবছে এখন। আর ভাবলেই সে পায়চারি করতে থাকে, থামে, আবার পায়চারি করে অর্থাৎ তার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, উত্তরটা আসি আসি করেও আসছে না।

তোচন পায়চারি থামায়, আমাকে সাহায্য করা মানে হচ্ছে আমাকে কেনা, কিন্তু কেন ? আমি এমন কে যে , কেন, কেন ? প্রশ্নটা শূন্যে ছুঁড়ে দিলেও সে যেন কাজুর কাছ থেকে উত্তরটা চাইছে।

আর কাজুও তার প্রশ্নে ধাক্কা খেয়ে বলে ফেলে, কে ?

আরে ঐ সম্পৎলাল, তোচনের কথায় বিরক্তির মেশে।

কিন্তু উনি তো সাহায্য চাইছেন।

বটে ? তাই বুঝলি এতদিনে ? তোচন একবার দেখে কাজুকে, আচ্ছা বল্ দেখি, লোকে কাকে সাহায্য করে বা করতে পারে ?

কাজু উত্তর দিতে পারে না, চুপ করে থাকে।

এক যে সত্যি দুঃস্থ, দ্বিতীয়ত মানুষ তাকেই সাহায্য করে, যার কাছে থেকে কিছু পেতে পারে। তা আমরা প্রথম দলে পড়ি না, তাহ'লে ?

কাজু তবু চুপ করে থাকে।

আমাদের ফসল কুক্ষিগত করার জন্যে, তোচন আবার পায়চারি করতে থাকে, যেটা আমরা সকলের জন্য করতে চাইছি, সেটা দখল করতে চাইছে ওরা. যাগ্‌গে তুই একবার যা কেজরিওয়ালের কাছে, জানা যাবে না. তবু সে কথাটাও আমাদের জানা দরকার।

কাজুর বেরিয়ে যাওয়ার মুখে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে রঘু।

ব্যাপার কি রঘুদা, পিছে ধাওয়া করলো কে আবার ?

রঘুর চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে, তুমি কি করলে জানলে তোচনদা ?

জানা খুব কঠিন নাকি ? তোচন হাসে, তোমার চোখ মুখ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকা ইত্যাদি বলছে সে-কথা।

সত্যি তাই, একটা লোক সেই দোকান থেকে পিছু নিয়েছে আমার। প্রথমে টের পাইনি, কিছুদূর আসতেই দেখি একটা লোক আমার থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে হাঁটছে। গা করিনি প্রথম প্রথম. ওমা কিছুদূরে গিয়ে পেছন ফিরতে দেখি সেই লোক। আবার বাড়ির কাছে এসে দেখি—আর একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে। তার দিকে তাকাতে সে ভান করলো এমন যেন সে কারুর জন্য অপেক্ষা করছে।

আচ্ছা, তাহলে বেশ আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে ওরা ছাড়বে না আমাদের

তাহ'লে ?

এতেই ভয় পাচ্ছো রঘুদা, সামনে বড় বিপদ এলে কি

করবে ? তোচন থামে একটু. আমাদের সাবধান হতে হবে এই যা. আর তেমন বিপদ দেখলে. তোচন হাসে. যঃ পলায়তি স জীবতি, অতএব মাভৈ, আমাদের তো আর একটা বাড়ি আছে

আচ্ছা তোচনদা. অনেকক্ষণ পরে কাজু বলে, এক কাজ করলে হয় না ?

কি কাজ ?

এখানকার ল্যাব টা ও বাড়িতে নিয়ে গেলে কেমন হয় ·

কথার মধ্যেই তোচন হেসে ফেলে. ও-বাড়িটা খুব নিরাপদ নাকি ? অক্টোপাশের আটটা দাঁড়ার চেয়েও ওদের এক একটা দাঁড়া অনেক বেশি শক্তিশালী, একবার ধরতে চেষ্টা করছে যখন, তখন পার পাওয়া সহজ হবে না, সে আমরা যেখানেই যাই না কেন. তবে শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, আমাদের এ-বাড়ি ও বাড়ি করতেই হবে, কখনো দূরেও পালিয়ে যেতে হবে; সে একটু দম নেয়, তবে ও বাড়ির অনেক সুবিধে আছে, জায়গা বেশি. লুকিয়ে পড়ার ফাঁকও পাওয়া যায়, কি বলো রঘুদা ?

তবে আজই চলো না কেন ? রঘু প্রস্তাব রাখে

ধীরে রঘুদা ধীরে, কাজু গিয়ে খবরটা আনুক, তুমিও গোছগাছ শুরু করে দাও, ততক্ষণে আমিও গুছিয়ে নি, তাছাড়া, তোচন আবার থেমে পড়ে, কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে. ঝট্ করে এ-বাড়ি ছেড়ে দিলে ওরা পেয়ে বসবে. ভাববে আমরা বুঝি ভয় পেয়েছি আচ্ছা তাহ'লে কাজু···

কাজু আর দেরি না করে বেরিয়ে যায়।

রঘু চলে আসে রান্নাঘরে। আর তোচন গিয়ে বসে টেবিলে।

কাজু ফিরে এলে তোচন এগিয়ে আসে একটু ব্যস্ত হয়েই, কিছু খবর পেলি না তো ?

কাজু মাথা নাড়িয়ে জানায়, নাহ্ তারপর একটু জিরিয়ে নেবার মতো চুপ করে থাকে।

খুব ধকল গেছে বুঝি ?

না—না কিছু ধকল হয়নি, কাজু বলতে থাকে তখন গিয়ে শুনি কেজরিওয়াল এখন সেখানে থাকে না, কোম্পানীর মালিক হয়েছেন আহুজা। গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, দেখি লাল আলো জ্বলছে, বেয়ারা বলল, মিটিং চলছে। অপেক্ষা করতে করতে হন্দ হয়ে যখন ফিরছি, তখন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে করিডোরে দেখা। তিনি যেচে আলাপ করে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আমি সম্পৎলালের কথা বলাতে তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোন্ সম্পৎলালের কথা বলছি। তাঁকে সম্পৎলালের চেহারা বর্ণনা করে ঠিকানাটা বলি, তাতে তিনি হেসে বলেন, আমি সম্পৎলালের যে চেহারার বর্ণনা দিয়েছি তেমন চেহারার নাকি অনেক সম্পৎলাল আছে এবং তাদের ঠিকানাও প্রায় এক। আমি তো অবাক, তিনি আবার হাসতে থাকেন, আমার কাছে জানতে চান রাবণের দশটা মুণ্ডুর মধ্যে কোনটা হচ্ছে আসল মুণ্ডু, তা এর কী জবাব দেবো আমি। তারপর বললেন. যদি জমি থাকে তবে তাকে দিতে, তিনি ন্যায্য দাম দেবেন প্লাস ফ্ল্যাট তুলে নিজের পছন্দ মতো একটা ফ্ল্যাটও দেবেন, আর সাবধান করে দিলেন ঐ সব রাঘববোয়ালদের পেছনে না ছুটতে, ওরা চুনোপুঁটিই শুধু নয় রুই কাতলাও গিলে খায়, ওঠার সময় বারবার অনুরোধ করলেন তাঁকে যেন একটা সুযোগ দি আমি, যাতে তিনি দেখিয়ে দেবেন যে উনিও কম যান না ··

তাহ'লে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে প্রোমোটার ? কাজুর কথা শুনে তোচন গম্ভীর হয়ে যেন প্রশ্ন করে নিজেকেই। কাজু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, মনে হলো, ভদ্রলোক আহুজা কোম্পানীতে চাকরি করেন, মোটা মাইনেও পান, তবু

সেটা ভেবে আর লাভ কি, তোচন ভাবতে ভাবতেই বলে, তবে ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন—সব সম্পৎলালের চেহারা এক আর তাদের আসল মুণ্ডু যে কোনটে, সেটা ধরা মুস্কিল, যাক্ সে যাক্, কি করা যাবে, যতক্ষণ পারা যায়···

তখন ফোন বেজে ওঠে।

হ্যালো, কাজু ফোন ধরে, হাঁ আছেন, আপনি কে বলছেন, ধরুন একটু, দিচ্ছি, ফোনের মুখে হাত রেখে তোচন বলে, তোমাকে চাইছে কে একজন অনন্ত সেনগুপ্ত

অনন্ত অনন্ত সেনগুপ্ত, মনে করার চেষ্টা করতে করতে আসে তোচন হ্যালো কে···হাঁ্যা···বলছি একটু জোরে বলুন হাঁ্যা···কি পেয়েছেন ফাইলটা···মেনি থ্যাঙ্কস্··· হাঁ হাঁ বলুন, নির্ভয়ে বলুন···

তোচন নিবিড় মনোযোগ দিয়ে ও প্রান্তের কথা শুনতে থাকে কিছু বলে না, কেবল শুনে যায়

কাজু দেখে, তোচনদার মুখ ক্রমে গম্ভীর হচ্ছে তার চোখ মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠছে, আর টেলিফোনের মুখ ও কান তোচনদার মুখ ও কানে লেপ্টে যাচ্ছে।

কে কথা বলছে ? অনন্ত কে ? এই নামটা তো চেনা নয়, খুব সিরিয়াস কথা মনে হচ্ছে, নিশ্চয় কোনো বিপদ কাজু ধরতে পারছে না

না—না, এবার তোচন বলে ওঠে, ওখানে নয়, ঝিলমিলটা ঐ সময় খাঁ খাঁ করে, লাখ টাকা দিলেও যাবো না বুঝলেন, মহাবীর আইল্যাণ্ড···না, না,···হাঁ হতে পারে, মেট্রোর গায়ের গলিতে ঐ দোকানের সামনে কী বললেন স্পোর্টস্ গেঞ্জি স্ট্রাইপ্ দেওয়া গেরুয়া ব্যাগ কাঁধে রাত আট-টা পাঁচে···ফাইলটা ফেরৎ পাবো তো — আচ্ছা রাখছি···টেলিফোন নামিয়ে তোচন কাজুর দিকে তাকায়, বুঝলি ?

বুঝলাম, কাজু ইচ্ছে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সেই পুরনো কায়দা —বলে কি জানিস, ফাইল ফেরৎ দেবে কিন্তু তার বদলে দিতে হবে তিন লাখ, আর সাকরেদদের পাঁচ পাঁচ হাজার করে

মগের মুলুক নাকি ?

আরো বলে কি শোন —টাকা দিতে না পারলে তোর ও রঘুদার সত্ত্ব ছেড়ে দিতে হবে। প্লাস পঞ্চাশ হাজার পারিশ্রমিক

ব্যাপারটা কি ! সব খেপে গেলো নাকি

খেপবে কেন, বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বলল, মেট্রো সিনেমার লাগাও গলিতে টাকা নিয়ে যেতে রাত আটটা পাঁচে

যাবে তুমি ?

তোচন হাসে, তুই কি বলিস

মানে, যদি পুলিশ কে জানিয়ে যাওয়া যায়, তবে—

কোনো লাভ হবে না, তা বেশ ভালো করেই জানিয়ে দিয়েছে, তোচন একটু থামে, বলে পুলিশ নাকি ওদের বন্ধু, পুলিশে খবর দিলে আমাদেরই বিপদ বাড়বে, বলল তাতে আমিও যাবে ছালাও যাবে, মনে হচ্ছে ওদের টার্গেটের মধ্যে শুধু আমি-ই নেই, তোরাও আছিস্

আমরা এত ইম্পরটেণ্ট ?

সিওর, ওরা জানে—তোদের ছাড়া আমি এক পা চলি না, চলতে পারি না, তাছাড়া তোদের কাছ থেকেও জানতে চায়···

আচ্ছা, আচ্ছা, কাজু এবটু নার্ভাস হয়, তারপর···

নট্ গোইং, হেসে ওঠে তোচন

তা'হলে ফাইল ?

চুলোয় যাক্, ফাইল নিয়ে ওরা করবে কি, সব কোডে আছে, এক তুই ছাড়া তৃতীয় কেউ জানে না কোড্ রহস্য, হয়ত এটা ওরা জানে, তাই তোদের কব্জা করতে চায় যে কোনো ভাবে

তাহলে এর পেছনে রাঘব-বোয়ালই আছে, মনে হচ্ছে

আলবৎ, কত সম্পৎলাল যে আছে, ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন···

এদের হাত থেকে নিস্তার নেই সহজে তবে ?

নিস্তার পাওয়া মুস্কিল, তবু আমাদের তো থামলে চলবে না

কিন্তু, কাজুকে একটু ভাবিত দেখায়, তুমি এমন কিছু করছো না যে তাতে ওদের কোনো ক্ষতি হবে···

হবে বলেই তো মাথা ব্যথা, এখন স্পেস্ এর সমস্যা তো দারুণ, আমাদের গবেষণা আর কাজে স্পেস্ আর হাউসিং-এর একটা নতুন দিক খুলে যাবে, দেখলি না — চাঁদে যাবার আগেই চন্দ্র বিজয়ের আগেই চাঁদে জমি কেনা নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল, আর আমাদেরটা তো কাছের ব্যাপার. পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেই সব ঝাঁপিয়ে পড়েছে—

ঝাঁপিয়ে পড়লে তো আমাদের সুবিধে হবে, ওদের মারামারি কাটাকাটির মধ্যে আমরা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো

সে আর কতক্ষণ, তারপর —

তাইতো, কাজু আমতা আমতা করতে থাকে

আর দ্বিধা নয়, প্রথম কথা আজই ও-বাড়ি যেতে হবে, দ্বিতীয় কথা—

সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দিতে হবে

তৃতীয় কথা —

এখুনি রেডি হতে হবে যাবার জন্য

দুজনেই হেসে ওঠে, একসঙ্গে দুজনেই হাঁক দেয়, রঘুদা

দূর থেকে রঘু চিৎকার করে বলে, আমি রেডি

পাঁচ

কাজু ডাইরি লেখে প্রায় রোজ। অবশ্য লেখার কোন সময় অসময় নেই, যখন ফাঁক পায় টুকটাক লিখে রাখে। তারপর ভরাট করে দেয় বাদ পড়লে কিছু। তোচন তাকে খেপায়, তবু ডাইরি দেখতে কৌতুহল তার নেই মোটে। ডাইরি তার মতে একজনের খুব নিজের ব্যাপার।

তোচন বলে, অন্যের চিঠির মতো পরের ডাইরি পড়াও সমান দোষের।

যদি লেখক অনুমতি দেয় পড়তে ?

তখন পড়া যেতে পারে।

তবে নাও, পড়ে দেখো কী লিখেছি

এত ঝট পট ? দাঁড়া, আগে সুস্থির হয়ে নি, তারপর যখন অঢেল সময় পাওয়া যাবে, তখন পড়বো।

অঢেল সময় কি পাবে কখনো ?

তাহ'লে পড়া হবে না, তোচন হালকা ভাবে ব'লে গম্ভীর হয়, ডাইরি লেখা খুব ভালো অভ্যেস, আমিও লিখবো ভাবি, কিন্তু সে হাই তুলে বুঝিয়ে দেয় যে, সেটা তার ভাবার স্তরেই থেকে যায়।

কাজু ডাইরি লেখে, খুব বিশদ করে পারে না, তবে লেখার ঝোঁকটা থাকে কাজের সম্বন্ধে বেশি।

কাজুর ডাইরি।

২৩শে

চলে এসেছি দরকারী জিনিষপত্র নিয়ে এখানে। গুছিয়ে নিতে একটু বেশি সময় লাগলো, তিনজনেই সমানে খেটেছি, বলা যায় নন-স্টপ্ শুধু ছিল ছোট্ট বিরতি—চায়ের। অনেকের অবশ্য।

চা যে এত ভালো, আগে কে জানতো! বোধ হয় শরীর চা-চা করছিলো খাটুনির জন্য। রঘুদা যে দুর্দান্ত চা বানায়, তাই বা জেনেছি কখন ? বিস্কুট আর চা-ই ছিল ঘর গোছানোর সময় আমাদের খাদ্য।

ঘর ঠিকঠাক করে এবার কাজে নামার পালা। প্রতিটি প্রকল্পের কাজ শুরু করার আগে যেমন হয়, এবারও তেমন ভাবেই শুরু হলো আমাদের যাত্রা। তোচনদা পরিকল্পনা টির উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলো, তোচনদা মনে করে, যে কাজটা হাতে নিচ্ছি তার উদ্দেশ্য কী, তা অন্তত মোটামুটি জানা দরকার, নইলে কাজ ঠিক হয় না, উদ্দেশ্য না জেনে কাজ অজ্ঞতার নামান্তর।

তোচনদা বলে, জায়গা ও আবাসের সমস্যা আমাদের দেশের এক বিরাট সমস্যা, শুধু আমাদের দেশেরই নয়, পৃথিবীর বড় বড় দেশের এ সমস্যা দারুণ হয়ে উঠেছে। লোক বাড়ছে প্রচুর, সেই অনুপাতে স্থান সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। কলকাতাতেই লক্ষ লক্ষ লোক ফুটপাথে রাত কাটায়। দিকে দিকে হাই-রাইজ উঠছে গাছ-গাছড়া কেটে ফসলের ক্ষেত ধ্বংস করে। তার ফলে প্রকৃতি ও মানুষের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আবাসনের জন্য ফসল ক্ষেত নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, ফলে উৎপাদন কমে যাচ্ছে, গাছ কাটার ফলে জমির ক্ষয় বাড়ছে, বৃষ্টিও কমে যাচ্ছে। অথচ হাই-রাইজ হয়েই চলেছে। এতে সাধারণ মানুষের কোনই লাভ হচ্ছে না। গুটি কয়েক মানুষ সব সুবিধে ভোগ করছে। এই সব কথা বিবেচনা করে মেঘের কোলে ঘরবাড়ি প্রকল্পটি নেওয়া হচ্ছে, সংক্ষেপে তোকার ১। কম খরচে সকলের জন্য বাড়ি।

দু-ধাপে এর কাজ হবে। প্রথম ধাপ হচ্ছে মেঘে যাবার জন্য যান তৈরি করা আরোহন পর্ব, দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে নির্মাণ পর্ব মেঘে গিয়ে ঘর বাড়ি বানানো। আমাদের প্রতিটি প্রকল্পের যে আদর্শ কম খরচে কাজ তা বর্তমান ক্ষেত্রেও বহাল থাকছে··· রঘুদা ও আমি চুপচাপ শুনে শুনে গেলাম। তোচনদা বোঝাল খুব সহজভাবে তার বলার ভঙ্গিটি একেবারে ঘরোয়া।

তোচনদা শেষ করে আমাদের দিকে তাকায়। এ বিষয়ে আমাদের মত কী তা জানতে চায়। এটা আমার খুব ভালো লাগে—এই খোলামেলা আবহাওয়া। তোচনদার নিজের মত কখনো চাপিয়ে দেয় না। অনেক সময় আমাদের কথায় আমূল পাল্টে দেয় ছক।

আমাদের যোগ করার কিছুই ছিল না তাই চুপ করে থাকি। তোচনদা আরো কিছু সময় দেয় আমাদের। তারপর তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি ফুটে ওঠে, পরিকল্পনাটা গৃহীত হলো তাহ'লে। আমরা হাত নাড়িয়ে সম্মতি জানাই, তারপর চলে আসি যার যার জায়গায়।

২৪শে।

আজ আমাদের বিশেষ কাজ ছিল না। রঘুদা একটা নকশা ঠিকঠাক ক'রে গেছে রান্নাঘরে, আমি এমনি দু-একটা বই নাড়া চাড়া করছিলাম। কোনো পাতাতেই কোনো লাইনে মন বসছিলো না। এদিকে তোচনদাও ঘর থেকে বেরুচ্ছে না, ঘুমিয়েছে হয়ত। কিন্তু এতক্ষণ কেন ঘুমুবে ? রঘুদাকে ডাকলাম, বললাম -তোচনদার কথা। রঘুদার চোখে মুখে উদ্বেগ ফুটলেও সে কি যেন মনে করার চেষ্টা করে। তারপর মনে পড়লে বলে, তোচনদার ঘরে সে খুট-আওয়াজ শুনেছে এবং একবার তার কাশি। অতএব তোচনদা ঘুমোয় নি।

তাহলে এতক্ষণ কি করছে ঘরে একা একা। দরজা বন্ধ।

তোচনদা বড় একটা একা ঘরে থাকে না, আজ হলো কি তার ? তাকে ডাকবো কি ডাকবো না টানা পোড়েন চলল খুব। রঘুদাও কিছু মত দিতে পারছে না। কী করা, অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। রঘুদা আবার রান্নাঘরে চলে যায় একটা পোড়া গন্ধ পেয়ে। আমি বসে

আদি। দশটা পাঁচে তোচনদার দরজা খুলে গেল। যে বেরিয়ে আসে তাকে দেখে চমকে উঠি, চেয়ার ছেড়ে উঠে পরিত্রাহী চিৎকার করতে থাকি, রঘুদা শুনে যাও

রঘুদা পড়ি-মরি ছুটে আসে ঘরে, কি হয়েছে, কি হয়েছে ?

সেদিকে চোখ পড়তে ব্যাস্, রঘুদা ঐ অবস্থায় 'ফ্রিজ'

কি করবো ভাবতে ভাবতেই টেবিল থেকে 'পেপার ওয়েট'টা তুলে নি।

খুব বীরত্ব দেখিয়েছো, আর নয়

তুমি ! তোচনদা ! আমার সঙ্গে সঙ্গে রঘুদা লাফিয়ে ওঠে।

চেনা যাচ্ছে নাকি ?

মোটেই না, একসঙ্গে আমরা বলে উঠি।

দেন সাক্সেস ফুল

কিন্তু কেন ?

ঘরে বসে থাকলেই চলবে ব্রাদার ? যাবো বাজারে, জিনিষ কিছু বাকি আছে তোকার ১-এর।

তাতে, এই বেশে ?

চারদিকে বন্ধুরা আছে না ? লেগে যাবে পেছনে, শেষমেশ কেনাই হবে না কিছু।

তাই বল।

হাঁ ব্রাদার, তাই এই বেশ, আমি যাচ্ছি বুঝলি, পেছন দিক দিয়ে তে-মাথায় একটা ট্যাক্সি বা অটো ধরে নেবো।

বাসে গেলে ভালো হয় না ?

সেটা ঠিক, কিন্তু সময় কম, অথচ জিনিষ কিনতে হবে দেদার, যাইহোক ফিরতে দেরী হলে চিন্তা করিস না।

বলেই কথা না বাড়িয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে যায়।

আর আমরা দুজন কী করবো ভেবে পাই না। রঘুদা নকশাটা আবার দেখতে থাকে, আমি কী করবো ভাবতে ভাবতে দু-একটা চিঠি দেখতে থাকি--পুরনো চিঠি, বেশির ভাগ ক্যাটলগ ও সেই সংক্রান্ত।

রঘুদা নকশার কাজ শেষ করে রান্নাঘরে যায়। সেখানকার কাজ সেরে আবার ফেরে আমার ঘরে। আমি চিঠি ছেড়ে জার্নাল দেখি, সেটা ছেড়ে দিয়ে শরৎরচনাবলী, তাও না পড়ে আবার একটা বই টেনে নি ; ডিকেন্স-এর এ টেল অভ টু সিটিজ, সেটাও পড়ি না। সন্ধে হয়ে এলো, তবু তোচনদার দেখা নেই।

কি ব্যাপার ? রঘুদা এসে দাঁড়ায়।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করি কি ব্যাপার।

তারপর ঘর-বার করতে থাকি দুজনে। রঘুদা বাগানের দিকে যায় তো আমি রাস্তার দিকে। আবার আমি বাগানের দিকে তো রঘুদা রাস্তায়। এইভাবে কত বার।

তবে কি সম্পতের লোকজন টের পেয়ে গেছে যে তোচনদা বেরিয়েছে বাজারে ?

তারাই কি ধরে নিয়ে গেল নাকি ? কেনই বা ধরবে ? ধরলে তো তাদেরই ক্ষতি হবে, তোচনদা বেঁকে বসবে আরো, তবে ?

সম্পৎলালের ফোন নাম্বার আছে। টেলিফোন তুলে ডায়াল করলাম সেই নাম্বার। লাইন কেটে যাচ্ছে মাঝ পথেই, না হয় ও পাশে বেজেই চলে ফোন, কেউ ধরে না।

লাইন খারাপ বোধ হয়···

কিছুক্ষণ পরে আবার ফোন করি। এবার সফল, হ্যালো শুনতে পাই ও-প্রান্তের।

হ্যালো, সম্পৎলাল আছেন,···কেউ থাকেন না এই নামে···নাম্বারটা এই তো···কি বলছেন আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি কয়েকদিন আগে ··হাঁ হাঁ যাহ্ বাববা ঐ নামে কেউ ছিলেন না পর্যন্ত ··তাজ্জব···আপনার নাম্বার তো···

ও প্রান্তের গ্রাহক ফোন নামিয়ে দিয়েছে তখন।

রঘুদার দিকে তাকাই, কি ব্যাপার বলো তো ?

আমিও তো কিছু বুঝছি না, রঘুদার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে।

তার মানে আমরা সম্পৎলালের সঙ্গে কথাই বলি নি ?

রঘুদাও থম মেরে গেছে, অবাক হওয়াও বোধ হয় এখন তুচ্ছ হয়ে গেছে আমাদের কাছে। টের পাচ্ছি, রঘুদার অস্থিরতা খুব বেড়েছে, সে এ-পাশ ও-পাশ করছে কেবল।

হঠাৎ থেমে পড়ে রঘুদা, তুমি আর একবার ফোন করো প্লিজ।

আবার ?

প্লিজ্।

আবার ডায়েল করি। ওমা ! অবাক কাণ্ড।

ও পাশ থেকে সাড়া আসে, ইয়েস স্পিকিং, সম্পৎলাল।

চমকে উঠি, দেখি রঘুদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আমি কাজু বলছি, আপনাকে আগেও ফোন করেছিলাম কিন্তু যে ধরেছিলো সে বললো এই নামে কেউ থাকে না ·· হ্যালো হাঁ···আপনি জানেন তোচনদা বের হয়েছেন··· হ্যালো ওসব লেনদেনের আমি কিছু জানি না, আমি এসিস্টেন্ট মাত্র...হাঁ তোচনদার সঙ্গে কথা বলবেন...কি

বললেন তোচনদা বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন.. আপনি কি…

ফোনের সংযোগ কেটে যায়। ফোন নামিয়ে তাকাই রঘুদার দিকে, ব্যাপার কি ভাই ? রঘুদার চোখ ছানাবড়া, এই বলছে সম্পৎলাল বলে কেউ থাকে না ওখানে, আবার সেই কথা বলছে, ব্যাপারটা কি ? এমন কি তোচনদার চলা-ফেরা-র খবর রাখছে, বুঝতে পারছো কিছু ?

কিছু না, মাথায় কিছু ঢুকছে না, এখন ভালোয় ভালোয় ফিরলে বাঁচি…

ঠিক তখুনি তোচনদা ঘরে ঢোকে, এই তো ফিরলাম। তোচনদা এক এক করে অনেক কিম্ভুত অম্ভুত জামা কাপড় ফেলতে থাকে টেবিলের উপর খাটের উপর

কাজু প্লিজ, রঘুদা আর তুই গিয়ে ট্যাক্সি থেকে জিনিষগুলো নামিয়ে আন্ আমি ডগ্‌টায়ার্ড, যা ধকল গেছে সারাদিন…, বলেই তোচনদা বিছানার উপর ধপাস করে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকতে শুরু করে।

রঘুদা ও আমি দুজন দুজনের দিকে তাকাই, তারপর আস্তে আস্তে যাই ট্যাক্সির দিকে।

প্রায় ঘণ্টা চারেক অসাড়ে ঘুমোয় তোচনদা। আমরা ভেবে পাই না, এমন অসাড়ে ঘুমোচ্ছে কেন সে। তবে কি কেউ খাইয়ে দিয়েছে কিছু ? রঘুদার মনেও সেই সন্দেহ জাগে। অথচ আমরা কিছুই করতে পারি না। এদিকে পেট চোঁ চোঁ করছে। কী করা যায়, আমরা খেয়ে নি। আর আলোচনা করতে থাকি, ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত হবে কিনা। কিন্তু এত রাত্রে কোনো ডাক্তারই আসতে চাইবে না, তাহলে করা কী…চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। এইসময় তোচনদার ঘুম ভাঙে। উঠে প্রথম ঠাহর করতে পারে না কোথায় আছে, হাতড়াতে থাকে এধার ওধার। আমি গিয়ে তাকে ঝাঁকিয়ে দি খানিক।

তখন তোচনদা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, খুব ঘুমিয়েছিলাম, তাই না ? তোরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলে নিশ্চয় ? বলেই কেমন বুদ হয়ে বসে তোচনদা ! জিজ্ঞেস করতে গিয়েও কথা আটকে যায়। চেয়ে থাকি তার দিকে। আজ আরোহণ শর্মাকে দেখলাম, হঠাৎ তড়াক করে বলে ওঠে —নাকি ?

চা খাওয়ার জন্য ঢুকছি, দেখি উল্টো ফুটপাতে একজনের সঙ্গে গভীর ভাবে কি যেন আলোচনা করছে, তারপর কাজুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমি যে ওখানে যাবো তা কি জানতো আরোহণ ?

আমরা চুপ করে থাকি, কি জবাব দেবো ভেবে পাইনা।

উত্তর নিজেই দেয়, বোধহয় না, একটু থামে তোচনদা, তারপর বলে, তবে আরোহণ সম্পৎলালের সঙ্গে ছুটেছে নিশ্চয়।

তাই কি ?

না হলে এখন সে কলকাতা আসবে কেন ? সম্পৎ আমাকে কাত করার জন্য ওকে ডেকেছে নিশ্চয়। ওতো বরাবর আমার প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রতিদ্বন্দ্বী না ছাই, ও তোমার পায়ের নখের যোগ্য নয়, বলতে পারো ভণ্ডুল মাস্টার…

তোচনদা হা-হা করে হেসে ওঠে, আচ্ছা আচ্ছা ঘুমো গে তোরা, আমি হাতের কাজটা সেরেনি

আরে শোবো কি, তোমার তো খাওয়াই হয়নি।

তোচনদা আবার হেসে ওঠে, খেয়েছি খেয়েছি,—দুটো রসগোল্লা মৌচাক আর সিঙ্গাড়া ভট্টাচার্যের দোকান থেকে, আর কাফে-ডি-মাক্সে কবিরাজী কাটলেট আর চা …

বলেই তোচনদা নিজের ঘরে চলে যায়।

২৫শে

সকলের চা খাওয়ার পর ডাইনিং টেবিলেই তোচনদা আলোচনা শুরু করে, সব মাল-মশলা জোগাড় হয়েছে, তোমরাও চেক্ করে দেখেছো, অতএব আর দেরী করা চলে না। আমরা প্রথমে কাজের প্রথম ধাপ থেকে শুরু করবো। মেঘে যেতে গেলে আমাদের উড়তেই হবে। আকাশে উড়তে কার না শখ হয়। রামায়ণে পুষ্পক রথের কথা আছে। দারুণ জোরে চলতো পুষ্পক, হাঁস-রা নাকি চালাতো আরোহীর ইচ্ছা অনুসারে, আর আরোহী ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো জায়গায় যেতে পারতো। বিহায়স ও একরকম আকাশ যান, পুষ্পকের মতো এটাও সব জায়গায় যেতে পারতো। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা নাকি বাষ্পচালিত ছিল…

রঘুদা ও আমি শুনে অবাক, রঘুদার মুখ হা হয়ে গেছে।

আরে শিল্প সংহিতা তাই বলে, তোচনদা হাসে, আমি গুল মারছি না…

কিন্তু তুমি যে বললে একটু আগে—পুষ্পক হাঁস চালাতো ? ফুট কাটি আমি, আরে এসব কি সত্যি সত্যি ছিল নাকি ?

ছিল না ? রঘুদা বিশ্বাস করতে পারছে না তোচনদার

কথা।

কবির কল্পনা, বুঝলে না? তুমি কি বিশ্বাস করো পক্ষীরাজ ঘোড়ার ডানা ছিল কিংবা পরীর?

ছিল না বলছো? রঘুদা অবাক হয়ে যাচ্ছে, কত ছবি দেখেছি পক্ষীরাজ ঘোড়ার, পরীর।

সেটাও হচ্ছে কল্পনা, মানুষ কত কল্পনা করতে পারে···

তুমি বলছো, এগুলো তবে সত্যি নয়?

রঘুদার কথায় তোচনদা হেসে উঠে খুব, পাগল হয়েছো, তবে একভাবে দেখলে এগুলো সত্যি নয়, অন্যভাবে দেখলে মিথ্যেও নয়।

তার মানে? খটকা লাগে বলে আমি প্রশ্ন করি।

সত্যি নয়—এটা মানো তো? একটু থামে তোচনদা, আবার এগুলো মানুষই কল্পনা করেছে, তাই না? তাহ'লে কল্পনা করাটা তো মিথ্যে হলো না, তবে···বলতে বলতে তোচনদার দৃষ্টি দূরে কোথাও হারিয়ে যায় যেন। সে চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। আমরাও নড়তে চড়তে পারি না পাছে তোচনদার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে।

আমরা তবু, তোচনদা আস্তে আস্তে বলে, কবির কল্পনা থেকে নিজেদের জানার কল্পনা করার পরিধি বাড়াতে পারি, যেমন—পুষ্পক রথের কথাই ধর, ওর ঐ সূত্র ইচ্ছা অনুসারে ইচ্ছা অনুযায়ী যাওয়ার ব্যাপারটা আমাকে এক সময় ভাবিয়েছিল খুব, পুষ্পক থাকতে পারে না সমাজের ঐ স্তরে, কিন্তু কল্পনাটা , আবার তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তার মানে কিন্তু এই নয় যে গ্লাইডার, বেলুন বা প্লেনের পূর্বপুরুষ হচ্ছে ঐ রথ···, তোচন হাসে তখন, বয়েস বাড়ছে তাই চান্স পেয়েই মাস্টারি করতে শুরু করেছি।

বারে, তুমি তো বলবেই, না হ'লে জানবো কি করে?

রঘুদা, একবার কি চা হতে পারে?

ক্ল্যাস্কে নেই বুঝি?

থাকলে কি আর···, বলার আগেই রঘুদা রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ায়, কিন্তু পর মুহূর্তেই ফিরে আসে।

তার চোখে মুখে ভয়ের ছাপ।

কি হলো রঘুদা?

রঘুদার চোখ মুখ সব আতঙ্কে কেমন বিমূঢ়, সে ফিস-ফিস করে বলে, আমার পায়ের শব্দ পেয়েই বোধ হয় দৌড়ে পালিয়ে গেল লোকটা কোন্ দিকে?

রঘুদা দেখানোর আগেই তোচনদা দৌড় লাগাল, আমরাও।

কিন্তু পেছন দিকে তন্ন তন্ন খুঁজে মানুষ তো দূরস্থান, পায়ের ছাপ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

যাক্ গে, তোচনদা তত আমল দেয় না, আয় ততক্ষণ মেঘ গুলো পরীক্ষা করে দেখি।

আমরা তখন গাছের তলা থেকে সরে আসি খোলা আকাশের নীচে। উপরে তাকাই।

নীল আকাশ ঘন নীল, মধ্যে মধ্যে পেঁজা তুলোর মতো নরম ধপধপে সাদা মেঘ।

এই যে মেঘ দেখছিস্, ঐ যে, আঙুল তুলে দেখায় তোচনদা, পেঁজা তুলোর মতো বেশ পুরু, ওটা হচ্ছে কিউমুলাস মেঘ, পুঞ্জ মেঘ বলতে পারিস বাংলায়। ঐ মেঘই আমাদের দরকার, ওখানেই আমাদের কাজ করতে হবে, দেখবি কিউমুলাস বা পুঞ্জ মেঘের আকার প্রায় সময় নির্দিষ্ট থাকে, দেখ্ মনে হচ্ছে একটা চাতালের উপর জমানো হয়েছে···

এই মেঘ আমরা আগে কত দেখেছি, কিন্তু আজ অবাক হয়ে যাচ্ছি মেঘ দেখতে দেখতে। মনে হচ্ছে জীবনে প্রথম দেখছি—মেঘ সব।

রঘুদা মন দিয়ে দেখছে

হঠাৎ তোচনদা তাড়া দেয়, আরে রে রে, চ্ চ্, দেখি কতদূর হলো।

হুড়বিড়িয়ে চলে আসি ল্যাব খ-এ। ঢুকেই তোচনদা দাঁড়ায় কাঁচের বাক্সটার সামনে।

এখনও হয় নি, তবে হতে আরম্ভ করছে, কাল নাগাদ ঠিক হয়ে যাবে। আমরা একটু এগিয়ে আসি দেখার জন্য

কৃত্রিম মেঘ, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়

কারেক্ট, কাল আগামী কাল···

দেখি, বাক্সর ভিতরটা ঝাপসা হয়ে উঠছে।

২৬ শে

আজ একটা হৈ হৈ করা দিন।

কাঁচের বাক্সে সুন্দর মেঘ তৈরী হয়েছে। একেবারে কিউমুলাস মেঘ সাদা ধবধবে পুঞ্জ পুঞ্জ। সেই মেঘ জমাট বাঁধানো হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ জেল্ স্প্রে করে। তোচনদা জানায়, লিকুইড্ কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে মাটি জমাট বাঁধানো যায়, মস্কোর পাতাল রেলের কাজের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে আমাদের এখানে অসুবিধে আছে বলে—তোচনদা তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে একটা সবুজ তরল পদার্থ এবং গাঁদা গাছের পাতার মতো এক ধরনের চেরা—চেরা পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে (এ পাতার নাম তোচনদাও জানে না, তাকে ঐ

পাতার সন্ধান দিয়েছিল বাসনখোলার জনৈক বিঘ্নধর রিয়াং) তৈরী করে এক বিচিত্র জিনিষ, যার নাম জেল্ হলেও তা তরল পদার্থই বটে এবং স্প্রে করা যায়, আর বাষ্প জাতীয় জিনিষকে করে ফেলে কঠিন।

ঐ জেল্ স্প্রে করতেই মেঘটা বেশ জমাট বাঁধে। আনন্দের আতিশয্যে জমাট মেঘ হাতে নেবার জন্য বাক্সের কাছে গেছি খোলার জন্য, তোচনদা চীৎকার করে ওঠে, মরবি তো···। ছিটকে সরে যাই, তোচনদা আর একটা লাল সলিউশন স্প্রে করে তখন মেঘের চারপাশে, এবার খোল্।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলি ঢাকনা মুক্তক যন্ত্র দিয়ে। তোচনদার তৈরী এই যন্ত্র দিয়ে যে-কোনো জিনিষ খোলা যায় খুব সহজে।

মেঘের চাঁই নিয়ে রঘুদা আর আমি লোফালুফি শুরু করি, টিপে দেখি, মাটিতে আছাড় মেরে দেখি কিচ্ছু হয় না কঠিন জমাট মেঘের, এমন কি গলেও না। রঘুদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আসল মেঘও কি এমন হবে?

তোচনদার মুখ তৃপ্তিতে ভরে যায়। তাকায় স্নেহ মাখা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে, হয়ে যাক তবে ফিস্ট, খিচুড়ি ইলিশ ভাজা

হোক্ হোক্···

তারপর সারা দিন ঐ রেশ নিয়ে কেটে যায় দিব্যি বেশ।

২৭ শে

আজ সারাদিন মেঘ দেখে সময় কাটে।

মেঘ দেখা মানে মেঘ দেখে চিনে নিচ্ছি আমরা, রঘুদা আর আমি। আমি বলছি এটা ঐ মেঘ, তো রঘুদা বলছে ওটা ঐ। চলছে চেনার খেলা। না পারলে তোচনদাকে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি।

কিউমুলাস বা পুঞ্জমেঘ আগেই চিনে নিয়েছি। এখন আরো ভালো ভাবে চিনছি সিরাস বা অলক মেঘ, নিম্বাস বা ঝঞ্ঝা জলো মেঘ, স্ট্র্যাটাস্ বা আস্তর মেঘ- ছবি দেখে দেখে মিলিয়ে নিচ্ছি, আর রঘুদা একবার আমাকে, অন্যবার আমি রঘুদাকে জিজ্ঞেস করছি ঠকাচ্ছি আবার হেসে ফেলছি। বেশ বুদ্ধির পরীক্ষা।

তবু কি চেনা যায়?

এক ধরনের মেঘ তো থাকছে না সর্বদা। কখনো নিম্বাসের সঙ্গে মিশছে কিউমুলাস, কখনো কিউমুলাসে এসে একাকার হয়ে যাচ্ছে স্ট্র্যাটাস। তার উপর মেঘ এক এক ধরনের মূর্তি গড়ে তুলছে, তা দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যেতে হয়।

তোচনদা আবার বলে, উপরের মধ্যের নীচের আকাশে থাকে নানা ধরণের মেঘ

ঘাড় ব্যথা হয়ে যাচ্ছে মেঘ দেখতে দেখতে, মেঘের ছবির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে। কিন্তু উপায় নেই। কড়া টিচার তোচনদা, ফাঁকি দেবার উপায় নেই। আমি ফাঁকি দিতে চাইলেও কী হবে, রঘুদা ভীষণ সিরিয়াস, বাধ্য ছাত্রর মতো শিখে চলেছে। তবে বেশিক্ষণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না আর।

চ্ একবার, দেখি পোষাকগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা?

আমরা চলে আসি ঘরে।

আর তখুনি বেল বেজে ওঠে।

রঘুদা একটা খাম নিয়ে ফিরে আসে। হাত বাড়িয়ে খামটা খুলে ফেলি। বিরাট খাম থেকে বের হলো ছোট্ট এক চিরকুট, লেখা শুধু— অভিনন্দন। তোচনদার দিকে বাড়িয়ে দি চিরকুট-টা।

কে দিয়ে গেলো? চলে গেলো নাকি? ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করি।

কেউ না···রঘুদা নির্বিকার ভাবে উত্তর দেয়

সে কি! বেল বাজালো কে তবে?

দরজা খুলতেই খামটা নীচে পড়ে গেল, কাউকে দেখতে পেলাম না। এধার ওধারও দেখলাম, কেউ নেই কোথাও

তাহলে বেল বাজে কেমন করে, যত সব ভূতুড়ে কাণ্ড

তাই তো, রঘুদা কেমন বিহ্বল ভাবে তাকায়

এতক্ষণে তোচনদা মুখ খোলে, নিশ্চয় কেউ বাজিয়েছে, তবে আঙুল দিয়ে নয়···

সে কি?

হ্যাঁ, দরজায় দাঁড়ায়নি, দূর থেকে কিছু দিয়ে নবটা ঠেলেছে···,যাক্‌গে, আমরা ডিটেকটিভ নই অতএব রহস্য ভেদ করার চেষ্টা আপাত নাই বা করলাম, বরং একটু সাবধান থাকি, তাতে ক্ষতির মাত্রা কমতে পারে

চিরকুট-টা ভালো ভাবে দেখে তোচনদা. যেই লিখে থাকুক, সে আমাদের বন্ধু নয়, এবং আমাদের উপর নজর রাখছে খুব

এবার এসে পড়ি ল্যাব ক-এ। এটা ওয়ার্কশপ্, কারখানার মতো ল্যাব। ক-ল্যাবে যন্ত্রপাতি তৈরী ও মেরামত হয়, বলা যায় প্রযুক্তি ভবন আমাদের। ইলেক্ট্রিসিটির জন্য আমরা কোনো পর্ষৎ বা সংস্থার উপর নির্ভর করি না, নিজেদের শক্তি উৎপাদন যন্ত্র 'শান্ত' আছে।

পুকুরের মধ্যে চাকা বাঁসয়ে দারুণ বেগে চাকা ঘুরিয়ে ডায়নামোর মতো দেখতে শাক্ত যন্ত্রে বেল্ট পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যাস তাই তে সব কাজ চলে যাচ্ছে। লোডশেডিং-এর বালাই নেই। কল বিগড়ে গেলে সারাতেও বেশি সময় লাগে না। গোলহর যন্ত্রের বোতাম টিপে সে কাজ সারা হয়।

গোলহর যন্ত্রটির সুবিধে এই যে ঘরে বসেই জানা যায়, কোথায় কি বিগড়েছে - পর্দায় ছবি ফুটে ওঠে এবং কি বিগড়েছে তাও নির্দেশ করে জানিয়ে দেয় কোন্ বোতাম টিপতে হবে। এমন কী বাগানে থাকলেও জানা যায়— কোথায় কী খারাপ হলো, তখন একটা কিচ্ কিচ্ উঠতে থাকে। এই যন্ত্রটা নিয়ে একবার বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল আমাদের।

তোচনদা একবার চারপাশ দেখে নেয়। তারপর বলে, আমাদের কিন্তু আর দেরী করা উচিত নয়, যথেষ্ট দেরী করে ফেলেছি আমরা শুরু করতে। আজই আমরা লাগবো ইচ্ছারথ তৈরীর কাজে, তারপর

মারো জোয়ান হেঁয়ো···ধ্বনি দিয়ে আমরা লেগে পড়ি কাজে।

১৮ই

প্রায় তিন হপ্তা বাদে লিখছি।

এ ক-দিন যে আমাদের কীভাবে কেটেছে, তা কহতব্য নয়। তোচনদা যে কী অমানুষিক খাটতে পারে, সেটা দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। নাওয়া খাওয়ার সময় ছিল না, তবু রঘুদা ও আমি ঘণ্টা, সোয়া-ঘণ্টা মতো সময় বিশ্রাম নিতে পেরেছি, তোচনদা এক মিনিটও নয়। রাতের পর রাত না ঘুমোলে মানুষ বাঁচতে পারে? তোচনদা সেই অসম্ভব সম্ভব করেছে এই ক-দিন না ঘুমিয়ে, অবশ্য সে ঘুম-নাশক বড়ি খেয়েছে দু-একটা। তবু একটু ঘুমোতে হয় নিশ্চয়।

আশ্চর্য, তোচনদা বেশ সুস্থই আছে, বরং তাকে বেশ হাসি খুশি দেখায়। এমন কী আমাদের শরীরও মোটে খারাপ হয় নি। কাজের মধ্যে ছিলাম বলেই কি শরীর ঠিক আছে? আর কি কারণ থাকতে পারে? মেতে গিয়েছিলাম কাজের মধ্যে আমরা।

যদি ব্যর্থ হতো তোচনদা? ভাবতেই পারি না সে-কথা। সফল হয়েছি বলেই পিছনের দিকে তাকাতে ভরসা পাচ্ছি।

কিন্তু সাফল্য কি সহজে এসেছে?

ব্যর্থতার সীমা পরিসীমা নেই যেন। এক এক সময় মনে হচ্ছিল পুষ্পক রথ যেমন কবির কল্পনা, বাস্তবে ছিল না কখনো, তেমনি ইচ্ছারথ থেকে যাবে তোচনদার কল্পনায়, সত্যি কখনো হয়ে উঠবে না। একেবারে সাফল্যের মুখে এসে হয়ত ফেটে গেছে বাইরের আবরণ, কিংবা চিড় ধরেছে অভ্রের দেয়ালে। আমিও তো ভেবেই ফেলেছিলাম, তোচনদা সেফ পাগলামি করছে, কিন্তু আশ্চর্য তার ধৈর্য, আশ্চর্য তার আশার মনোভাব।

মরে যাই তাতে ক্ষতি নেই, তবু হার মানছি না, মানবো না, মরে গেলে অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে মরবো যে চেষ্টা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত। এ সব কথা আমার মনে সাড়া জাগায় নি মোটে, মনে হচ্ছিল এগুলো কথার কথা, তোচনদা নিজের বিফলতা ঢাকছে এই সব কথা দিয়ে কিন্তু এখন? যখন তোচনদা করেই ফেললো ব্যাপারটা···?

যে নকশা করা হয়েছিল ইচ্ছারথের, তার থেকে কিছু অদল বদল করতে হয়েছে বটে, তবে মূল কাঠামো একই আছে--

ইচ্ছারথের গড়ন প্রায় হাউই-এর মতো—চারদিকটা গোল মাথাটা সরু ত্রিভুজাকৃতি—প্রায় সমবাহুর মতো, তবে অনেক বড় এবং তৈরী করা হয়েছে নানা জিনিষ দিয়ে। ইচ্ছারথের মূল কাঠামো করা হয়েছে প্রথমে অধাতু-ধাতু মেলানো ফাঁপা নল দিয়ে, সেগুলো বেড়ার খুঁটির মতো, আর রথের বেদি বা পিঁড়ি করা হয়েছে স্তরে স্তরে পেটানো চামড়া ও সঙ্কর ধাতু দিয়ে, তবে চামড়া ও ধাতুর পরপর স্তরগুলির মধ্যে ফাঁক আছে। রথের ত্রিভুজাকৃতি ছাদ এবং গোলাকার শরীর মোড়া হয় তারপর দু-পাট করা চামড়া দিয়ে নলগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে, এখানেও চামড়ার স্তর মাত্র একটি নয়, তিন স্তরে করা হয়েছে। চামড়া সব গণ্ডারের, তবু তাকে নমনীয় ও কোমল করা হয়েছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। এতে রথের শরীর মজবুত যেমন হয়েছে, তেমনি খাঁজ খাঁজ ক'রে ফুলের পাপড়ির মতো মন্দিরে পদ্মের খাঁজের মতো করা হয় বলে প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা বা হাজার হাজার মাইল বেগের হাওয়া রথের ক্ষতি করতে পারবে না।

দু-পাট ও স্তরের মধ্যে জায়গায় সব ভরাট করা হয়েছে বাতাসের চেয়ে অনেক অনেক হাল্কা এক নিষ্ক্রিয় গ্যাসে। কিন্তু নলগুলো ভরা হয়েছে দাহ্য তরল ও বাষ্পে। আর নলগুলোর গাঁটে গাঁটে স্বতঃক্রিয় ভাল্‌ভ। নলের

ভিতরকার জ্বালানি রথটিকে উপরে নিয়ে যাবে, কোনো শব্দ হবে না আর বাড়তি অংশ কিছু থাকলে ভাল্‌ভ দিয়ে বের হয়ে যাবে।

কিন্তু এখানে জ্বালানি নষ্ট হবার উপায় নেই, তোচনদা এসব ব্যবস্থা ক'রছেন যাতে—জ্বালানি থেকে শক্তি হবে উত্থানের, আর সেই শক্তি ফের তৈরী করে নেবে জ্বালানি পুড়ে যাওয়া উপাদান থেকে আর এক স্প্রে-র সাহায্যে।

চামড়ার আবরণের পর আর একটা ধাতব আবরণ দেওয়া হয়, যা নানা ধাতু মিশিয়ে করা, তার উপর পাতলা অভ্র চাদর (এ চাদরও শুধু অভ্র দিয়ে তৈরী নয়, এতে তাপ ও বিদ্যুৎ রোধক-শোষক ধাতু মেশানো হয়েছে)। রথের ভিতরে আস্তরের গায়ে পালকের পর্দা তারপর কিন্তু পর্দার মাথা, পা, সব পাশ রথের ছাত, পিঁড়ি ও শরীরে পরতে পরতে আটকানো এতটুকু নড়চড় হবে না তাতে, হাজার ঝাঁকুনি ধাক্কায় অনড় থাকবে পর্দা।

তোচনদা পাখির ব্যাপারটা বেশ খেয়াল রাখে রথের ব্যাপারে। তোচনদার মতে, পাখির শরীরের হাড় বেশ হাল্কা আর ফাঁপা। মানুষের হাড়ে মজ্জা আছে, পাখির হাড়ে নেই অথচ খুব শক্ত। এর ফলে ওড়া সহজ হয়। সেজন্য নলগুলো তেমন হাল্কা আর ফাঁপা করা হয়েছে। পাখির পালক পাখির শীত দূর করে, গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখে এবং জল-ঝড়-বৃষ্টি গায়ে লাগতে দেয় না, তেমনি পালকের পর্দা রথ ও রথের আরোহীদের অনেকখানি বাঁচাতে পারবে গরম ঠাণ্ডা জলবৃষ্টি থেকে।

এ-ছাড়া আরো নল আছে তাপ বায়ু আসা যাওয়ার জন্য, চাপ কমা বাড়ানো বা সমতা রাখার জন্য।

রথের প্রবেশ পথটি স্বতঃক্রিয়, একটা রেখা আছে, তাতে দাঁড়ালেই খুলে যাবে, এবং রথের মধ্যে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়।

ভিতরে বসার জন্য আছে দোলনার মত চেয়ার, তার সামনে রথের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা অংশ দিয়ে টেবিল। এই টেবিলের উপর রাখা আছে ইচ্ছারথের প্রাণ ইচ্ছাপূরণ যন্ত্র, অনেকটা টাইপ রাইটার যন্ত্রের মতো, তবে চাবির বদলে আছে নানা রঙের বোতাম, এবং যন্ত্র থেকে অসংখ্য তার বেরিয়ে গেছে নানা দিকে—কোনটা ঢুকে গেছে জ্বালানির নলে, কোনটা বা রথের শরীরে—মাথায় পায়ে, আরো আরো অনেক নলে, চামড়া অভ্র পালক ইত্যাদির পরতে। আর কিছু তার আছে যে-গুলো আরোহীদের পোষাকে টুপিতে যোগ করা হবে ওড়ার সময়।

বোতামের উপর রাইটারের মতো অ আ ইত্যাদি লেখা, ঐগুলি কাজ ও ইচ্ছার সংকেত বহন করছে, যেমন গ = গতিমাপক, উ = উচ্চতামাপক, দ = দিকদর্শক, হ = হাল, ন = নিয়ন্ত্রণ, বা = বায়ু, চ = চালনা ইত্যাদি। এ-ছাড়া আছে যুগ্ম ও যুক্তবর্ণের কিছু বোতাম যেমন—জ্ব জ্বালানি, বচা = বায়ুর চাপ··

বোতাম না টিপলেও ইচ্ছা রথটি আপনা থেকেই সব কিছুর ভারসাম্য রাখতে পারে। আমরা যে তাপ চাপ ইত্যাদিতে অভ্যস্ত রথটি ঠিক ঠিক তেমন রেখে যাবে—কখনো তাপ এনে চাপ কমিয়ে বাড়িয়ে অভিকর্ষ ঠিক রেখে। এরজন্য আরোহীকে অযথা চিন্তা করতে হবে না। তবে সব কাজই ইচ্ছাপূরণ যন্ত্রের মাধ্যমে করে রথটি।

তাছাড়া উচুঁতে যাওয়ার ও মেঘে কাজ করার জন্য পোষাকও তৈরী করা হয়েছে। এগুলো দেখতে সুন্দর এবং বেশ পুরু। পরতে পরতে তুলো চামড়া পালক পাতলা ধাতুর চাদর দিয়ে তৈরী এবং এতেও অনেক ফাঁপা নল আছে আর সেইগুলোতেও স্বতঃক্রিয় ভাল্‌ব লাগানো আছে, ভালব্‌গুলো রথের মতই তাপ, চাপ ইত্যাদি গ্রহণ বর্জন করতে পারে। আর আছে টুপি, পোষাকের মতো তৈরী করা, যদিও এখানে কিছু বাড়তি ব্যাপার আছে।

পোষাক টুপি সব তোচনদার মাথা থেকে বেরিয়েছে, আমরা তাকে সাহায্য করেছি মাত্র।

ডাইরি পড়লে মনে হবে—এ আর কি বেশি? কিন্তু যা গেছে আমাদের উপর দিয়ে, তা আমরাই শুধু জানি।

তোচনদার মধ্যে যেন একবার হতাশার ভাব লক্ষ্য করি, কিন্তু সেটা ছিল তাৎক্ষণিক। কিন্তু আমাদের অবস্থা হয়েছিল ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি যদি সত্যি ছেড়ে দেওয়া হতো! সে-কথা ভাবতেই পারি না। আজ তো আনন্দে মন ভরে উঠছে, চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, দেখো, ইচ্ছা রথ তৈরী হয়েছে, আমাদের সকলের গর্বের জিনিষ কাজ শেষ হলে তোচনদা একবার রথটাকে ঘুরে ঘুরে দেখে তারপর বলে, আগামী কাল ইচ্ছা রথের উড়াল পরীক্ষা হবে, পরীক্ষায় উত্তরে গেলে তারপর সটান যাওয়া ওখানে, ব'লে সে উপরের দিকে তর্জনী তোলে।

আমরাও লাফিয়ে উঠে বলি, হুর-রে···হো···

২০শে

কাল রাতে আমাদের পরীক্ষামূলক উড়ান ছিল।

রাতটা ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। তোচনদা ভেবেছিল,

"তোচনদা রঘুদাকে বুঝিয়ে দেয়, কখন কী করতে হবে

রঘুদাকে নিয়ে উড়বে প্রথমে। রঘুদা রাজিও হয়। কিন্তু উড়াল-পোষাক পরতেই রঘুদা উস্‌খুস করতে থাকে। কখনো বলে গরম লাগছে, কখনো বলে শীত করছে। তোচনদা পোষাকটা পরীক্ষা করে দেখে তখন, বে-কিছুই মনে হয় না। তাপ বাড়ালে ভালব্‌ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে বাড়তিটুকু, কমলে তাপ ঢুকে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় রাখছে পোষাক।

তাহলে? তোচনদা রঘুদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আকায়।

মানে, সুড়সুড়ি লাগছে...

বলতে হেসে উঠি আমরা। বুঝতে পারি, রঘুদা অস্বস্তি বোধ করছে ওড়ার ব্যাপারে।

অগত্যা আমাকে তৈরী হতে হলো। উড়াল পোষাক পরে আসতে তোচনদা সব দেখে নেয়—টিকঠাক আছে কিনা। এগিয়ে আমি রথের দিকে।

রথে ঢোকার আগে তোচনদা সাবধান করে দেয়, বিপদে বুঝলেই ল্যাব-খ বা বৈঠকখানা বা শোবার ঘরের বি-বোতাম টেপে যেন। ওটা টিপলেই সঙ্গে সঙ্গে সংকেত চলে যাবে রথে। তবে তোচনদা দূর-শাসন (রিমোট-কণ্ট্রোল) যন্ত্রটার উপর বেশি নজর রাখতে বলে। যদি কেউ ছিনিয়ে নেয় বা নিতে চায়, তবে রঘুদা যে-কোনো ভাবে যেন সেটাকে নষ্ট করে দেয়, নইলে বিপদ হবে রথের।

ওড়ার আগে আবার সব পরীক্ষা করে দেখে তোচনদা।

সব ঠিক আছে। তোচনদার মুখে হাসি, কিন্তু আমার বুক টিপ্‌টিপ্‌ করছে। রঘুদার কথায় হেসে-ছিলাম, কিন্তু এখন সত্যি ভয় লাগছে। তোচনদা টের পেয়েছে বোধহয়। আমার পিঠ চাপড়ে বলে, বি ব্রেভ্‌, পেছনে ফেরা চলে না আর, এখন -

রথের দিকে আঙুল তোলে, মার্ভে, এখন চলা শুধু চলা...

রথের সেই রেখায় পা দিতে দরজা খুলে গেল। একবার রঘুদার দিকে তাকাই, তোচনদাও। তারপর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে যায় নিঃশব্দে।

তোচনদা সব যন্ত্রের উপর একবার হাত বুলিয়ে দেখে, সব ঠিক আছে।

কলকাতার ম্যাপটা নিয়েছিস তো?

আমি তোমাকে কালই দিয়েছিলাম

কাল? একটু ভেবে বোতাম টেপে তোচনদা।

পর্দায় কলকাতার ম্যাপ ফুটে উঠতে তোচনদার টানটান ভাব সহজ হয়, ওকে... তারপর আর একবার রথের ভিতরটা দেখে তোচনদা তাকায় আমার দিকে, তাহলে ওড়া যাক্‌

তোচনদা কয়েকটা বোতাম টিপতে খুব মৃদু একটা শোঁ-শোঁ শব্দ হয় মাত্র।

তোচনদার মুখ জ্বল জ্বল করতে থাকে, বেশি উপরে তুলছি না, স্পীড ও বেশি দিচ্ছি না আপাতত, ব'লে বোতাম টেপে কয়েকটা, এবার দেখতে থাক্‌

ইচ্ছাপূরণ যন্ত্রের পাশে সর্বদর্শন যন্ত্রটা রাখা আছে। সর্বদর্শনের পর্দায় ভেসে উঠছে একে একে—ঘর বাড়ি, আধ-হওয়া সেকেণ্ড ব্রিজ, রেসকোর্স, ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়াল, গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট, পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজীর স্টাচু, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বালীব্রিজ, বেলুড়মঠ, গঙ্গা, নদীর উপর নৌকো স্টিমার, হাওড়া ব্রিজ, ফ্লাইওভার, রাইটার্স বিল্ডিং, রাজভবন, খেলার মাঠ, ফোর্ট উইলিয়াম...

এই পেঁছে গেছি আমরা যথাস্থানে—

তোচনদা আর একটা বোতাম টিপলে সামান্য শোঁ শব্দ হয়, তারপর শব্দটা থেমে যায়।

রথ থেকে নামতেই রঘুদা হৈ হৈ করে ছুটে আসে, আর আমি অবাক হয়ে দেখি, যে জায়গা থেকে আমরা উড়েছিলাম, ঠিক সেই জায়গায় নেমেছি।

রঘুদা, এনি নিউজ্‌?

তোচনদার উত্তরে রঘুদা এমন জোরে 'নো নিউজ' বলে যে আমাদের সঙ্গে সে-ও হেসে ওঠে খুব।

কষ্ট হচ্ছে না তো রে, তোচনদা আমায় জিজ্ঞেস করে।

না তো, জবাব দি।

ওড়ার সময়?

না তো, এতদূর যে ঘুরে এলাম, মনেই হচ্ছে না মোটে, দিব্বি লাগছে

তাহলে আমরা সাক্‌সেস্‌ফুল হয়েছি?

সিওর, হান্‌ড্রেড্‌ পারসেণ্ট

ঘরে এসে বসতেই রঘুদা চা-র কাপ বাড়িয়ে দেয় আমাদের সামনে, তাতে তোচনদা প্রায় লাফিয়ে ওঠে, গুড্‌ বয়, তুমি মন পড়লে কি করে গো?

ছোট থেকে একসঙ্গে মানুষ হলাম, আর এটুকু বুঝবো না?

তোচনদা এক চোট খুব হেসে ওঠে, কিন্তু রঘুদা তুমি কলকাতার উপর দিয়ে ওড়ার মজাটা জানতে পারলে না।

জানা তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না, ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকল।

ভেরি গুড, তোচনদা তারপর আমার দিকে তাকায়, বি রেডি, পরশু যদি ঝড় জল না হয়, কিউমুলাস মেঘ দেখি, তবে বুঝতেই পারছো বলে এক চুমুকে চা শেষ করে উঠে পড়ে, শুতে যাও, আমারও ঘুম পাচ্ছে, কাল রেস্ট ডে—

তোচনদা বেরিয়ে যেতে আমরাও যে যার ঘরে চলে যাই।

কাল রেস্ট ডে, সুতরাং দারুন ঘুম একটানা যত খুশি --

ছয়

তোচন আবার ভাবনায় পড়ে।

ইচ্ছারথের পরীক্ষামূলক উড়ান বেশ সাফল্যে শেষ হলেও এ ক-দিন একেবারে বেকার যাচ্ছে। আকাশে মেঘ, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপিয়ে।

ঝঞ্ঝা জলো মেঘ ছেয়ে আছে সারা আকাশ। আস্তর মেঘেরও আনাগোনার বিরাম নেই। দুটো মিলে মিশে ভাবনা বাড়িয়েই দিচ্ছে কেবল। প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ নির্মাণপর্ব শেষ করার জন্য মন উতলা হয়ে উঠছে। কাজটা ঠিকঠাক করতে পারলে তবেই সে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করবে—এ রকমই ঠিক করেছে।

কিন্তু হাতের কাছে এসেও যেন ফসকে যাচ্ছে। প্রকৃতি বিরূপ হতে পারে —এমন আশঙ্কা ছিল, কিন্তু পর পর কয়েকদিন এমন বাদলা থাকবে কে জানতো, আবহাওয়া দপ্তরও তেমন পূর্বাভাস দেয়নি মোটে। এর মধ্যেই সে এগিয়ে যেতে পারতো নির্মাণের কাজে, কিন্তু এই কাজলা জলো মেঘ ছাড়িয়ে যদি উপরের আকাশে পুঞ্জ মেঘ না পায়, তবে যাওয়াই সার হবে। তাছাড়া উপরের আকাশে নির্ভেজাল পুঞ্জ মেঘ পাবে না, সেখানে মিশ্র মেঘ পাওয়া যায় বেশি, বড় জোর সেখানে পাবে সিরো কিউমুলাস-সারিবদ্ধ ছোট ছোট পুঞ্জীকৃত মেঘ, তাতে কাজ হবে না খুব। এমন কী মধ্য আকাশেও এখন মিশ্র মেঘ পাওয়া যাবে —, ভাগ্য ভালো থাকলে পাবে লোমের মতো নরম— পুঞ্জ মেঘ --অল্টো কিউমুলাস, তাতেও কাজ হবে না।

তাহলে কি করা ?

তোচন ঘর ময় পায়চারি করতে থাকে। থামে, আবার শুরু করে। এইভাবে কতবার। কিছুতে স্থির হয়ে বসতে পারছে না।

কাজু আসছে যাচ্ছে। তোচন-কে দেখছে তেমনভাবে পায়চারি করতে। সে জানে, তোচনদা ভাবছে, এ সময় তাকে 'ডিস্টার্ব' করা ঠিক নয়। হয়ত তার মেজাজ চড়ে আছে বেশ, কিছু বললে হিতে বিপরীত হবে।

তাই কাজু নিঃশব্দে আসছে যাচ্ছে শুধু ভাবছে -- তোচনদার নজর পড়তে পারে তার উপর, তখন কিছু বলবে হয়ত। এইভাবে আসা যাওয়া করার সময় তোচন একবার তাকায় তার দিকে। কাজু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তবু টের পায়, তার দৃষ্টি কোথায় হারিয়ে গেছে যেন। কাজু অপেক্ষা করে তবু। কিন্তু তার আশা বিফল করে সে আবার পায়চারি শুরু করে।

কাজু ঘর ছেড়ে চলে আসে।

কাজু, হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতে তোচন খেয়াল করে, সে মিছিমিছি ডেকেছে কাজু কে। কাজু তো এই অপেক্ষা-তেই ছিল, তার ক্ষীণ ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে ঘরে।

ডাকছিলে ?

না তো ! তোচন কাজুর কথায় থতমত খায়, তারপর আবার পায়চারি শুরু করে দেয়।

কাজু বুঝতে পারে, প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু করতে পারছে না বলে তোচনদা অস্থির হয়ে উঠছে। কিন্তু এত অস্থির হওয়া কি উচিত ? অস্থির হলে কি চলে ?

তোচনদা, মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় কাজুর।

তোচন কেমন বিহ্বল ভাবে তাকায় কাজুর দিকে।

তোচনদা. তার সম্বিৎ ফিরিয়ে আনার জন্য একটু জোরেই ডাকে।

কি রে ? ম্লান হাসে তোচন।

এতো ভাবনার কী আছে ?

সত্যি ! ভাবনার কী আছে ? তোচনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, সে তাকায় কাজুর দিকে, কিন্তু তীরের কাছে এসে তরী ডুবে যাওয়ার জো হলে কি করা যায় ?

এতোটা ভেবো না ?

ভাবছি, বলে একটু থামে তোচন, ইচ্ছারথ তৈরী করতে ক-দিন বাড়তি লাগল আমাদের, ওটা হলো তো প্রকৃতি এখন বাধ সাধছে, তোচন আবার পায়চারি শুরু করে, তারপর হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করে, প্রকৃতি কি চাইছে না আমরা মেঘের কোলে ঘড় বাড়ি বানাই ?

কি বলছো তুমি তোচনদা ? কাজুর চোখ বড় বড়

হয়ে ওঠে তোচনের কথা শুনে, এ কি তোমার কথা, নাকি একজন পরাজিত অশিক্ষিত অজ্ঞের কথা ? আমি ভাবতেও পারছি না, তুমি কি করে একথা বললে, ভাবলে ? কুসংস্কারগ্রস্ত লোকের মতো তুমি...আমায় ক্ষমা করো এ সব। তোচন ম্লান হাসে, তুই ঠিক বলেছিস, তারপর সে নিজের আস্থা ফিরে পেলে যেমন দৃঢ় হয়, তেমন ভাবে বলে ওঠে, দুশ্চিন্তা আমাকে সংস্কারের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো, তুই ঠিক করেছিস্, তাহলে আমি···

দ্রুত পায়চারি করে থামে তোচন, দিনটা যদি পরিষ্কার হতো, তবে...

নিশ্চয় হবে

তোচন খেপে ওঠে এবার, হবে একদিন তা আমি জানি, তোকে সেটা বলতে হবে না,

সম্পৎলালদের ফেউগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে,

কাজু তোচনকে একবার দেখে দৃষ্টি নত করে।

তোচন আবার কিছু বলবে এমন সময় রঘু ঘরে ঢোকে। একটা চিঠি বাড়িয়ে দেয় তোচনের দিকে। তোচন তাকায় কাজুর দিকে।

কাজু খাম থেকে চিঠিটা বের করে।

আমি এইটাই আশা করছিলাম

আশা, না, আকাঙ্ক্ষা ?

তোচনদা হেসে ফেলে, ঐ একই হলো, পড়্ দেখি কি লিখেছে ?

কাজু পড়ে—

প্রিয় বিজ্ঞানী তোচন, প্রথমেই অভিনন্দন গ্রহন করুন। এতদিনে রাগ নিশ্চয় পড়ে গেছে। উড়ান তো সফল হয়েছে, নির্মাণও সফল হবে—আশা করি। তারপর কি করবেন ? প্রকল্পটা জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে নিশ্চয়। আপনি তাদের জন্যই তো ভাবেন

তাই আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চাইছি। বিজ্ঞান-কে জনপ্রিয় করার জন্য, বিজ্ঞানের ফসল সাধারণের মধ্যে পেঁাছে ও ছড়িয়ে দেবার জন্য আমরা এক বৈজ্ঞানিক সংস্থা গঠন করেছি, তাতে বিজ্ঞানীরাই যোগ দেবেন এবং বিজ্ঞান উৎসাহীরা।

আপনাদের শুভেচ্ছায় ইতিমধ্যে এই সংস্থায় এসে পড়েছেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আরোহণ শর্মা, এস.আর.কে.ভি. মেনন, জে.ডি. শেষাদ্রি, টি.এন ঘোশী, টি.এন. সিং. বি. মজুমদার। বিশ্ববিখ্যাত আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ এল নিলসন্ যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন। আশা করি, আপনি আপনার মেধা প্রতিভা নিয়ে আমাদের সংস্থাকে ধন্য করবেন

আমরা বিজ্ঞানীদের সাম্মানিক দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যতদূর সম্ভব, আমরা আপনাকে বাৎসরিক যৎসামান্য সম্মান দিতে পারবো।—বিশেষ সংকোচে বলছি তার পরিমান হবে দুলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। এ ছাড়া আপনার বাসস্থান, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও অন্যান্য দৈনন্দিন খরচ সংস্থাই বহন করবে। খুবই সামান্য এ সব, আপনার মতো বিজ্ঞানীর পক্ষে, তবু আপনাকে সম্মানিত করতে পারছি ভেবে গর্ব বোধ করছি।

বিজ্ঞানী আরোহণ শর্মা যাবেন আপনার কাছে। চিঠির উত্তর না দিলেও চলবে। আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি। ইতি বিনীত সম্পৎলাল

পুঃ আপনার সহকারীদেরও যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে আমাদের সংস্থায়।

পড়া শেষ হতেই তোচন হেসে গড়িয়ে পড়ে যেন।

এতে হাসির কী আছে, বুঝতে না পেরে কাজু তাকায় রঘুর দিকে। রঘুও ধরতে পারে না তা, তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কাজুর দিকে।

এক লাফে তলা থেকে ডগায়, ভাবতে পারছিস ?

তাই তো, কাজুকে ভাবিত দেখায়

আমার পেছনে খরচ করবে লাখ লাখ টাকা, কী মজা ! তোচন হাসতেই থাকে

কাজু ও রঘু অবাক হয়ে যায় তোচনের আচরণে

তোচন হঠাৎ গম্ভীর হয়, কেন খরচ করছে জানিস ? আমাদের প্রোজেক্ট

প্রোজেক্ট ?

হাঁ, সাক্সেসফুল হলে কী হবে ভাবতে পারিস ? সম্পৎলাল তো কোন্ ছার, পৃথিবীর তাবড় তাবড় মাল্টি ন্যাশনাল দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দেবে আমাদের কাছে। মেঘের কোলে ঘরবাড়ি বানাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে, ফাটকাবাজি চলবে কতদিন

তাহলে তো আমাদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে !

নিশ্চয়, এদের হাতে গেলে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। অথচ এরা ছাড়বে না, কব্জা করতে চেষ্টা করবেই, আর মুখে জনসেবার দোহাই দিচ্ছে। ওদের তো প্রচণ্ড শক্তি, দাপট, আমরা কি এঁটে উঠতে পারবো ওদের সঙ্গে ?

কাজু প্রশ্নটা করেই আবার বলে ওঠে, একা কি পারবো

সামলাতে আমরা ?

সেটাই তো মস্ত কথা, তোচন ভাবে, গভর্মেণ্ট অনুমোদন করলে আমাদের বোঝা কিছু লাঘব হতো, কিন্তু , দীর্ঘশ্বাস পড়ে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, মানুষ যদি সঙ্গে থাকে, তাদের যদি আমরা সঙ্গে নিতে পারি, তবে কাউকে কেয়ার করি না, করবো না— আমরা —

তখন ফোন বেজে ওঠে।

হ্যালো কে ?···ধরুন দিচ্ছি, তোচন রিসিভার নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে, কে ?

আরোহণ···

ততক্ষণে তোচন টেলিফোনে বলছে, হ্যালো হাঁ, কেমন আছেন · আচ্ছা...ভালোই আছি, আপনি তো সব খবর পাচ্ছেন···হাঁ, বলুন

তোচন শুনতে থাকে, হুঁ-হাঁ কিছুই করে না

তারপর কিছুক্ষণ চুপ থাকে, হাঁ নিশ্চয় আসবেন, অলওয়েস্ ওয়েলকাম, দেখবেন তো বটেই, আচ্ছা...রাখছি তবে···

ফোন ছেড়ে বাঁচে যেন হাফ ছেড়ে তোচন, বাব্বা

রঘু ও কাজু একসঙ্গে বলে ওঠে, কি হলো ?

কি আবার হবে, আমড়াগাছি করলো খানিক

আচ্ছা

সব্বোনাশ ঘনিয়ে আসছে আর কী

কিন্তু তোমার হাবভাব দেখে তো তেমন মনে হচ্ছে না ?

মুখ গোমড়া করে বসে থাকবো, তবে ?

তা নয়

তোচন মিটিমিটি হাসে, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবো না হয়ত, কিন্তু কিছু নাকানি চোবানি খাওয়াতে পারবো নিশ্চয়, কি বলো রঘুদা ?

রঘু ঢোক গেলে, তা আর পারবোনা কেন ? কামড়াতে না পারি, ফোঁস তো করতে পারি

দিব্বি বললে ভায়া, হিম্মৎ হেরো না, আমরা আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবোই, কারুর থেটে গ্রাহ্য করবো না

নিশ্চয়, কাজু তেজে বলে ওঠে, আমরা এগিয়ে যাবো, এতদূর এসে আমরা আর ফিরতে পারি না কিছুতেই

তাহ'লে আমরা যাবো মেঘে, তোচন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, প্রথমে পরীক্ষামূলক ভাবে বানাবো ছোট্ট একটা ঘর — এস্কিমোদের ইগলুর মতো, তারপর —

বলতে বলতে থেমে পড়ে হঠাৎ। ছুটে যায় জানলার ধারে, কে যেন সরে গেলো জানলার পাশ দিয়ে —

কে ? কে ?

তিনজনে বেরিয়ে আসে বাইরে সেই মুহূর্তে।

আমি পেছনটা দেখছি, তোরা সামনে আর রাস্তার পাশগুলো দেখ,

তোচন বাড়ির পেছন দিকে চলে যায়।

কাজু ও রঘু সামনের আনাচ-কানাচ তল্লাশ করে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। কোথাও কাউকে দেখতে পায় না।

বৃষ্টি এখন নেই, তবু আকাশে মেঘের ঘন ঘটা। মাটি ভিজে সপ্‌সপ্ করছে, পা বসে যাচ্ছে। অথচ কাজু অগন্তুকের পায়ের চিহ্ন দেখতে পায় না, জিজ্ঞেস করে রঘুকে, তুমি কি কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছো ?

রঘু এবার তীক্ষ্ণভাবে দেখতে থাকে, এই তো একটা

কাজু দৌড়ে আসে, রঘু নির্দেশিত জায়গায় ঝুঁকে পড়ে, ধ্যেৎ, এইটা তো আমাদের জুতোর ছাপ, দেখো ঠিক করে

আমাদের ?

জুতোর তলটা দেখো, আর ছাপটা মেলাও—

রঘুদা দেখে মিলিয়ে, তাই তো, আমাদের জুতোরই

নো প্রোবলেম, এসো দেখি, তোচনদা কিছু পেলো কিনা ওদিকে, তার সাড়া শব্দ তো পাচ্ছি না ব্রাদার—

কাজু ও রঘু দ্রুত বাড়ির পেছন দিকে যায়।

তোচন নুয়ে নুয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি জমি পরীক্ষা করে চলেছে তখনও।

ওদের দেখে মুখ তোলে তোচন, পেলি কিছু ?

নাহ্ —

ব্যাপারটা, তোচন একটু অবাক হয়ে তাকায় তখন, এলো, দৌড় লাগালো, অথচ মাটিতে পায়ের বা জুতোর কোনো ছাপ পড়লো না, আশ্চর্য !

তুমি সত্যি সত্যি দেখেছিলে, নাকি চোখের ভুল ?

এত বড় ভুল হবে ? তোচন মনে মনে বলে যেন, হতেও পারে, একটা চিহ্নও যখন রেখে যায় নি, তখন কি —

কথার মধ্যেই কাজু বলে ওঠে, হেঁটে বা দৌড়ে না এলে আসবে কি করে ? হেঁটে এলে বা দৌড়ে গেলে ভিজে মাটিতে ছাপ পড়তোই পড়তো

কারেক্ট, মুহূর্তে তোচন উছলে ওঠে, লোকটা হেঁটেও আসে নি, দৌড়েও নয় —

তবে ? রঘু ও কাজু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে

রণ পা বা তেমন কিছুর উপর ভর দিয়ে আসতে পারে, তাই তো, তোচন এদিক ওদিক খোঁজে কি যেন, এই তো একটা গর্ত, আর তোচন প্রায় দশ ফুট দূরে একটা তেমন গর্ত দেখায়, মনে হচ্ছে কিছুর উপর ভর দিয়ে এসেছিলেন –

এই কলকাতায় ? রণ পা ? অবাক হচ্ছে কাজু

হতে দোষ কি, তোচন হাসে, কলকাতায় কত কিছু হয়, একেবারে মডার্ন থেকে আদিম কালের ব্যাপার, এটা তো সামান্য ব্যাপার, এখন চ, দেখি কিছু খোয়া গেছে কিনা আবার

তিনজনে ফিরে বৈঠকখানায়, পরে যায় ল্যাব গ – এ

বুঝলি, দূর শাসন (রিমোট কণ্ট্রোল) যন্ত্রটার পাল্লা ও শক্তি--দুটোই বাড়াতে হবে, আর বানাতে হবে শনাক্ত যন্ত্র, তাহলে কেউ আর পালিয়ে পার পাবে না। শত্রুতা যখন শুরু করেছে, তখন সহজে ছাড়বে না। আমাদের ভয় দেখিয়ে কব্জা করার প্ল্যানও ওরা আঁটছে মনে হয়।

এতই যখন ঝামেলা, তখন মিটিয়ে ফেললেই হয়, রঘু হট করে প্রস্তাব রাখে।

তোচন রঘুর দিকে তাকায়, কোথায় তুমি ভরসা দেবে রঘুদা, তা নয় তুমি ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলছো। তুমি বুঝতে পারছো না, ওদের খপ্পরে পড়লে কি হাল হবে আমাদের ? ওরা আমাদের ছিবড়ে করেই ছাড়বে না, একেবারে গিলে খাবে আস্ত। এতদিন আমরা যা বজায় রাখতে পেরেছি, নিমেষে তা হাওয়া হয়ে যাবে

রঘু দৃষ্টি নত করে, ঠিক বলেছো

জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়া যায় না, কিন্তু আগেই হার মেনে নেবো কেন ? শেষ অব্দি দেখতে ক্ষতি কি ?

তারপর তারা চলে আসে ল্যাব খ-এ। এইভাবে ঘুরে ঘুরে দেখে সব ল্যাবরেটারি।

নাহ্, কিছু খোয়া যায় নি

নিশ্চিন্ত হয়ে যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে আসে।

তোচন দূর-শাসনকে আরো সুগ্রাহী, শক্তি সম্পন্ন করায় মন দেয়, আর জানলা দিয়ে তাকায় আকাশের দিকে। তার মুখ দিয়ে স্ফুট হয়ে যায়—হে আকাশ, কবে সরে যাবে তোমার কালো যবনিকা—

স্ফুট হতেই মনে হয় কলকাতা বা তার আশপাশের আকাশ জলো কাজলা মেঘে ভরা, কিন্তু তার পরের আকাশ, কলকাতা পেরিয়ে আকাশ বিহার উত্তরপ্রদেশ কাবুল কান্দাহার পেরিয়ে আকাশের ওপারে যে আকাশ আছে, সেখানেও কি পাওয়া যাবে না আমাদের ঈপ্সিত আকাশ—ধপধপে ফটফটে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘের আকাশ – ?

লাফ দিয়ে ওঠে তোচন।

মিছিমিছি এতদিন নষ্ট করলাম, ছি-ছি, সাধারণ কথাটাই মনে হয় নি আমার, কলকাতার আকাশ দেখেই কাটিয়ে দিচ্ছিলাম সময়, এই আমাকে সকলে বিরাট বিজ্ঞানী বলে জানে ?

মরমে মরে যেতে থাকে তোচন। কিন্তু নিজেকে দুষলেই চলে না, কাজ করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে।

সে সর্বদর্শন যন্ত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

মুহূর্ত কয় ভাবে, তারপর কৃ উ ১ পরপর বোতাম টেপে। টেলিভিশনের পর্দার মতো সর্বদর্শনের পর্দা প্রথমে ঝিরঝির করতে থাকে, ক্রমে ঝিরঝিরানি কমে আলো সমান উজ্জ্বলভাবে ছড়িয়ে পড়ে পর্দায়। তোচন খুশি হয় তা দেখে, আলোকিত পর্দা এখন স্থির হয়ে আছে আলোয়, তার মানে কৃত্রিম উপগ্রহ ১-এর সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে।

এরপর টেপে পৃ বোতাম, পর্দায় ফুটে ওঠে পৃথিবীর মানচিত্র – স্পষ্ট। এরপর টেপে জ ও ব অর্থাৎ জল বাড়ুর বোতাম, মুহূর্তে দেখা দেয় আবহাওয়ার ছবি, কোথায় বৃষ্টি, কোথায় নেই, কোথায় কোন্ মেঘ

এই তো এই তো পুঞ্জ মেঘ

তোচন তাড়াতাড়ি লিখে নেয়, কোথায় কত ডিগ্রি উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ—এ দেখা যাচ্ছে ঐ মেঘ—পুঞ্জ পুঞ্জ—

তারপর ছুটে হাজির হয় কাজুর ঘরে

কাজু কাজু, রঘুদা রঘুদা

কি, কি হয়েছে তোচনদা ?

এতদিন মিছিমিছি সময় নষ্ট করেছি, ছি-ছি, কাল, কাল রাতেই আমরা পাড়ি দেবো—আর দেরী নয়, শুধু যাওয়ার আগে আর একবার দেখে নেবো – কোথায় আছে আমাদের সেই মেঘ পুঞ্জ মেঘ সাদা ধপধপে ফটফটে—

হাঁফাতে থাকে তোচনদা, তোরা তৈরী থাকিস, কাল, কাল রাতে—

বলেই বেরিয়ে যায় তোচন

আর কাজু হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার যাওয়ার দিকে।

মেঘ কেটে গেছে। আকাশ রোদে ভাসছে।

নীল, ঘন নীল আকাশ। নীলের মধ্যে এ ধারে ওধারে নীচে মধ্যে উপরে অনেক পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ঝকঝক করছে। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে হয়ে আরো জ্বলজ্বলে করে তুলছে।

তোচন কাজু রঘু লাফিয়ে উঠছে আনন্দে।

আহ্! কী দারুণ ব্যাপার, তিনজনের মন মেঘের সঙ্গী হয়ে উঠছে যেন; ওখানে যেতে হবে, ঐ মেঘের কোলে, ও মেঘ তুমি অমনই থাকো

তাদের পুলক পড়ছে না পুঞ্জ মেঘ দেখে দেখে।

আহ্, ভাবতেও পারছি না, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন শেষে, দারুন খুশিতে ভরপুর রঘুর মুখ দিয়ে স্বতই বেরিয়ে পড়ে, তিনি দিলেন বলেই—

তোচন এতক্ষণ বুঁদ হয়ে গিয়েছিলো মেঘের মধ্যে। রঘুর কথা শুনে যেন সম্বিৎ ফিরে পায়, কি বললে গো তুমি, রঘুদা? স্নেহমাখা সেই স্বর খুব, তুমি কি জানো না মেঘ কি ভাবে হয়? ভেজা বাতাস হালকা বলে উপরে উঠে যায়, উপরে চাপ কম, তাই তার আয়তন বেড়ে যায়, ফলে তার উচ্চতা কমে। আর উপরের বাতাসের স্তর তো তুলনামূলক ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে ভেজা বাতাস এলে তার উষ্ণতা শিশিরাঙ্কের নীচে নেমে এলে বাষ্প বাতাসে থাকা ধুলোর কণা, তড়িতাহিত কণা ইত্যাদি আশ্রয় করে ঘনীভূত হয়। ঘনী ভবনের ফলে বিন্দুবিন্দু জল কণা তৈরী হয়, বাতাসে ভাসতে থাকা এই জলকণা-গুলোই হচ্ছে মেঘ। ল্যাবে যে মেঘ তৈরী হলো, তার কথা বেমালুম ভুলে গেলে? সেটাও কি ভগবানের দান নাকি?

রঘু লজ্জা পায় খুব, ওটা হচ্ছে কথার কথা, সংস্কার

আহা লজ্জা পাচ্ছো কেন? আমরাও তো অনেক সময় ওরকম বলে থাকি, এখন তোমার কথার সূত্রে একটু মাস্টারি ফলালাম, বুঝলে? তোচন সহজ হয়ে রঘুর সংকোচ কাটাতে চেষ্টা করে।

কাজু প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চায়, তাই বলে, তবে কি আজ-ই…

সিওর, আজই, শুভস্য শীঘ্রম্, ঝড়জল যাই আসুক, আমরা রওনা হবোই, কলকাতার আকাশ না পেলে, আশ—পাশের আকাশ, তা না পেলে যেখানে পাবো সেখানেই চলে যাবো আমরা।

আচ্ছা তোচনদা, বলতে গিয়ে থেমে পড়ে কাজু।

তোচন উৎসুক হয়ে তাকায় কাজুর দিকে, সে থেমে গেলে বলে, বল, থেমে গেলি কেন?

আমি ভাবছি, আবার থামে কাজু, আমাদের হাতে যখন সর্বদর্শন যন্ত্র আছে, তাহলে সম্পৎ বা আরোহণরা কী করছে তা জেনে নিচ্ছি না কেন?

তোচন হেসে ওঠে, যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না

কাজু তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে

ওরে বাবা, সব জিনিষের ক্ষমতার তো একটা সীমা আছে,

এক একটা যন্ত্র এক একটা উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে, আর বানানোর সময় কিংবা নকশা আঁকার সময় সব কথা মনেও পড়ে না, যেমন ধর ইচ্ছাপূরণ যন্ত্র, আমাদের সব ইচ্ছাই কি পূরণ করতে পারবে সেটা? মানুষের ইচ্ছার অন্ত নেই, তবে, একটু থামে তোচন, যন্ত্রগুলোর পরিধি ও শক্তি নিশ্চয় বাড়াতে হবে, কাজ করতে গিয়ে আমরা যে সব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি, সেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আবার কাজ করতে হবে, কি করে ইম্প্রুভ করা যায়, তা আমাদের খেয়ালে রাখতেই হবে, তবে—

তোচনের দৃষ্টি আবার দূরে চলে যায়, আবার ফিরে এলে সে হাসে, তবে আজ বেশ সাবধানে থাকতে হবে

কেন? রঘু জিজ্ঞেস করে

আজ আমরা বের হচ্ছি, ওরা টের পাবে নির্ঘাৎ

তাহ'লে আমি থেকে যাই, রঘুদা বরং যাক্ তোমার সঙ্গে আজ —

কাজুর প্রস্তাব শুনেই রঘু-র মুখ শুকিয়ে যায়

কি রঘুদা, তোচনদা ঠাট্টার সুরে বলে, আজ তুমি-ই চলো না হয়?

রঘু এধার ওধার বিহ্বলের মতো তাকাতে থাকে, আমি গেলে রান্না করবে কে শুনি?

থাক্ থাক্, রঘুদা নীচেই থাক্ তোচন হেসে ওঠে খুব

তোচনের আশ্বাস শুনে রঘুর ধড়ে প্রাণ আসে যেন, সে খামকা হাসতে থাকে

রঘুদা, একটু চোখ কান খোলা রেখো, সামান্য বিপদ বা বিপদের সম্ভাবনা বুঝলেই জ বোতামটা টিপে দেবে, যেখানেই যত উপরেই থাকি না কেন সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে যাবো, আর এসে পড়তে কতটুকু সময়ই বা লাগবে, ততক্ষণ নিশ্চয় ম্যানেজ করতে পারবে

রঘুদা বাধ্য ছেলের মতো শোনে, তবু তার চোখ মুখ থেকে ভয়ের ছাপ মুছে যায় না। সে হাসার চেষ্টা করে,

তাতে ভয়ের ছাপটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন

ঘাবড়াবার কিছু নেই, তোচন তাকে আশ্বস্ত করতে থাকে, বিপদ আসবে বা হবেই—এমন কথা নেই, আমি খারাপটা ভেবে সাবধান করে দিচ্ছি মাত্র। তোচন একটু থামে, আমাদেরও কি ভয় নেই, বরং আমরাই বিপদে পড়বো আগে, নীচে থেকে আক্রমণও করতে পারে, রথ ধ্বংস করে দিতে পারে

তবু তুমি, রঘু বলতে গিয়ে থামে, ঢোক গেলে

নেওয়া হবে, সেটা তুমি চাও

না—না, রঘু এবার বেশ দৃপ্ত স্বরে বলে ওঠে

ব্রেভো, এই তো চাই রঘুদা, হ্যাঁ আমরা যাবোই

কাজুর ডাইরি

ওরা

দিনের মতো রাতের আকাশও বেশ পরিষ্কার।

অন্ধকার রাত। আমাদের অভিযানের পক্ষে সুবিধের। তোচনদা ইচ্ছারথের কলকব্জা সব পরীক্ষা করে নেয়। মেঘের কোলে ঘর বাড়ি বানানোর জন্য ইচ্ছাপূরণ যন্ত্রে বাড়তি কয়েকটা বোতাম লাগানো হয়েছে রাজমিস্ত্রির কর্ণিক ওলনদাড়ি ইত্যাদি যে সব কাজ করে, সেই সব কাজ করার জন্য, এ ছাড়া আছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ জেল্, লাল সলিউশন স্প্রে করার বোতাম এবং অন্যান্য বোতাম

সব বোতামের কাজ ঠিক ঠাক হচ্ছে কিনা, তা রথের সবুজ আলো নিষ্কম্প থাকায় স্পষ্ট বোঝা গেল, যদি ঠিক কাজ না করতো তবে ঐ আলোয় কম্পন দেখা দিতো। তারপর সব ঘরে গিয়েও তোচনদা বোতামগুলো পরীক্ষা করে দেখে। বোতাম দেখার পর তোচনদা রঘুদাকে আবার বুঝিয়ে দেয়, কখন কী করতে হবে কী করলে কী হবে এই সব।

আবহাওয়া চমৎকার। কোথাও এতটুকু জলো ঝঞ্ঝা মেঘ নেই। এমন কি বাতাসও তেমন ঠাণ্ডা নয়, আরামদায়ক।

রাত নিস্তব্ধ। কলকাতা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসছে। রাত বাড়ছে। উড়াল-পোষাক পরে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবো, তখন টেলিফোন বেজে ওঠে।

রঘুদা টেলিফোন ধরে, তারপর তোচনদাকে ইশারায় ফোনে আসতে বলে। তোচনদার মুখে হাসি ফোটে, সে বোধ হয় আশাই করছিলো একটা ফোন বা অন্য কিছু। তোচনদা গিয়ে ফোন ধরে, হাঁ বলুন...জানেন দেখছি ..হাঁ আমরা তৈরী, কি করে ফাঁকি দেবো আপনাদের চোখ বলুন না...

ও-প্রান্ত থেকে কী বলা হচ্ছে, তা তোচনদার উত্তর থেকে আন্দাজ করতে পারছি।

হাঁ হাঁ,.. এটা বুঝবেন তো এখুনি চুক্তি করা ঠিক হবে না, কত কী হতে পারে, আমরা ফিরে না আসতে পারি, রথ ভেঙে যেতে পারে, কত কি হতে পারে কাজটা শেষ করে আসি, ওখানে গেলে তো বুঝতো পারবো প্রকল্পটা, ঠিক ঠাক করা যাবে কিনা...হাঁ হ্যাঁ ফিরে আসি আগে ..

...হাঁ হাঁ, . মরদ কা বাত ..

ফোন ছেড়ে দিয়ে তোচনদা তার সদাহাস্য দৃষ্টি নিয়ে তাকায় আমাদের দিকে, ঠিক যা ভেবেছিলাম, অ্যা থ্রেটের ভঙ্গিতে নয়, রিকোয়েস্ট, আর ওদের রিকোয়েস্ট মানেই তো ,বললাম ফিরে আসি, তারপর সই করবো, একটু তঞ্চকতা করতে হবে নিশ্চয়, যাইহোক আবার রঘুদার দিকে তাকায় তোচনদা, ভয় পেও না প্লিজ, নাথিং সিরিয়াস, এ-সব তো একটু আধটু হবেই।

কিন্তু ফোন যে করল, সে তো সম্পৎলালের লোক নয়, কি যেন একটা নাম বলল কোম্পানীর, রঘুদা মনে করতে চেষ্টা করে।

ইণ্টার স্পেস্ কনটিনেনটাল ?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাহ'লে? রঘুদা বিমূঢ় হয়ে তাকায় তোচনদার দিকে।

হোক না ইণ্টার স্পেস, নামে কি আসে যায় গোলাপ কে যে নামেই ডাকো না কেন, এ-ও তেমন, সম্পৎলালদের যে নামেই ডাকো তারা তাই থাকবে আর এদের সহযোগী হয়েছে আরোহণ শর্মারা, নানা ভাবে আমাদের কব্জা করতে চায়, তা চাইবেই, ওটাই ওদের ধর্ম, আর আমাদের ধর্ম

তোচনদা রথের দিকে যাবার ইশারা করে তখন।

আমরা আস্তে আস্তে রথের দিকে এগিয়ে আসি। তারপর রথের মধ্যে ঢোকার আগে চারপাশ দেখে নি, রঘুদাকে কেমন করুণ দেখাচ্ছে, আমি হেসে তাকে চাঙা করতে চেষ্টা করি, তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ঢুকে পড়ি।

তোচনদা ইচ্ছাপূরণ যন্ত্রের বোতাম টেপার আগে, যে মেঘখণ্ড আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে থাকে, দিক দর্শকের কাঁটা সেই দিকে ঘুরিয়ে ঠিক করে, তারপর রথের মধ্যে চারপাশ একবার দেখে, সব বোতাম যন্ত্র নল ইত্যাদিতে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে একেবারে নিথর হয়ে থাকে, একদম চুপচাপ।

মুহূর্ত কয় পরে আমার দিকে তাকিয়ে সম্মতি নেয়,

এবার চালাই তবে ?

বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা অতি মৃদু গুঞ্জন কানের কাছে হলে টের পাই রথ পৃথিবী ছেড়ে চলতে শুরু করেছে।

দেখার কিছুই নেই। মাথার টুপিতে আয়না বসানো আছে, তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে অন্ধকার শুধু, আর মধ্যে মধ্যে তারার দল।

তোচনদা ইচ্ছাপূরণ, সর্বদর্শনের পর্দায় চোখ বিঁদিয়ে রেখেছে। তার উড়াল টুপি-র সঙ্গে কান, মুখের সংযোগ আছে আমার মতো, কেবল বুকের মধ্যে কোনো সংযোগী তার আমার নেই, তোচনদার সেই তার আবার ঘুরে যুক্ত হয়েছে ইচ্ছাপূরণ যন্ত্রের সঙ্গে।

চলছে, না, থেমে আছে টের পাই না কিছু। প্লেনেও চলা টের পাওয়া যায় না, একটা গোঁ-গোঁ শব্দে তবু বোঝা যায় কিছু চলছে। কিন্তু ইচ্ছা রথের ঐ শোঁ শব্দটা থেমে গেছে, আর বাইরে ঘোর অন্ধকার—দেখার কিছু নেই। করার কিছু নেই, সব চুপচাপ।

তখন তোচনদা অনেকগুলো বোতাম টেপে দ্রুতগতি।

রথটা কাঁপছে এবার। একটা যেন শব্দ হলো!

তাকাই তোচনদার দিকে।

রথটা কাঁপছেই, আর একটা শব্দ হয়, তারপর আরো।

তবে কি ? আমার মুখ শুকিয়ে গেছে, তোচনদা আরো কয়েকটা বোতাম টেপে। রথ কাঁপছেই।

তোচনদা ! ভয়ে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় আর্ততা।

তোচনদা আরও দু-টো বোতাম টিপে আমার দিকে তাকায়, ভয় পেয়ে গেলি ?

আমি আর কি বলবো, চুপ করে থাকি, বুক কাঁপছে ভয়ে নিশ্চয়।

কোনো ভয় নেই ব্রাদার, মেঘে কাজ শুরু হয়েছে, তাই একটু কাঁপছিলো···

নাকি ?

এই দেখ্, বলে তোচনদা আর একটা বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদর্শনের পর্দা জ্বল জ্বল করে ওঠে আলোয়, আর দেখতে পাই

পুঞ্জমেঘের তলাটা সমান হয়ে যাচ্ছে, তারপরে পাশের মেঘ এবং তল থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে মেঘ সমান ভাবে কাটা হয়ে গেল মসৃণ ভাবে, বেশ পুরু লম্বা চওড়া একটা চাঁই।

পর্দার উপর যা দেখা যাচ্ছে তোচনদা ছোট্ট একটা ধাতব ছড়ি দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলে চলে—এটা হচ্ছে ভিত, এই অংশটা আট ফুট পুরু আট বাই দশ লম্বায় চওড়ায়। এবার বাড়ি তৈরী হবে, এই যে কাটা কাটা মেঘ দেখছি, এখান থেকে যে মেঘগুলো কাটা হয়েছে, সেই মেঘ দিয়ে বানানো হবে, তবে বিরাট ঘর বা বাড়ি নয়, বুঝতেই পারছিস—এটা পরীক্ষামূলক কাজ, আমি ইগলুর মতো ধাঁচের নকশা এতে পুরে দিয়েছিলাম,

বলে তোচনদা ইচ্ছাপূরণ যন্ত্রটা দেখায়, এখন দেখা যাক্, আমাদের খাটুনিটা মাঠে মারা গেল, না সত্যি কাজে এলো।

তোচনদা কয়েকটা বোতাম টেপে এবার।

রথটা আগের মতো কেঁপে ওঠে। একটু বেশিই কাঁপে যেন। এবার আমার ভয় করে না, তবু তোচনদা তার অভয়দান হাসিতে মুখ ভরিয়ে আমার দিকে তাকায়।

ভয় নেই, কাজ শুরু হয়ে গেছে—

দেখতে পাচ্ছি—

ভিতরে উপরে এ-পাশ ওপাশ থেকে মেঘের পুঞ্জ আস্তে আস্তে এরোপ্লেন রাখার হ্যাঙ্গার-এর মতো একটা ধাঁচা তৈরী করছে, ভিতের সঙ্গে অর্ধ বৃত্তাকার, সামনে পিছনে এখনো ফাঁকা

তোচনদা আর একটা বোতাম টেপে।

পিছনের দিকে ফাঁকা জায়গাটা ভরাট হয়ে যাচ্ছে, এখন তিন দিক ঘেরা হয়ে গেল ফটফটে সাদা মেঘে।

তোচনদা এবার আমার দিকে তাকিয়ে আর একটা বোতাম টেপে।

দেখি—সামনের দিকটা একটা মানুষ হাঁটু গেড়ে ঢুকতে পারে তেমন জায়গা বাদ দিয়ে আস্তে আস্তে স্তরে স্তরে ভরাট হয়ে যেতে থাকে।

তোচনদা আবার বোতাম টেপে, একটা হিস্ হিস্ শব্দ হয়, তারপর থেমে যায় সঙ্গে সঙ্গে

এবার পুরো 'সলিড' হয়ে গেছে, আর ভয় নেই, ঝড় জল যাই আসুক আকাশ ভেঙে পড়ুক, তবু এটার কিছু হবে না

মানে, বিশ্বাস করতে মন চাইছে না যেন।

এই দেখ, হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারছি এবং চাপ দিচ্ছি, বলে তোচন আবার বোতাম টেপে।

কিছু হলো কি ধাঁচাটার ?

অবাক হওয়াও যেন হার মানে, আমি বোকার মতো

চেয়ে থাকি তোচনদার দিকে।

আমরা পুরো সাকসেসফুল, আর ভয় নেই।

সমস্ত কাঠামোটা সলিড হয়ে গেলো, তবে তো এটা নীচে নেমে যাবে এখুনি !

তোচনদা একটু চুপ থাকে, তারপর বলে, পাখি যেমন আকাশে ভাসে, এটাও তেমন ভাসবে। একজন সুইস বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বারনৌলি দেখলেন যে বাতাস যদি খুব জোরে বয়ে যায় তবে তার চাপ কমে। পাখি যখন আকাশে ওড়ে তখন তার ডানার তলার চেয়ে ডানার উপর দিয়ে বাতাস জোরে বেরিয়ে যায়, ফলে ডানার উপরে চাপ নীচের চেয়ে কমে যায়, নীচে চাপ বেশি থাকে, ফলে পাখি আকাশে ভেসে থাকে। প্লেনটেনও ঐ এক রকমভাবে ভাসে। তবে আমরা করবো কি ভিতের তলায় ভারি বাতাসের বেলুন লাগিয়ে দেবো, আর বাড়ির ছাদ কিংবা তার উপরে লাগাবো হালকা গ্যাসের বেলুন, আর মানুষ যেহেতু ঘর বাড়িতে হাঁটবে চলবে কাজ করবে, সেজন্য সেখানে আমরা পৃথিবীর যে জল-হওয়া চাপ উষ্ণতায় অভ্যস্ত তাই রাখবো। ভিত শুধু নীচের দিকে যেতে চাইবে আর উপরের বেলুনগুলো ঘরবাড়িকে উপরে টানতে *থাকবে এই টানাপোড়েনে এটা কি করবে তবে ?*

তোচনদার সঙ্গে আমি হেসে উঠি···

এটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু বাতাসের দাপটে অর্থাৎ চারপাশের বাতাস তো ছেড়ে কথা বলবে না, কখনো পূর্ব দিক থেকে বাতাস এসে পশ্চিমে নিয়ে যাবে, কখনো বা পশ্চিমের বাতাস পূর্বদিকে ঠেলবে বা এলোমেলো বাতাসে··

তোচনদা চিন্তিতভাবে বলে, সমস্যাটা যে হবে, তা কিন্তু আগে খেয়াল করিনি, ধাঁচাটা তৈরী হবার পর হঠাৎ স্ট্রাইক করে, তোর কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটা খেয়াল হলো না কেন বুঝতে পারছি না, যাইহোক, দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে, অবিশ্যি দোষত্রুটি কি হচ্ছে বা হলো, গলদ কোথায়, ইমপ্রুভ করা যায় কিনা-এজন্য অবিরত ছোটো খবর তথ্য বল, জমা হয়ে যাচ্ছে ঐ ছোট্ট ভাণ্ডার–বাক্সে···

এতক্ষণে ঐ ছোট্ট কালো বাক্সটা দেখি, বাক্সের উপরে নানারঙের বাতি জ্বলছে নিভছে, একটা আলোর কাঁটা—নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে, আবার স্থিরও থাকছে।

এবার বেলুন ছাঁড়ে দিচ্ছি—

পর্দায় ফুটে ওঠে ভিতের নীচে ও ধাঁচার উপরে ছোট্ট ছোট্ট বস্তু।

আমি অবাক হতে অবাকতর হয়ে যাচ্ছি, এ-ও কি সম্ভব, তোচনদা এত বুদ্ধি পেলো কোথা থেকে, আমরা তো তার মতোই মানুষ, তবু···

তোচনদা পর্দায় চোখ বিঁধিয়ে আছে, তবে কি মগ্ন হয়ে গেছে কাজে !

কাজ করলে মানুষকে আরো সুন্দর দেখায়, সুন্দর লাগে !

আচ্ছা তোচনদা।

উঁ।

মেঘের কোলে ঘর বাড়ি তুললে তো প্লেনটেন চলার রাস্তাই বন্ধ হয়ে যাবে একদম।

বন্ধ হবে কেন ? আকাশ বিরাট, তামাম এখন ফাঁকা।

কিন্তু বাড়ি ঘর উঠলে ফাঁকা থাকবে না আর, তখন···

প্লেনরুটগুলো আমাদের জানা, ভবিষ্যতে কোথায় কোথায় রুট হতে পারে তার একটা ব্লুপ্রিন্ট ক'রে বাদ বাকি জায়গা কাজে লাগানো যাবে। আর হেলিকপ্টার অত উঁচু দিয়ে ওড়ে না, অতএব ওটা কোনো সমস্যা হবে না।

এসব করলে, কিন্তু ঘর বাড়ি করলেই তো শুধু হবে না, পৃথিবীতে মানুষ যা যা নিয়ে বাঁচছে তার ব্যবস্থা তো করতে হবে ?

যথা ?

এত উঁচুতে বায়ুর চাপ, টেম্পারেচার, অক্সিজেনের অভাব, গাছ-পালা লাগানো, জল, খাবার-দাবার—সব মিলিয়ে তো

কথার মধ্যে তোচনদা বলে ওঠে, এসব আমার মাথায় আছে রে, সেজন্যই তো ভাণ্ডার বাক্সটা রেখেছি। সব খবর জমা হচ্ছে ওতে, খবরগুলো নিয়ে বসতে হবে, ভাবছি , তোচনদার দৃষ্টি আবার কোথায় হারিয়ে যায়, তবে পরমুহূর্তে ফিরে আসে, এবার ইনুডিটেলে প্ল্যানটা করে ফেলবো, নিজেই যাবো দিল্লী, গভর্মেন্ট সাহায্য করলে কাজটা অনেক সহজ হবে, প্লাস অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন রাখবো, তবে শেষমেষ আমাদের যেতে হবে মানুষের কাছে, তারা হাত বাড়িয়ে না দিলে এগিয়ে না আসলে কিছু করা যাবে না, মানুষের সাহায্য পেলে কাউকে পরোয়া করবো না আমরা, তারাই হবে আমাদের দিশারি, তবে এজন্য খাটতে হবে খুব, হয়ত বিপদেও পড়তে হবে, তবু···

এই সময় হঠাৎ পিপ্‌পিপ্ শব্দ হতে থাকে রথের

মধ্যে আর লাল আলো জ্বলে ওঠে তীক্ষ্ম হয়ে।

নিশ্চয় রঘুদা বিপদে পড়েছে, কুইক্ কাজু

তোচনদা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বোতাম বন্ধ করে দিয়ে, অন্য দুটো বোতাম টেপে অতি দ্রুত।

ইচ্ছারথ দারুন বেগে নামতে থাকে।

অথচ আমি টের পাই না।

নাম্ নাম্, তোচনদা বলতে ধর মড়িয়ে উঠে পড়ি।

নামার আগে তোচনদা বলে, উড়াল পোষাক রথের মধ্যেই রেখে যাই, কি বল্ ?

আমরা উড়াল-পোষাক ছেড়ে সাধারণ পোষাকে নেমে আসি রথ থেকে।

আট

ইচ্ছারথ থেকে নেমে কাজু ও তোচন আস্তে আস্তে প্রায় নিঃশব্দে বৈঠকখানায় ঢোকে। সোফায় দুজন বসে আছে, তার মধ্যে একজনকে কাজু ও তোচন দু-জনেই চেনে, তিনি হচ্ছেন আরোহণ শর্মা। দ্বিতীয় জনকে কোথাও দেখেছে ব'লে তোচনের মনে হলেও সে কিছুতেই কোথায় দেখেছে মনে করতে পারে না।

কোনো কন্‌ফারেন্স-এ দেখেছি কি ?

তবু তোচন দ্বিতীয় জন সম্পর্কে তেমন কৌতূহল বোধ করে না। জানে, যখন এসেছে তখন পরিচয় হবেই। ততক্ষণে সে রঘু-র দিকে এগিয়ে গেছে। কাজু আগেই এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছিলো।

আরোহণ ততক্ষণে উছলে ওঠেন, আসুন, কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্। আপনাদের প্রতীক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলাম।

ধন্যবাদ, তোচন কোনমতে উত্তর দিয়ে রঘুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

ব্যস্ত হবেন না, রঘুদার কিছু হয়নি।

তোচন রাগতে গিয়ে কোনমতে সামলে নেয় নিজেকে। বিনীতভাবে বলে, এজন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নিশ্চয়ই জানাবেন।

এবার তোচন অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে।

কিন্তু আমরা আসার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেছে, আরোহণ হাসলেন, আমরা দোষী নই, কি বলুন রঘুদা ? আবার একটু থেমে বলেন, পরিচয় করিয়েদি, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত পদার্থবিদ্ প্রোফেসর এন সি. সমাদ্দার, আর উনি ··

আমি ওঁকে চিনি, সমাদ্দার হাসলেন।

প্রোফেসর এখন আমাদের সঙ্গেই আছেন, দারুন কাজ করছেন, বস্ এখন পুরো চার্জ ওকে দিতে চাইছেন, কিন্তু উনি নিচ্ছেন না, এবার বলুন রঘুদা

আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই শর্মা, কারণ আপনিই প্রসঙ্গটা তুলেছেন ··

হাঁ-হাঁ, আমি-ই বলছি, একটু ভাবলেন শর্মা, আপনার ফাইল চুরি গেছে, এসে দেখি রঘুদা হাফ-অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে সোফার উপর, চোখে মুখে জল দিতে এবং এন সি হাত পা টেনেটুনে দিলে তবে রঘুদা চোখ মেলতে পারেন। এবার বলুন, রঘুদা।

আর বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি, তোচন তখন রঘুকে জিজ্ঞেস করে, এখন সুস্থ বোধ করছো তো ?

হাঁ।

তোচন এবার আগন্তুকদের দিকে ফেরে, বলুন কি খবর ?

কি বলবো, আপনি তো জানেন, সমাদ্দার বললেন। আরোহণের সঙ্গে অসময়ে আসার কারণটা জানতে চাইছি মাত্র ··

অসময়ে কোথায় ? আপনি তো এখুনি নামলেন, সবে তো সন্ধে, সমাদ্দার হাসলেন।

আচ্ছা, তোচনও বাঁকা উত্তর দেয়, সবে সন্ধেই বটে !

আমরা চুক্তিটা তাড়াতাড়ি সারতে চাই, সোজা হলেন সমাদ্দার যেন, দেখলেন তো একটু দেরি করেছি আসতে, তার মধ্যে ফাইলটা গায়েব হয়ে গেল, বেশি দেরি করলে হয়ত —

কোন্ ফাইল ? নিরীহ প্রশ্ন করে তোচন।

সে কী ! চোখ কপালে ওঠে আরোহণের, আপনার ফাইল, বললাম কি তবে এতক্ষণ ? তোচন খুব শান্ত হয়ে জবাব দেয়, আমার তো হাজার গণ্ডা ফাইল আছে, তাই জিজ্ঞেস করছি কোনটে গায়েব হলো ?

কেন ? আরোহণ অবাক হয়, এখন যেটা নিয়ে কাজ করছেন, তোকার – ১

আপনি জানলেন কী করে যে ঐ ফাইলটাই চুরি গেছে ? আমি তো ঠাহর-ই করতে পারবো না কোনটা গেছে, কোনটা আছে

না মানে ওটাই তো চুরি যাওয়া স্বাভাবিক, আরোহণ খামকা হাসতে থাকেন।

কেন ?

সমাদ্দার এবার বলে ওঠেন, মানে শর্মা বলতে চান,

ওটা নিয়ে যখন কাজ করছেন, তখন ওই ফাইল নিশ্চয় সামনে থাকবে, আর চোর এসে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি ঐ ধারণা করে বলেছিলাম আপনাকে, আরোহণ যোগ করে ধন্যবাদ, তোচন তির্যক ভাবে তাকায় আরোহণের দিকে, তার ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে আছে তখনও

এখন এস এল-কে গিয়ে কি যে বলবো, আরোহণকে বেশ কাতর দেখায়, উনি আমাদের রাম অপদার্থ ভাববেন

কেন ?

বাহরে, ফাইলটা চুরি গেলো, ওতেই আপনার প্ল্যানটা ছিলো, উনি আমাদের পাঠিয়ে ছিলেন সব দেখে শুনে রিপোর্ট দিতে, ফাইলটাও আনতে বলেছিলেন—তোচন একটু ফাজলামি করে, ফাইল নিয়ে কি ভাজা করবেন ?

তা জানি না মশাই, বিগ্ বিগ্ লোকের ব্যাপার, ওরা ভাজা করবেন, না, দম বানাবেন সেটা বোধ হয় একমাত্র ভগবানই জানেন, মনে হয়—

সমাদ্দার বলে ওঠেন, প্ল্যানটা উনি ওয়েল-ফেয়ার স্কীমে নেবেন বলে ঠিক করেছেন

ওয়েল-ফেয়ার স্কীম ?

হ্যাঁ, তাই তাঁর ইচ্ছা, পাবলিক কে কল্ দেবেন - ঐ স্কীমের জন্য—আচ্ছা, তা এতে আপনাদের ভূমিকা কি ?

আমাদের ভূমিকা, সমাদ্দার হেসে ওঠে, আমরা তাঁর সহযোগী— মানে আপনি একজন সায়েন্টিস্ট, তাই আর এক সায়েন্টিস্ট্-এর কথা মানবেন, সেই ভরসায় এস. এল পাঠিয়েছেন আমাদের, তাছাড়া বহুদিন আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, সেই কবে—, আরোহণ মনে করতে চেষ্টা করেন সেই দিন বছর মাস ইত্যাদি

আচ্ছা, আচ্ছা, আপনারা একটু বসুন, কফি-টফি খান, তারপর না হয় কথাটথা হবে—

ওসব খেতে গেলে আবার দেরী হয়ে যাবে, তার মধ্যে না আবার কিছু ঘটে যায়

তোচন হো হো করে হেসে ওঠে, আগে ভয় পেলে কি সায়েন্টিস্ট্দের চলে ? রঘুদা প্লিজ কফি কাজুবাদাম বা সন্দেশ দাও ওঁদের, ওঁরা এসেছেন—এত রাতে, যদিও সন্ধে ওঁদের কাছে, কিন্তু, সমাদ্দার ও আরোহণ দুজনেই অস্থির হয়ে ওঠেন

আহা, বললামই তো আমি আছি, কোনো ভয় নেই আপনাদের

নাহ্ মানে, বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে, এস এল আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন।

তাহ'লে ফোন করে দিন একটা, এতবড় একটা জিনিষ কি চট করে হবে ? না-না, ফোন করে বলে দিন—একটু দেরী হবে

তোচন ভরসা দেবার পরও উদ্বেগ কাটে না যেন দুজনের, উনি আবার চলে যাবেন—

দেখুন, আপনারা দেখে শুনে বুঝে টুঝে তবেই তো রিপোর্ট দেবেন, তাতে আমারও রিস্ক্ থাকবে কম, আপনারা বলতে পারবেন না, আমি ঠকিয়ে প্ল্যানটা গছিয়ে দিয়েছি আপনাদের ঘাড়ে।

সে কথা ঠিক, কিন্তু এসব করতে গেলে অনেক দেরী হয়ে, বস্ চান যে—

বলছি তো তাড়াহুড়ো করবেন না, তাড়াহুড়োয় কি থেকে কী হয়ে যাবে, তখন সব দোষ হবে আমার, তাই বলছি।

না মানে, বুঝতেই পারছেন, এসব কফিটফি খেতে গেলে যদি—বলছি তো, আপনাদের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, তোকার ১ ফাইল চুরি যায় নি—

এ্যাঁ ! কি বলছেন ! দুজনেই একসঙ্গে আঁতকে ওঠেন

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, আসল ফাইলটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, ওটা রথে আছে—

বাঁচালেন আমাদের, স্বস্তির শ্বাস পড়ে দুজনেরই

তাই বলছিলাম কফি-টফি খান, তারপর ধীরে সুস্থে ইচ্ছা রথে গিয়ে রথটা দেখবেন, ফাইলও। আমি ততক্ষণে জামা কাপড় বদলে আসি।

আচ্ছা আচ্ছা, সেই ভালো, সব দেখে শুনে রিপোর্ট দেওয়া যাবে, কি বলেন প্রোফেসার সমাদ্দার ?

মিস্টার শর্মা আপনি বরং একটা ফোন করুন এস. এল কে, উনি না হলে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন আমাদের দেরী দেখে।

হ্যাঁ, বরং একটা ফোন করি, আরোহণ আস্তে আস্তে ফোনের কাছে গেলেন এবং ফোন তুলে ডায়াল করতে থাকেন।

রঘু গেল কফি আনতে

এবং তোচন জামা ছাড়তে।

কেবল কাজুই থেকে যায় ঘরে।

আরোহণ কথা বলছেন খুব নীচু স্বরে প্রায় ফিস-ফিসিয়ে, তার গায়ে লেগে থাকলেও একটা বাক্য বুঝতে পারবে না কেউ।

সমাদ্দার বসে আছেন চুপচাপ ফোনের দিকে তাকিয়ে।

কাজু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার দেখছে আরোহণকে, আর বার সমাদ্দারকে।

তখন কফি আসে। রঘু বিস্কুট ও সন্দেশ এনেছে প্লেটে।

ট্রে নামিয়ে পেয়ালা এগিয়ে দেয়। আরোহণ এসে বসেন, তাঁকে বেশ চিন্তিত দেখায়

পেলেন ? কাজু জিজ্ঞেস করে

হাঁ, আরোহণ কফিতে চুমুক দেন, আহ্

সমাদ্দার সন্দেশের টুকরো মুখে পুরে চিবুতে থাকেন, আপনি মিস্টার তোচনের অ্যাসিস্টেন্ট নিশ্চয় ?

কাজুর উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার জিজ্ঞেস করেন, রিসার্চের ? নাকি

কাজু মুখ কাঁচুমাঁচু করে

আপনি তো গিয়েছিলেন ওঁর সঙ্গে ?

হাঁ

একেবারে মেঘ পর্যন্ত ?

আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?

না—না, সে-কথা বলছি না, জিজ্ঞেস করছি মেঘে যাবার এক্সপিরিয়েন্স কেমন হলো ? কাজুর দিকে তাকিয়ে একটু থতমত খায়, মানে···

তা কি ভাষায় বলা যায় ? ভাষার অতীত সে অভিজ্ঞতা

নাকি ?

গেলে বুঝতে পারবেন ?

তাই নাকি ?

হাঁ, আর ইগলুটা যখন বানানো হলো···সে এক দৃশ্য বটে, কাজু আমেজে চোখ বোঁজে

ইগলু ?

এস্কিমোরা বরফ দিয়ে যে বাড়ি বানায়,

হাঁ—হাঁ, আরোহণ এতক্ষণ চুপ করে থেকে এখন উছলে ওঠেন, ছবিতে দেখেই, দারুণ কিন্তু, তারপর অবাক হয়ে দেখলেন কাজুকে, মেঘের কোলে বাড়িও বানালেন ?

হাঁ

তাহলে সেণ্ট পারসেণ্ট সাকসেসফুল হয়েছেন তোচন, সমাদ্দারের দিকে তাকান এবার আরোহণ, বস্, খুব খুশি হবেন, বুঝেছেন, ফাইলে তো সব লেখা থাকবে, দেখবেন পেপার বের হলে বস্ আমাদের নামও কো-অথর হিসেবে ঢুকিয়ে দেবেন হয়ত

আহ্, কি বকছেন যা—তা, সমাদ্দার ধমক দিয়ে ওঠেন, আপনার কাণ্ডজ্ঞান কবে হবে ?

ও হো, আরোহণ চুপসে যায় সঙ্গে সঙ্গে, তাইতো বলতে বলতে ঘন ঘন চুমুক দিতে থাকেন কফিতে।

তোচন ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করে, ল্যাব দেখবেন কী ?

ল্যাব ? আরোহণ সমাদ্দারের দিকে তাকায় দরকার আছে কি ? সমাদ্দার পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

না না কি দরকার, কেমন থতমত খেয়ে উত্তর দেয় আরোহণ, বরং ফাইলটা দেখাই জরুরী, বস্ ওতেই বেশি ইণ্টারেস্টেড্

তোচন সমাদ্দারের দিকে তাকায় মত জানার জন্য

যাক্, ল্যাব দেখে কি হবে, বরং ফাইল-টাইলগুলো

তোচন বিনীত ভাবে বলে, ফাইল দেখতে হলে আপনাদের একটু কষ্ট করতে হবে

আরোহণ ও সমাদ্দার দুজনে তোচনের কথা ঠিক বুঝতে পারে না, তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

তোচন হেসে বলে, একটু আসতে হবে রথে

এ আর কষ্ট কি, সমাদ্দার উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, ওটা দেখাই তো আসল, বস্ ওটার সম্বন্ধেই বেশি আগ্রহী, সে তাকায় আরোহণের দিকে, কি বলুন শর্মা ?

হাঁ—হাঁ, আরোহণ যেন সমাদ্দারের প্রতিধ্বনি করতে চায় তবে আসুন

তোচনের সঙ্গে আরোহণ ও সমাদ্দার যেতে থাকেন, কাজু ও রঘু অনুসরণ করে তাদের আস্তে আস্তে।

এই হচ্ছে আমাদের ইচ্ছারথ, পরিকল্পনার প্রথম ধাপ, এই আকাশ যানে চেপে চেপে যেতে হবে মেঘের কোলে, তারপর আসল কাজ

এযে দারুণ ! পুষ্পক রথের রেপ্লিকা, আরোহণ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন, কি দারুণ দেখতে প্রোফেসার···

দারুণ ! সমাদ্দারও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন, পুষ্পক যেমন খচিত ছিল অজস্র ফুলে, আপনাদের ইচ্ছারথ দেখে মনে হচ্ছে ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়েছেন রথ, খাঁজগুলো বাতাসে ফুলের পাঁপড়ির মতো লুটোপুটি খাচ্ছে, দারুণ দারুণ, সমাদ্দার মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে বলে ওঠেন,

ভিতরে নিশ্চয় রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ, প্রাণময় তুরঙ্গ আছে !

তোচন লাজুক ভঙ্গি করে বলে, ওগুলো হয়ত পাবেন না, কিন্তু তার আদল কিছু পাবেন, ভিতরে গেলেই দেখতে পাবেন

বটে ?

ভিতরে গিয়ে দেখুন রথটা, ফাইলও আছে টেবিলের উপর ওখানে, আর উড়েটুড়ে যদি দেখতে চান তবে, সে কী কী বোতাম টিপতে হবে তখন বলে দেবো।

আরোহণ তাকায় সমাদ্দারের দিকে, ভিতরে গিয়ে কি দেখার দরকার আছে ?

এই তো বেশ দেখছি, সমাদ্দার উত্তর দেন

তাহ'লে. আরোহণ তাকায় তোচনের দিকে

এতই যখন করলেন, তখন ভিতরটাও দেখে নিন, আমি অন্তত সান্ত্বনা পাবো যে আপনারা দেখে নিয়েছেন জিনিষটা

দেখবেন প্রোফেসার ? আরোহণ জিজ্ঞেস করে সমাদ্দারকে

তার কি দরকার আছে ?

বারে, শুধু আমার কথার উপর নির্ভর করে বস্-কে রিপোর্ট দেবেন, না না, আপনারা দেখুন সব ঠিকঠাক আছে কিনা, অতগুলো টাকা লগ্নি করবেন, যদি ভুয়ো হয়

না—না, আপনার কথা অবিশ্বাস করবো কেন ?

আমি তো বিক্রেতা, তোচন হাসে, বিক্রেতা সর্বদা বড় বড় কথা বলে জিনিষ গছায় ক্রেতাদের, গিয়ে দেখুন, তাছাড়া ফাইলটা আছে ওখানে, বাইরেও আনতে পারি, কিন্তু তাতে প্রায়, তোচন থেমে হিসেব কষে যেন, ঘণ্টা দুয়েক লেগে যাবে বের করতে, কারণ ওটা বের করতে হলে, অনেক কাঠ খর পোড়াতে হবে, তাই বলছি—অন্তত ফাইলটা দেখার জন্যও আপনাদের ভিতরে যেতে হবে, আর যদি ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করতে পারেন, তবে আমি গিয়ে খুলে আনবো

ঘণ্টা দুই ! দুজনেই আঁতকে ওঠেন, না—না অতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না তাহ'লে

আরোহণ ও সমাদ্দার ইচ্ছারথের সামনে এসে দাঁড়ান।

আর একটু এগিয়ে যান. দরজা খুলে যাবে রথের

আপনি যাবেন না ? আরোহণ জিজ্ঞেস করে

মাত্র দুজনের জায়গা আছে, আপনারা দেখুন, কোথাও থেমে গেলে ডাকবেন,

আমি একটু এগিয়ে যেতে রথের দরজা খুলে যায়।

আচ্ছা তাহ'লে···

আরোহণ ও সমাদ্দার ভিতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

আর সঙ্গে সঙ্গে তোচন পকেট থেকে দূরে-শাসন যন্ত্র বের করে বোতাম টেপে

নিমেষে হিস্‌হিস্ শব্দ হয়েই ইচ্ছারথ বেগে মাটি ছেড়ে আকাশ পানে ছুটে চলে।

তোচন জোরে হেসে উঠতে কাজু ও রঘু তার দিকে তাকায়।

এখন রথের গতি কত জানিস ? তোচন হেসেই চলে

কাজু ও রঘু তার হাসি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে।

আট কিলোমিটার পার সেকেন্ড

তার মানে ?

তোচনের হাসি থেমে যায়, তার মানে ইচ্ছারথ কোনোদিনই আর ফিরে আসবে না পৃথিবীতে, ঘুরতেই থাকবে, ঘুরতেই থাকবে

তাহ'লে ওরাও ফিরতে পারবে না আর ?

নাহ্, দালালি করার ফল, বিজ্ঞান নিয়ে ফাটকাবাজি খেললে তার শাস্তি পেতেই হবে

কিন্তু ওরা তো টিকতে পারবে না, সইতে পারবে না ঐ ধকল ঐ চাপ

তোচন হাসে, আরে বাবা ঐজন্যই তো পোষাকগুলো ছেড়ে এসেছিলাম, কষ্ট হলে পরে নেবে, আর খাবার-দাবার সব আছে ওখানে, তোচন থামে একটু, অত নিষ্ঠুর আমি নইরে, ওরা মরবে না

কিন্তু ফিরতেও পারবে না ?

হ্যাঁ, ফিরতে পারবে না, তোচন দৃঢ়ভাবে উত্তর দেয়

কিন্তু তোচনদা, কাজু বলতে গিয়ে থামে, কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা ভাবে

চুপ করে গেলি কেন ? বল্, তোচন আবার সহজ স্বাভাবিক স্নেহময় হয়ে উঠছে যেন

ভাবছি, কাজু থামে একটু, আসল লোকের গায়ে কিন্তু এতটুকু আঁচড় লাগলো না, মধ্যে থেকে এরা শাস্তি পেলো

কি বলতে চাইছিস্, খুলে বল্, তোচনের স্বরে উষ্মার আভাস, কাজু তোচনকে দেখে কয়েক মুহূর্ত ভাবে, তারপর বলে, যারা আসল লোক, সেই সম্পৎলালরা কিন্তু দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছেন এখন, স্বপ্ন দেখছেন, আর এরা এখন...

খুলে বল্ ঝটপট

এটা ঠিক যে এরা আমাদের সব কিছু পণ্ড করে দিচ্ছিলো, সেই মতলবেও এসেছিল, কিন্তু এরা তো হচ্ছে দাবার বোড়ে, সম্পৎলালদের হাতের পুতুল, কটা টাকা দিয়ে চাকর বানিয়ে···

হ্যাঁ, আমি মানছি এরা সম্পৎলালদের চাকর, প্রভু যা বলবে তা করতে বাধ্য, কিন্তু প্রভুর হয়ে দালালি করা চাকরের কাজ নয়, তোচন উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে থাকে, বাঘা বাঘা বিজ্ঞানী এরা, চাকরি করতে পারে সম্পৎলালদের, কিন্তু তাই বলে দালালি, চাকরি আর দালালি এক নয়, কাজু চুপ করে থাকে, তোচনদাকে এত উত্তেজিত হতে কোনো দিন দেখে নি, তবে বুঝতে পারে, এ উত্তেজনা ক্ষণিক, তোচনদার রাগ পড়ে যাবে, তখন সে কথা বলবে

তোচন পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে পড়ে, তোর কি মনে হচ্ছে, তোচন দৃষ্টি নত করে দু-এক-পা এগিয়ে আসে, দন্ডটা একটু বেশি হয়ে গেল ?

কাজু চুপ করেই থাকে।

বুঝলি, বিজ্ঞানী হয়ে দালালি করছে দেখে মেজাজটা খিচড়ে গিয়েছিলো, তার উপর ফাইলটা চুরি করে ন্যাকা সাজে, এতে কি মেজাজ ঠিক থাকে ?

তোচন থামে তুই ঠিক বলেছিস্, আসল কালপ্রিট্‌রা বহাল তবিয়তে আছে, তাদের গায়ে আঁচড়টি লাগছে না, কিন্তু আমরা কি করতে পারি ওদের ? ওদের ধরা যায় কী করে ?

তোচন প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারে কাজুর সামনে, কাজুকে পেরিয়ে সকলের সামনে যেন।

আসলদের কথা পরে ভাবা যাবে, এরা যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে, এখন ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করো, কাজু ব্যস্ত হয়ে ওঠে

হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশী হয়ে গেছে একটু, চ্ চ্ তবে ল্যাবে

ওরা দ্রুত চলে আসে ল্যাবরেটারিতে।

ঢুকেই তোচন দূর-শাসন যন্ত্রকে একটা প্ল্যাগে লাগিয়ে দেয়। তারপর অ-প্রক্ষেপক যন্ত্র চালু করে। পর্দা অন্ধকার থাকলেও একটা আলোর রেখা উপরে চড়চড় করে উঠে এক জায়গায় থেমে যায়, থেমে এবার নামতে থাকে, তবে কিছু এঁকে বেঁকে, তারপর থেমে যায় হ্যাঁ নামবে, তোচন তা দেখতে দেখতে বলে নিশ্চয়, তবে তোচনের দৃষ্টি পর্দায় নিবদ্ধ, ইচ্ছারথ ঠিক এখানে নামতে পারবে না.

তাহলে ?

অভিকর্ষের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলাম দূর-শাসন দিয়ে, পর্দায় তখন চোখ তোচনের,

কিন্তু ইচ্ছারথ অভিকর্ষের বাইরে গেলেও, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নামার সংকেত দিয়েছি, ফলে রথের উপর ধকল গেছে খুব, রথ আমাদের অকেজো হয়ে যাবে নামার পর প্রবল ঝাঁকুনিতে

তবে তো ওদের উপরও, আর

ভাবছিস্ কেন কিছু হবে না ওদের, আমরাও আবার শুরু করবো প্রথম থেকে, তোচন উৎসাহিত হয়ে বলছে তখন, পরিকল্পনাটা ঢেলে সাজাবো, ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোও ঠিকঠাক করবো, আর চেষ্টা করবো যাতে সম্পৎলালরা কব্জা করতে না পারে

কাজু ও রঘু চুপ করে শুনে যায়

পারবো না আমরা ? আবার প্রশ্ন ছোঁড়ে তোচন ওদের সামনে

পারবো না শব্দটা আমাদের ডিক্‌শেনারিতে নেই তোচনদা ··

কাজুর কথা শেষ না হতেই তোচন বলে ওঠে, ইচ্ছারথ নেমেছে, ওরাও নেমে পড়েছে ত্রিবেনীর গঙ্গার ধারে

থ্রি চিয়ার্স ফর তোচনদা, কাজু রঘু ধ্বনি দিয়ে ওঠে

না – না, আমার জয়ধ্বনি নয়, বল্ – থ্রি চিয়ার্স ফর তোকার ১

হিপ্ হিপ্ হুররে···

তিনজন তিনজনকে জড়িয়ে ধরে। তাদের বুকের মধ্যে বেজে ওঠে তখন – কাজ কাজ, কাজের জয়ঢাক।

উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

এই পৃথিবীতে কোনও প্রাণীই একা বাঁচতে পারে না। জীবন ধারণের জন্য অন্ততঃ দ্বিতীয় একজন প্রাণীর তার অবশ্য প্রয়োজন। প্রয়োজন সেই দ্বিতীয় প্রাণীর সঙ্গে ভাব বিনিময় বা যোগাযোগও।

ভাষাই ভাব বিনিময়ের সেরা মাধ্যম হলেও আকার ইঙ্গিতও কম অর্থবাহী নয়। ভাষা সৃষ্টির আগে আদিম মানুষেরা প্রধানতঃ আকার ইংগিতেই ভাব বিনিময় করতো।

ভাব বিনিময় ও প্রকাশের প্রাথমিক প্রয়োজন অবশ্যই স্থূল জীবনযাপনের জন্য। কিন্তু প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানুষ সূক্ষ্ম মানসিক প্রয়োজনেও ভাব বিনিময় করে। অন্যের কৃত নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি ও খেলাধুলো দর্শন ও শ্রবণ সভ্য মানুষের সুস্থ জীবনের দ্যোতক। নাচ গান-অভিনয় খেলাধুলো পৃথিবীর সমস্ত মানবসমাজে বর্তমান। লিপি আবিষ্কারের আগে ভাব বিনিময় কেবলমাত্র সরাসরিই সম্ভব ছিল। একজন মানুষের যা বলার তা সরাসরি অন্যজনকে বলতো। একজন মানুষই যা প্রদর্শন করার তা সরাসরি অন্যজনকে প্রদর্শন করতো। বড়জোর, একজনের দূতের মাধ্যমে দূরের মানুষের কাছে মনোভাব প্রেরণ করা যেত। লিপি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হলো পত্র ও পত্রবাহক। পত্র ও ইস্তাহারের মাধ্যমে মনোভাব সঞ্চারিত হতে লাগলো দেশ থেকে দেশান্তরে। উট, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি বাহক মন্থর পায়ে গতিময় হয়ে উঠলো পত্রবাহকে। নৌকা-জাহাজের মাধ্যমে জলপথেও মহাদেশ অতিক্রম করতে লাগলো পত্র-বাহক। এই ভাবেই মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠলো। চললো উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যুগান্তকারী পরিবর্তন এলো ভাব সঞ্চারের ক্ষেত্রেও। গ্যালভানি ও ভোল্টা যে ব্যবহারিক তড়িতের উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন সেই তড়িতের সাহায্য নিয়েই ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সামুয়েল মর্স আবিষ্কার করেন টেলিগ্রাফী। এই আবিষ্কারের ফলে পরিবাহী তারের মাধ্যমে একজনের বক্তব্য দ্রুত বহুদূরে প্রেরণ করা সম্ভব

হলো। কিন্তু এই বক্তব্য লিখিত বক্তব্য মাত্র। মানুষের কণ্ঠস্বর সরাসরি দূরে প্রেরণ করা সম্ভব করে তোলে'ন মার্কিন বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ টেলিফোন আবিষ্কার করে। টেলিফোনের পর টমাস আলভা এডিশন আবিষ্কার করেন গ্রামোফোন ও সিনেমা। সিনেমা কিন্তু ভাব বিনিময়ের তাৎক্ষণিক মাধ্যম নয়। সিনেমায় অন্যের কৃত নাচ-গান অভিনয় ক্যামেরায় চিত্রগ্রহণের পর পরিস্ফুটনের প্রয়োজন হয়। পরিস্ফুটিত ফিল্ম দূর দূরান্তরে পাঠিয়ে ও সেখানে পর্দায়িত করে ভাবের প্রকাশ ঘটানো যায়। অনুরূপ ভাবে গ্রামোফোনও ভাব বিনিময়ের তাৎক্ষণিক মাধ্যম নয়।

সিনেমা ও গ্রামোফোন আবিষ্কারের পাশাপাশি ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনি আবিষ্কার করেন বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র। ফলে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন হয়ে ওঠে তারহীন। বেতার গ্রাহক যন্ত্রের উন্নতি ঘটিয়ে বহু মানুষের একসঙ্গে বসে বার্তা-শ্রবণও সম্ভব হয়ে উঠলো বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

নয়। টেলিফোনের জন্য কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পরিবাহী তার বিছাতে হয়। কখনও কখনও সমুদ্রের তলা দিয়েও নিয়ে যাওয়া হয় এই তার। এই তার বিছানো ও বিছানো তারের তদারকির জন্য বহু অর্থ ও লোকজনের প্রয়োজন। আবার পৃথিবীর গোলত্ব ও অন্যান্য কারনে বেতারে শব্দ ও চিত্র প্রেরণের দূরত্ব সীমাহীন নয়, বরঞ্চ বলা যায় খুবই সীমিত। ৭০ কিলোমিটারের বেশী দূরত্বে বেতার তরঙ্গ সার্থকভাবে প্রেরণ করা যায় না। সেজন্য টেলিগ্রাম-টেলিগ্রাফ-বেতার-দূরদর্শন কম দূরত্বে ভাব বিনিময়ের কাজ সুষ্ঠভাবে করলেও বেশী দূরত্বে এগুলির কার্যকারিতা যথেষ্ট সীমাবদ্ধ।

মাইক্রোওয়েভ তন্ত্র

টেলিফোন ও বেতার প্রেরণের এই সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবন হয় মাইক্রোওয়েভ তন্ত্রের। মাইক্রোওয়েভ তন্ত্র আসলে টেলিফোন, টেলিভিশন ও বেতার প্রেরণের সম্মিলিত ব্যবহার। পৃথিবীর গোলত্ব ও অন্যান্য

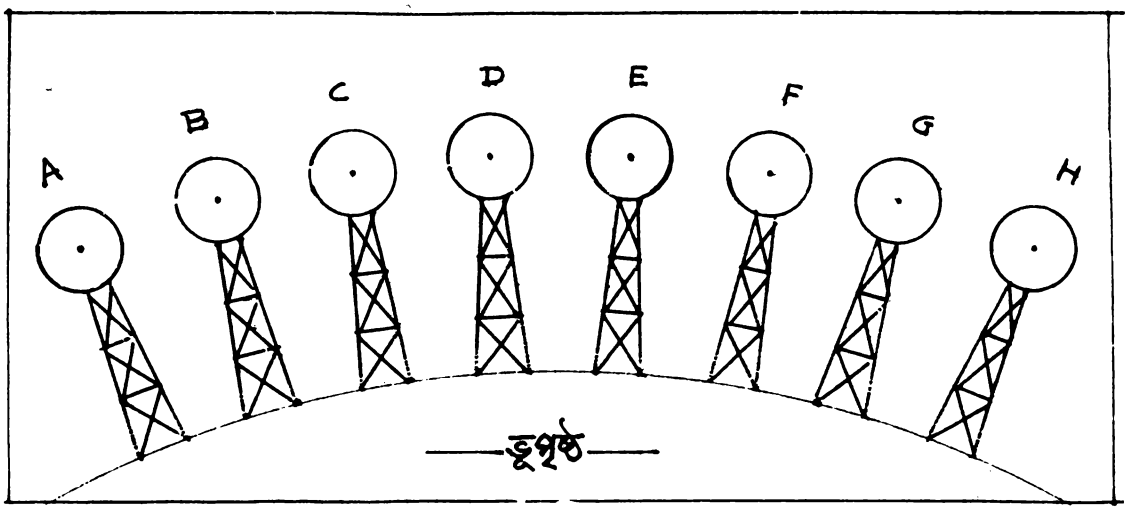

১৯২৬ এ বৃটিশ বিজ্ঞানী বেয়ার্ড আবিষ্কার করলেন টেলিভিশন বা দূরদর্শন। ফলে শুধু মানুষের কণ্ঠস্বর নয়, ছবিও তাৎক্ষণিক ভাবে দূরে প্রেরণ করা সম্ভব হয়ে উঠলো। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন-বেতার সম্প্রচার ও টেলিভিশনের দৌলতে দূর চলে এলো নিকটে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঘটলো যুগান্তর।

যোগাযোগ ব্যবস্থার এ হেন উন্নতি সত্ত্বেও পৃথিবী কিন্তু একাত্ম হয়ে উঠলো না। এর কারণ টেলিফোন বা দূরভাষ সুদূরভাষ নয়, টেলিভিশন বা দূরদর্শন সুদূরদর্শন কারনে বেতার তরঙ্গের সুষ্ঠ গতি মাত্র ৭০ কিলোমিটার। মাইক্রোওয়েভ তন্ত্রে (চিত্র ১) ৭০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত অনেকগুলি রিপিটার স্টেশনের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে এক জায়গার শব্দ বা শব্দ এবং চিত্র বহুদূরে সুষ্ঠভাবে প্রেরিত হয়। A স্থানে একজন টেলিফোনে কথা বললে / দূরদর্শন ক্যামেরার সামনে অভিনয় করলে শব্দ / চিত্র প্রথমে প্রথমে A স্টেশন থেকে তরঙ্গায়িত হলো। ওই তরঙ্গ B স্টেশনে গৃহীত হলো এবং পুনরায় তরঙ্গায়িত হয়ে C স্টেশনে প্রেরিত হলো।

একই ভাবে C থেকে শব্দ / দৃশ্য প্রতিফলিত হয়ে D-তে এবং একই ভাবে D থেকে প্রতিফলিত হয়ে E-তে। এইভাবে বিভিন্ন রিপিটার স্টেশনের মাধ্যমে H স্টেশনে শব্দ / দৃশ্য প্রেরিত হলো। এবং H স্থানের গ্রাহক যন্ত্রের মারফৎ শ্রোতা / দর্শক শুনতে / দেখতে পেলেন A স্থানের শব্দ / দৃশ্য।

কিন্তু মাইক্রোওয়েভ তন্ত্রের দুর্বলতা হলো এতে প্রেরিত বেতার তরঙ্গের বেশ কিছুটা বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে বহুদূরের স্টেশনের জন্য অনেক উচ্চশক্তির বেতার তরঙ্গের প্রয়োজন হয়। এছাড়া সমুদ্রের মাঝখানে সংকেত প্রতিফলিত করার জন্যে রিপিটার স্টেশন রাখা সম্ভব নয়। সেজন্য কেবলমাত্র স্থলভাগের মধ্য দিয়ে সীমিত দূরত্বের মধ্যে মাইক্রোয়েভ তন্ত্র কাজ করতে পারে।

উপগ্রহ সঞ্চার ব্যবস্থা

মাইক্রোওয়েভ তন্ত্রের রিপিটার স্টেশনটি যদি মহাকাশে স্থাপন করা যায় তাহলে পৃথিবীর গোলত্ব কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। উপগ্রহ সঞ্চার ব্যবস্থায় উপগ্রহ আসলে একটি রিপিটার স্টেশনেরই কাজ করে। এক স্টেশন থেকে প্রেরিত বেতার-সংকেত, তা শব্দ-দৃশ্য যারই হোক না কেন, প্রতিফলিত করে অন্য স্টেশনে প্রেরণ করে। কৃত্রিম উপগ্রহ সঞ্চার ব্যবস্থার প্রথম পরিকল্পনা করেন বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান রচয়িতা আর্থার সি ক্লার্ক। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫ মে এক প্রবন্ধে তিনি উপগ্রহ সঞ্চার ব্যবস্থার সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। আর্থার সি ক্লার্কের পরিকল্পনাতে ছিল বিস্তারিত অন্তরীক্ষ স্টেশনের স্থাপনা।

চাঁদকে রিপিটার স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করে সঞ্চার ব্যবস্থার প্রসার ঘটাবার চিন্তা অবশ্য ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ থেকেই অনেকের মাথায় ছিল। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মার্কিন নৌসেনা চাঁদের দ্বারা বেতার-সংকেত প্রতিফলিত করে অন্যত্র প্রেরণ করতে সুরু করেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটন (ডি.সি) এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে স্থায়ী উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে চাঁদের মাধ্যমে এবং এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

চন্দ্রকেন্দ্রিক সংযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা হলো কেবল যখন আকাশে চাঁদ দেখা যায় তখনই সংযোগ ব্যবস্থা চালু থাকে। চাঁদ অস্ত গেলে সংযোগ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়া চাঁদের মাধ্যমে বেতার সংকেত প্রেরণের জন্য বিরাট আকারের শক্তিশালী প্রেরক যন্ত্র বা ট্রান্সমিটারেরও যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন বিরাট আকারের গ্রাহক যন্ত্রেরও। উল্লিখিত মার্কিন চন্দ্র-যোগাযোগ ব্যবস্থায় গ্রাহক অ্যান্টিনাটির ব্যাস ছিল ২৬ মিটার।

কৃত্রিম উপগ্রহ

আর্থার সি ক্লার্কের পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগের সম্ভাবনা নিয়ে প্রথম গবেষণা সুরু করেন আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানী জে. আর পিয়ার্স। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে

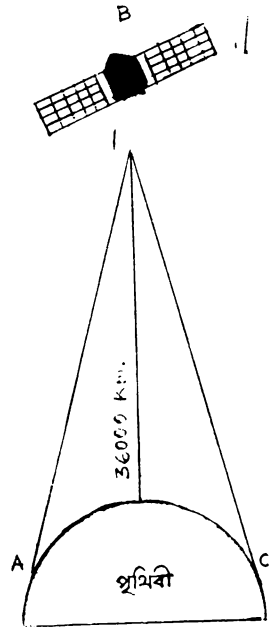

চিত্র-২

প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক নিক্ষেপের দু বছর আগেই পিয়ার্স কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্ভাবনা সম্বন্ধে এক বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরী করে ফেলেন। সেই অনুযায়ী কাজও সুরু হয়ে যায়।

কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা, ভূ-কেন্দ্রিক একজোড়া গ্রাহক / প্রেরক স্টেশন। সঞ্চার মাধ্যম—যার কিছুটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, কিছুটা মহাশূন্য ও কৃত্রিম উপগ্রহ। উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল পদ্ধতিটি চিত্র—২ এর সাহায্যে

সুস্পষ্টরূপে দেখানো করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার শব্দ বা / এবং দৃশ্য, তা টেলিফোন, টেলিভিশন, টেলেক্স—যে সূত্র থেকেই হোক না কেন তা প্রথমে A ষ্টেশন থেকে বেতার সংকেতে পরিণত করে মহাকাশস্থ উপগ্রহ B-র দিকে প্রেরণ করা হয়। ওই বেতার সংকেত উপগ্রহের দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে C গ্রাহক ষ্টেশনে গৃহীত হয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি-গ্রাহকের নিকট চ'লে যায়। ভূপৃষ্ট থেকে যদি কৃত্রিম উপগ্রহের দূরত্ব ৩৬০০০ কিলোমিটার হয় তবে ওই একটি উপগ্রহের সাহায্যেই পৃথিবীর ১/৩ অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকরী করা যায়। এইভাবে তিনটি উপগ্রহের সাহায্যে গোটা পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব (চিত্র --৩)। আবার উপগ্রহ থেকে প্রতিফলিত সংকেতের পরিমাণ উপগ্রহের আকারের ওপর নির্ভরশীল। সেজন্য একটি উপগ্রহের আকার যতো বড় হবে তার কাজ করার ক্ষমতাও ততো বেশী হবে।

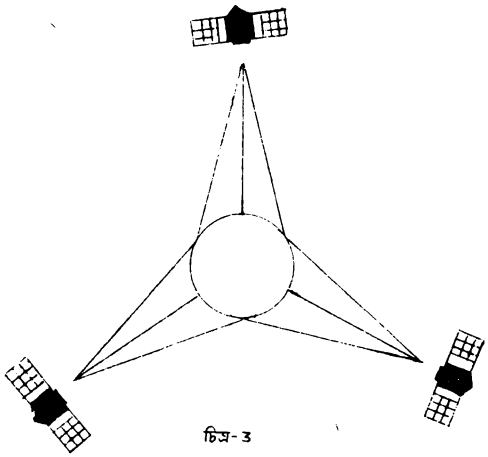

চিত্র- ৩

সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উপগ্রহ

যোগাযোগ উপগ্রহ দু ধরনের হতে পারে—নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয়। নিষ্ক্রিয় উপগ্রহের কাজ কেবলমাত্র আয়নার মত বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করা। এই ধরনের উপগ্রহে কোনও বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয় না। এদের জীবন কালও সক্রিয় উপগ্রহের তুলনায় বেশী। একো—১ এই ধরনের এক নিষ্ক্রিয় উপগ্রহের নাম। নিষ্ক্রিয় উপগ্রহের ত্রুটি হলো এর মাধ্যমে বেতার সংকেত প্রতিফলনের জন্য শক্তিশালী তরঙ্গ প্রেরণ করতে হয়।

সক্রিয় উপগ্রহের মধ্যে অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি থাকে। সেগুলি কার্যকর করার জন্য বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি উপগ্রহ নিজস্ব সৌর-কোষের মাধ্যমে সূর্য থেকে আহরণ করে। এই ধরনের উপগ্রহের স্থায়িত্ব ওই সৌরকোষের জীবনকালের পরই বাতিল হয়ে যায়। বর্তমানে প্রচলিত যাবতীয় কৃত্রিম উপগ্রহই সক্রিয় শ্রেণীর।

উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বজোড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক ১ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীদের দ্বারা উৎক্ষেপনের সঙ্গে সঙ্গে উপগ্রহ যোগযোগ ব্যবস্থা বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করতে সুরু করে। কিন্তু উপগ্রহ নির্মাণ ও উৎক্ষেপন যথেষ্ট অর্থসাধ্য ব্যাপার। সেজন্য সব দেশের পক্ষে নিজস্ব উপগ্রহ ব্যবস্থা তৈরী করা সম্ভব নয়। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে 'ইন্টলস্যাট' নামক এক বহু জাতীয় উপগ্রহ যোগাযোগ সংস্থা গড়ে ওঠে। ওই সংস্থার সদস্য ১০৮টি রাষ্ট্র। সংস্থা নিজস্ব যোগাযোগ উপগ্রহ উৎক্ষেপনের সিদ্ধান্ত নেয়—যে উপগ্রহের যাবতীয় ব্যয়ভার সমস্ত দেশগুলো বহন করবে এবং উপগ্রহের সুবিধাও সমভাবে বণ্টন করে নেবে। ইন্টলস্যাট জাতীয় দ্বিতীয় সংস্থার নাম 'ইনমারস্যাট'। ইনমারস্যাটের সদস্য ৫০টি দেশ। দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থাই সমস্ত দেশগুলোর জন্য উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখে।

নিজস্ব উপগ্রহ ব্যবস্থা

উপগ্রহ নির্মাণ, রকেটের সাহায্যে তা নির্দিষ্ট কক্ষে স্থাপন, বেতার তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য প্রচুর অর্থ ছাড়াও উৎক্ষেপনকারী দেশের কারিগরী জ্ঞানও যথেষ্ট উন্নত ধরনের হওয়া দরকার। সেজন্য সব রাষ্ট্রের পক্ষে পক্ষে নিজস্ব উপগ্রহ ব্যবস্থা রাখা অসম্ভব। কিন্তু বেশ কিছু উন্নত রাষ্ট্রের নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ আছে। কোথাও বা দুই তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিলে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা রাখে।

নিজস্ব উপগ্রহ ব্যবস্থা প্রথম চালু করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মোলনিয়া -১ উপগ্রহ উৎক্ষেপনের মাধ্যমে সোভিয়েত উইনিয়ন প্রথম তাদের নিজস্ব যোগাযোগ উপগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ওই উপগ্রহের মাধ্যমে মস্কো ও ব্লাডিভোষ্টকের মধ্যে দ্রুত

যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মোলনিয়া—১ এর পরে অনেক মোলনিয়া শ্রেণীর উপগ্রহ উৎপেক্ষণ করা হয়েছে।

পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে কানাডাই প্রথমে নিজস্ব উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কানাডার উপগ্রহের নাম 'এনিক' A, B, C, D করে অনেক 'এনিক' উপগ্রহ উৎক্ষেপিত হয়েছে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে। ১৯৭২ ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'বোল্টার' শ্রেণীর নিজস্ব যোগাযোগ উপগ্রহ চালু করে। এর পরে ইউরোপীয় দেশগুলি সম্মিলিতভাবে 'অ্যারবস্যাট' নামক উপগ্রহ উৎক্ষেপন করে। জার্মানী ও ফ্রান্স সম্মিলিত ভাবে উৎক্ষেপন করে 'সিম্পোনী' শ্রেণীর উপগ্রহ।

এশিয় দেশগুলির মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে উৎক্ষেপন করে পালাপা শ্রেণীর প্রথম উপগ্রহ পালাপা ১ ভারতের নিজস্ব উপগ্রহের নাম 'ইনস্যাট'। অতি সম্প্রতি উৎক্ষেপিত হয়েছে ইনস্যাট—১ডি উপগ্রহ।

কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে পৃথিবী সংকুচিত হয়ে চলে এসেছে মানুষের বৈঠকখানায়। বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে প্রেরিত হচ্ছে টেলেক্স, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলিভিশন। এমনকি ছবি সমেত একটি সম্পূর্ণ সংবাদপত্রও উপগ্রহের মাধ্যমে অন্য দেশে প্রেরণ করে হুবহু ছাপা সম্ভব হচ্ছে। অতি সম্প্রতি একটি খবরে প্রকাশ রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলের কোনও না কোনও অংশ সরাসরি দেখেছেন পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ। এ শুধু সম্ভব হয়েছে উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণেই। মানুষের ওপর মানুষের খবরদারি বা গোয়েন্দাগিরি নয়, সকল মানুষের কল্যাণেই বিজ্ঞানের এই আধুনিক অবদানকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

কথার কথা শেখার নয়

হাবুল ঃ কি ব্যাপার বলতো? রোজ দেখি তুই বস্তা ভর্তি করে চাল নিয়ে যাস!

পাঁচু ঃ আমি যা করি ভেবেচিন্তেই করি। টানা-টানির বাজারে এ না করে উপায় আছে?

হাবুল ঃ সে কি-রে? টানাটানির বাজারে রোজ চাল? এ কি ব্যাঙ্ক? যত জমাবে ততই বাড়বে?

পাঁচু ঃ কি ছাই জানিস? ঠাকুমা কি বলে গেছে জানিস? পুরানো চাল ভাতে বাড়ে। এরপর দেখবি আমায় আর চালই কিনতে হবে না।

বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসু

বিমলেন্দু মিত্র

কলকাতার প্রতিষ্ঠা ইংরেজের হাতে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের কালে কলকাতাকে সর্বাদিক থেকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করেছিল কলকাতারই নাগরিকদের প্রতিভা ও চেষ্টা। ইংরেজী শিক্ষা এদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল মেকলে (Macaulay) সাহেবের প্রতিবেদনের (১৮৩৫) ফলে। হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার পত্তন হয়েছিল। দুই স্বনামধন্য বাঙ্গালী অধ্যাপক, জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে এক নতুন আগ্রহ দেশী মানুষদের মনে জাগিয়ে তুললেন। বিশ শতকের উষালগ্নে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চা স্বাদেশিকতার চেতনার বিকাশের সঙ্গে ওত-প্রোত হয়ে মিশে গিয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা করলেন স্যার আশুতোষ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ; প্রফুল্লচন্দ্র রায় হলেন রসায়ন বিভাগের প্রধান 'স্যার তারকনাথ পালিত' অধ্যাপক। পদার্থতত্ত্ব বিভাগের পালিত অধ্যাপক হলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন। এই বিভাগের দ্বিতীয় অধ্যাপক, 'স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের' পদ গ্রহণ করবার জন্যে যাঁর ডাক পড়ল, তাঁর নাম দেবেন্দ্রমোহন বসু। বিজ্ঞানী মহলে ছোট করে ডাঃ ডি. এম. বসু নামেই বেশি পরিচিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থতত্ত্ব শিক্ষা ও গবেষণার যে অপরূপ প্রাধান্য সৌধ নির্মিত হয়েছিল তার অন্যতম স্থপতি হিসেবে দেবেন্দ্রমোহনের নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে।

দেবেন্দ্রমোহনের জন্ম ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার এক অতি বিশিষ্ট পরিবারে। বিখ্যাত দেশনায়ক আনন্দ মোহন বসুর ভাই মোহিনীমোহন ছিলেন দেবেন্দ্রের পিতা। জগদীশচন্দ্র ছিলেন মাতুল। ওঁদের পরিবার ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। দেবেন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় তখনকার দুর্গামোহন ও শিবনাথ শাস্ত্রী পরিচালিত ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে, পরে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দেবেন্দ্র মোহন পদার্থতত্ত্বে M. A. পাশ করলেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। মামা জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী ১৯০৭ সালে বিলেতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Christs' college-এ পড়াশোনা করতে গেলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ের B. Sc. পাশ করলেন পদার্থতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীর Honours সমেত। দেশে ফিরলেন ১৯১৩ সালে আর ১৯১৪ সালে আশুতোষের ডাকে নতুন গড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে 'ঘোষ অধ্যাপক' হিসেবে যোগ দিলেন। Ghose Travelling Fellowship নিয়ে

ঐ বছরেই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও Doctoral ডিগ্রীর জন্যে রওনা হলেন। সেখানে অধ্যাপক Regener এর ল্যাবরেটরিতে ছাত্র হিসেবে যোগ দিলেন। কেম্ব্রিজ থাকার সময়ে উনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন C. T. R. Wilson কে। সেই সময়েই Wilson তাঁর সেই বিখ্যাত কাজ, cloud chamber বা মেঘপ্রকোষ্ঠ তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। ঐ বিখ্যাত যন্ত্রটি পরের প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, তেজস্ক্রিয়তা, কসমিক রশ্মি প্রভৃতি অর্থাৎ যে সমস্ত তেজ বিক্রিয়ার ফলে পদার্থকে আয়নিত করে – তাদের গবেষণায় অপরিহার্য হয়ে ছিল। ঐ যন্ত্রটি আবিষ্কারের জন্যই Wilson নোবেল প্রাইজ পান। দেবেন্দ্রমোহন ছাত্রাবস্থায়ই Wilson-এর কাজকর্ম বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। এখন Regener-এর ল্যাবরেটরিতে নতুন ধরণের cloud chamber তৈরি করে তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ে গবেষণা শুরু করলেন তিনি। তাঁর কাজের বিশেষ বিষয় হল হাইড্রোজেন অণুর সঙ্গে আলফা কণার সংঘাত ও আলফা কণার বিক্ষেপন (scattering)। এ বিষয়ে আশ্চর্য কতকগুলি ফলাফল পেলেন তিনি। ১৯১৪ সালেই বাধল প্রথম মহাযুদ্ধ। ব্রিটিশ প্রজা হিসেবে উনি জার্মানীতে অন্তরীণ হলেন। অন্য যে কয়জন ভারতীয় সে সময়ে ওঁর সঙ্গে অন্তরীণ ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সৌমেন ঠাকুর ও বৈজ্ঞানিক এস, পি, আঘারকার। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কাজে কোনও বাধা সৃষ্টি করা হয়নি। তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী Einstein, Nernst, Pohl, Planck প্রভৃতির বক্তৃতা থেকে পাঠগ্রহণ করতেন। এর অনেক বছর পরে ১৯৭৩ সালে বিজ্ঞানীমহলের নজরে আসে যে দেবেন্দ্রমোহন ১৯১৫-১৬ সালেই cloud chamber-এ সর্বপ্রথম কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার সাক্ষর সংগ্রহ করেন। Rogensburg বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক Thaddeus Trenn, যিনি cloud chamber-এর ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, তিনিই একটি চিঠিতে এ বিষয়ে জানান। সাধারণভাবে Blackett ই এ বিষয়ে পথিকৃৎ বলে মনে করা হত। কিন্তু দেখা গেল এ কৃতিত্ব দেবেন্দ্রমোহনের।

যুদ্ধশেষে বার্লিন থেকে সসম্মান Ph D ডিগ্রী নিয়ে তিনি ফিরে এলেন ১৯১৯ সালে। ঐ বছরেই স্যার নীলরতনের কন্যা নলিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

দেবেন্দ্রমোহন M. Sc. ক্লাসে পড়াতে শুরু করলেন Mechanics ও X-ray; সেই সঙ্গে তিনি গড়ে তুলতে লাগলেন Ghose Professor এর ল্যাবরেটরি। সে সময়ে তাঁর সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ ছিলেন, রমন ব্যতীত, সুশীল কুমার আচার্য, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, ফণী ঘোষ, শিশির মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, যোগেশ মুখোপাধ্যায়, বিধুভূষণ রায় প্রভৃতি। দেবেন্দ্রমোহন কলকাতাতে বসে এদেশের প্রথম cloud chamber তৈরি করলেন ছাত্র সুবোধ ঘোষের সহায়তায়। মাত্র দুবছরের মধ্যে, cloud chamber ব্যবহার করে, আলফা কণার ও হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সংঘাত-বিক্রিয়ার বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর গবেষণাফল প্রকাশ করলেন Nature পত্রিকায়, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতের মাটিতে প্রকৃত নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষণারও সেই শুরু।

দেবেন্দ্রমোহন ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে কাটিয়েছেন প্রখ্যাত J. J. Thomson-এর অধ্যক্ষতার ছায়ায় গবেষণা করে। সুতরাং আয়নিতকরণের শক্তি সম্পন্ন পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় কণার ধর্ম বিচারের কাজে তাঁর আগ্রহ। আবার বার্লিনে যখন তিনি গবেষণা করছেন তখন কোয়াণ্টম তত্ত্বের গড়ে ওঠবার রোমাঞ্চকর সময়। তিনি Planck, Einstein প্রভৃতির কাজের বিষয় তাঁদের খুব কাছ থেকে দেখে শিখেছেন। Einstein হাতে কলমে পরীক্ষা খুব কম কম করেছেন। কিন্তু যে কয়টি করেছিলেন, de Haas-এর সঙ্গে মিলে নতুন ধরণের চৌম্বক তুলা তৈরি করে পরমাণুর চৌম্বকত্ব বিষয়ে অভিনব গবেষণা তার অন্যতম। Bohr এর নির্দিষ্ট করা পরমাণুর মডেলটি (নিউক্লিয়াসের বাইরে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরা ইলেকট্রন সমেত) তখন কোয়াণ্টম তত্ত্বের অন্যতম বিজয়কেতন। পরমাণুর চৌম্বকত্ব কক্ষপথে ঘোরা ইলেকট্রন ও নিজের অক্ষের ওপরে ঘোরার দরুণও বটে। এই নির্দিষ্ট কক্ষের ও নিজ অক্ষে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের গতির হিসেবে কোয়াণ্টম তত্ত্ব প্রয়োগ করা হল। দেবেন্দ্রমোহনও চৌম্বকতত্ত্বে কোয়াণ্টম তত্ত্ব কাজে লাগাবার বিষয়ে উৎসাহিত হয়েছিলেন হয়তো বার্লিনে অবস্থানের সময়েই। এখানে কলকাতায় ঘোষ ল্যাবরেটরিতে চুম্বক তুলা গড়ে নিয়ে বিভিন্ন প্যারাম্যাগনেটিক বস্তুর জটিল লবণের চৌম্বকধর্মিতা বিচারের কাজে লাগিয়ে দিলেন ছাত্রদের। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী কতকগুলি আয়রণ অক্সাইডের চৌম্বকত্ব মাপলেন ও তাদের মধ্যে আয়রণ পরমাণুর ইলেকট্রনের ঘূর্ণন গতি (spin) জনিত gyromagnetic ratio মেপে প্রমাণ করলেন মাত্র একটি বিশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন ঘূর্ণন ভরবেগ (d-electrons) ঐ পদার্থের চৌম্বকত্বের জন্য দায়ী, অন্য কক্ষের ইলেকট্রনের

গতির হিসেবের দরকার হচ্ছে না। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্যারাম্যাগনেটিক, জটিল আয়ন দিয়ে গড়া, যৌগগুলির বিশেষ বিশেষ রং থাকে, যেমন আয়রণ, নিকেল বা ক্রোমিয়াম ঘটিত জটিল লবণ। এদের চৌম্বকত্ব ও রং-এর সাযুজ্য বিষয়ে গবেষণা করবার জন্যে বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্য নেওয়া হল। এ বিষয়ে কাজ করলেন পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পি কে. রাজা। এই ধরনের জটিল প্যারাম্যাগনেটিক লবণের চৌম্বকত্বের তত্ত্ব বিষয়ে দেবেন্দ্রমোহন প্রমাণ করলেন যে জটিল ইলেকট্রন বিন্যাসের দরুন এদের অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন এমন হবে যে এরা প্যারাম্যাগনেটিক না হয়ে ডায়াম্যাগনেটিক বস্তুর ধর্ম পাবে। এটিই বিখ্যাত 'Welo-Bose's Rule'। আবার এ ধরনের প্যারাম্যাগনেটিক যৌগের পরমাণুর চৌম্বক ভরবেগ হিসেব করতে কেবলমাত্র spin (নিজস্ব অক্ষে ঘূর্ণন)-এর হিসেব নিলেই হবে,– নিউক্লিয়াসের বেষ্টনীতে ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূর্ণনের (orbital motion) হিসেব করবারও দরকার নেই। এটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বীয় আবিষ্কার। এটি 'Bose-Stoner'—তত্ত্ব নামে পরিচিত।

দেবেন্দ্রমোহন M. Sc ক্লাসে X-rayও পড়াতেন। X-ray'র ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্রাথমিক এক্স-রে উৎসারণের সময়েই তা সমবর্তিত হয়ে (polarised) নির্গত হয় কিনা,– তা নির্ধারণ করবার জন্যে ছাত্র হরপ্রসাদ দে'কে নির্দেশ দিলেন। Cloud chamber কাজে লাগিয়ে এই দুরূহ পরীক্ষাটি করেছিলেন শ্রীদে। হরপ্রসাদ পরে তাঁর তৈরি cloud chamberকে শক্তিশালী চুম্বকের মেরুখন্ড দুটির মধ্যে রেখে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মেসোথোরিয়াম নির্গত গামারশ্মির বিক্ষেপন জাত আয়ন পরীক্ষা করছিলেন। বিসমাথের সঙ্গে সংঘাতে গামারশ্মি ইলেকট্রন পজিট্রন জুটিতে পরিবর্তিত হল। শ্রীদে তাঁর stereographic ক্যামেরায় এর ছবি তুললেন। চমৎকার ছবিতে দেখা গেল কণাদুটি বিপরীত চার্জের ও সম্পূর্ণ সমান ভরবেগ সম্পন্ন। কাজটি অতি উঁচুদরের (১৯৩৫)।

রামন ১৯৩৪ সালে বাঙ্গালোর চলে গেলেন। দেবেন্দ্রমোহন তখন 'পালিত অধ্যাপক' ও বিভাগীয় প্রধান হলেন। এ সময়ে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রাজা, পূর্ণ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, হরপ্রসাদ দে, কৃষ্ণপদ ঘোষ প্রভৃতি কাজ করছিলেন চৌম্বকত্ব, বর্ণালী-বীক্ষণ, তেজস্ক্রিয়তা, এক্স-রে প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে। এর কিছু আগে, ১৯২৭ সালে দেবেন্দ্রমোহন আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন ইতালীর কোমো শহরে, Volta-শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দিতে। এদেশ থেকে আর গিয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা। ঐ বছরই দেবেন্দ্রমোহন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ বিদ্যা শাখার সভাপতি হয়েছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগ প্রথম শ্রেণীর পঠন-পাঠন ও গবেষণার অন্যতম কেন্দ্রস্থল হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত হয়েছিল। ফলিত বিজ্ঞান তার অন্যতম বিষয়। দেবেন্দ্রমোহন ও তাঁর গবেষক ছাত্রমন্ডলীর নিরলস চেষ্টাতেই তার কিছুটা সম্ভব হয়েছিল।

নীলস্ বোর ও দেবেন্দ্রমোহন বসু

১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে আচার্য জগদীশচন্দ্র বিগত হলেন। তখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত, এদেশের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিজ্ঞানমন্দির, 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' (Bose Institute) পরিচালনার ভার নেবার জন্যে দেবেন্দ্রমোহনের ডাক পড়ল। তিনি পালিত অধ্যাপকের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিলেন। তাঁর জায়গায় পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে এলাহাবাদ থেকে চলে এলেন মেঘনাদ সাহা। বিজ্ঞান কলেজ থেকে তাঁর তখনকার ছাত্রমন্ডলীর অন্ততঃ দুজন ছাত্র, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় ও ও মৃগাঙ্কশেখর সিংহ দেবেন্দ্রমোহনের সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দিলেন। শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা করছিলেন ; তাঁর প্রধান যন্ত্র ছিল আয়নন কক্ষ বা ionisation chamber

এবং মৃগাঙ্ক সিংহ cloud chamber নিয়ে কসমিক রশ্মির গবেষণা শুরু করলেন।

কস্‌মিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা দেবেন্দ্রমোহন আগেই শুরু করেছিলেন। বস্তুতঃ মাতুল জগদীশ চন্দ্রের উৎসাহে দার্জিলিং এ (৭০০ ফুট উচ্চতায়) বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষের বাংলো 'মায়াপুরী'-সংলগ্ন একটি High Altitude ল্যাবরেটরির দেবেন্দ্রমোহন আগেই পরিকল্পনা করেছিলেন। সেখানে গাইগার কাউন্টার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত cloud chamber বসিয়েছিলেন। পরে সেখানে গাইগার কাউন্টার টেলিস্কোপ' বসিয়ে 'IGY-বর্ষ" (International Geophysical Year) উদ্‌যাপনের আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে কস্‌মিক রশ্মির অন্তর্গত নিউট্রনের প্রাবল্য বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে (শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দ্রলাল চক্রবর্তী, ১৯৫৬-১৯৫৮)।

১৯৩৮ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে এসেছিলেন Walter Botha; তাঁর ছাত্র H. J. Taylor এখানে পেপার পড়েন;—ফটোগ্রাফের প্লেটে মাখানো রাসায়নিক 'অপদ্রব' (emulsion)-টিতে কস্‌মিক রশ্মি সংঘাতে যে বিক্রিয়া ঘটায়, প্লেটটি ডেভেলপ করে বিক্রিয়াজাত আয়নের সূক্ষ্ম চিহ্ন পাওয়া যায় তার ফলে। মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলে সেই আয়নের চিহ্ন থেকে বিক্রিয়াকারী কস্‌মিক রশ্মির অন্তর্গত বিভিন্ন কণা বা তেজ চিহ্নিত করা সম্ভব—যেমন cloud chamber ব্যবহারে করা যায়। এই emulsion এর মতো এ 'তাৎক্ষনিক' ক্রিয়ার রেকর্ড নয়, পরন্তু এ যেন সর্বদা-ক্রিয়াশীল একটি 'ডিটেকটর' (detector) যন্ত্র। দেবেন্দ্রমোহন Botha-র সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। ১৯৩৯ সালেই Ilford কোম্পানীর হাফটোন-প্লেট দার্জিলিং-এ ৭০০০ ফুট উচ্চতায় কস্‌মিক রশ্মির exposure-এ রেখে দেওয়া হল। পরে ডেভেলপ করে, মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে, বিক্রিয়াজাত আয়ন ও ইলেকট্রনের চিহ্ন দেখে, তাদের মাপজোক করে দেবেন্দ্রমোহন ও ছাত্রী বিভা চৌধুরী কসমিক রশ্মিতে এমন একটি কণার সন্ধান পেলেন যার ভর প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভরের মধ্যবর্তী—বস্তুতঃ দেবেন্দ্রমোহন ওদের ভর মাপবার একটি তত্ত্বীয় উপায় আবিষ্কার করলেন আর সেই উপায়ে মেপে পেলেন যে কণাগুলির ভর ইলেকট্রনের ভরের ২১২ গুণ! এ কাজ তাঁরা করলেন ১৯৪১ সালে। Nature এ পেপার ছাপা হল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে এদেশে ফটোগ্রাফের প্লেট পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের গবেষণায় ছেদ পড়ল। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Powell ১৯৪৫-৪৮ সালে ফটোগ্রাফের প্লেটে ঐ প্রোটন-ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী ভরের দুটি কণার অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন বলে জানালেন। নাম দেওয়া হল মেসন কণা। কণাগুলির ভর জানবার জন্যে তিনি দেবেন্দ্রমোহনের দেখান তত্ত্বীয় উপায়েরই সাহায্য নিয়েছিলেন। Powell মেসন-কণা আবিষ্কারের গৌরব ও নোবেল প্রাইজ পেলেন। বিজ্ঞানীসমাজ ভুলে গেল যে Powell এর অন্ততঃ পাঁচ বছর আগেই দেবেন্দ্রমোহন ও বিভা চৌধুরী মেসন আবিষ্কার করেছিলেন। Powell এর সঙ্গে অন্ততঃ ভাগাভাগি করে নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত ছিল বসু ও চৌধুরীর। কিন্তু তা হয়নি।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালনা ভার নেবার পর তিনি বিজ্ঞান মন্দিরকে ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করলেন। কাউন্সিল ও গভর্নিংবডির দায়িত্ব নতুন করে বিধিবদ্ধ করা হল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা, পাবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা হল। Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) ও Ministry of Education অনুদানের ব্যবস্থা করলেন। Atomic Energy Commission গঠিত হল। প্রথম থেকেই দেবেন্দ্রমোহন কমিশনের সভ্য। অন্য সভ্যদের মধ্যে হোমি ভাবা, মেঘনাদ সাহা, কৃষ্ণাণ প্রভৃতি। CSIR টাকা দিল উচ্চশক্তির আলট্রাসোনিক জেনারেটর তৈরি করার জন্যে। AEC টাকা দিল উচ্চ ক্ষমতার ১৪ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের নিউট্রন জেনারেটর যন্ত্র তৈরীর জন্যে। এইভাবে গড়ে উঠল আধুনিক Radiation Physics ল্যাবরেটরি। কস্‌মিক রে, রেডিওঅ্যাকটিভিটি, নিউট্রন ফিজিক্স, Solid ও Liquid State গবেষণার ল্যাবরেটরি; 'কার্বন -১৪ ডেটিং' যন্ত্র তৈরির প্রয়াস হল,—Counter current apparatus, Tisselius যন্ত্র, প্রভৃতির নির্মাণ কাজ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের যন্ত্রাগার বা Workshop হাতে নিল। নিউট্রন-জেনারেটর তৈরি হল।

দেবেন্দ্রমোহন স্থির করলেন, তিনি যখন জগদীশ চন্দ্রের উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করেছেন, তখন জগদীশ চন্দ্রের গবেষণার বিষয়বস্তু তাঁকে বুঝতে হবে। জগদীশ চন্দ্রের কাজের ধারাকে এগিয়েও নিয়ে যেতে হবে। তিনি গভীর অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন; তার ফলশ্রুতি হল "J. C. Bose's Plant Physiological Investigations in

Relation to Modern Biological Knowledge" নামের বই (১৯৪৭-৪৮)। জড় ও প্রাণীর সাড়ার সমতা বিষয়ের কাজগুলি আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ব্যর্থহীনভাবে করবার অভিনব কার্যধারা চালু করলেন তিনি জগদীশ চন্দ্রের দুই ছাত্র আশুতোষ গুহঠাকুরতা ও বিনয়কৃষ্ণ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে। সেই সঙ্গে বোটানি বিভাগের কাজের সুবিধের জন্যে আধুনিক চিন্তাধারার প্রবর্তন ও আধুনিক যন্ত্র আমদানী করলেন তিনি। যে সব উদ্ভিদ যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে সাড়া দেয়,—যেমন লজ্জাবতী লতা,—তাদের উত্তেজনার শক্তি কোন অংশে কি ভাবে জমা খরচ হয় তা জানবার কাজে মূল্যবান গবেষণা তিনি করেছেন (মৃত্যুর মাত্র কিছুকাল আগে, ১৯৭৩ সালেও Science & Culture পত্রিকায় তাঁর পেপার বেরিয়েছে)। বিভিন্ন রকমের তেজ (radiation) ব্যবহার করে বীজের পরিব্যক্তি বা mutation-সাধন বসুবিজ্ঞান মন্দিরেই শুরু হয়। ভারতের অন্যান্য ল্যাবরেটরিতে এ বিষয়ে কাজ পরে শুরু হয়, যেমন Indian Agricultural Research Institute এ বা Atomic Energy Establishment-এ। পাট, ধান, তৈলবীজ প্রভৃতির প্রজাতির উন্নতি করা সম্ভব হয়।

পদার্থবিদ্যা বিভাগে তাঁর পরিচালনায় অনেক নতুন কাজ হয়েছে। নিউক্লিয়াসের স্বতঃবিভাজন (Spontaneous fission) প্রথম দেখেন শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়। মৃগাঙ্ক সিংহ বৃহৎকায় cloud chamber তৈরি করে কস্‌মিক রশ্মি পর্যবেক্ষণে নতুন কণার সন্ধান পান—সেটি ইলেকট্রন ভরের ৫০০ গুণ ভারি। নিউট্রন ফিজিক্সে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করলেন আনন্দমোহন ঘোষ ও নৃপেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ১৪ মিলিয়ন ভোল্ট শক্তির নিউট্রনের উৎস, 'নিউট্রন জেনারেটর' যন্ত্র তৈরী শুরু ও সাফল্যের সঙ্গে শেষ করেন যথাক্রমে অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমলেন্দু মিত্র। Liquid State-এর উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন (আলট্রাসোনিক্‌স্‌ ব্যবহার করে) তারিণীচরণ ভদ্র। তরল ধাতু পরস্পরের সংস্পর্শে রেখে দিলে কিভাবে তাদের মলিকিউলগুলি ব্যাপনক্রিয়ার মাধ্যমে (diffusion) পরস্পরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সে বিষয়ে তেজস্ক্রিয়-tracer ব্যবহার করে বিশেষ ধরনের গবেষণা করেন অমলেন্দু নাথ, যে কাজ breeder reactor-কে ঠাণ্ডা করবার জন্যে তরল সোডিয়াম ব্যবহারের প্রযুক্তির সবদিক খতিয়ে দেখবার কাজে ব্যবহার হয়েছে।

দেবেন্দ্রমোহন বিজ্ঞানের সব কয়টি বিভাগেরই উন্নতির জন্যে কিছু না কিছু করেছেন। তাঁর পরিচালনায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে 'মাইক্রোবায়োলজি' (অণু-জীববিদ্যা) বিভাগ চালু হল,—মাইক্রোবায়োলজির কাজের গুরুত্ব

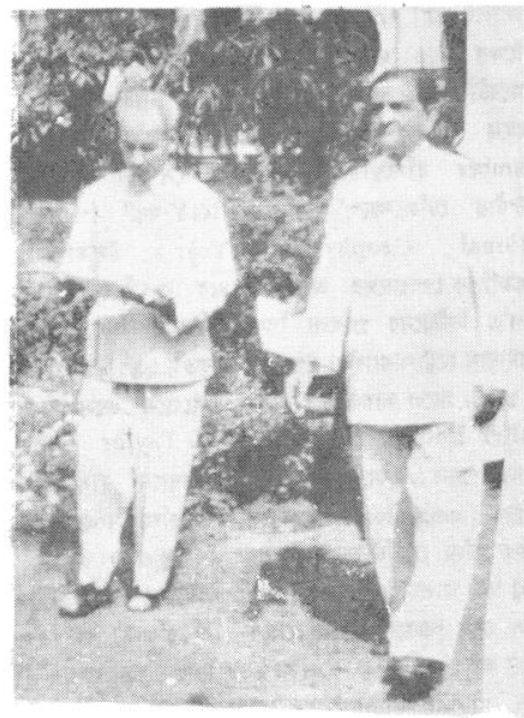

ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম বুঝতে পারেন, সেজন্যই ভারতে প্রথম পৃথক মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের পত্তন করেন। রসায়ন বিভাগে প্রোটিন কেমিস্ট্রির উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। Plant Chemistry বিভাগ আধুনিক উপায়ে নানা ভেষজ উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন রসায়ন তৈরি করেছে। দেবেন্দ্রমোহনের দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের (১৯৩৭—১৯৬৭) অধ্যক্ষতার সময়েই বসু বিজ্ঞান মন্দির ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান গবেষণাগার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

দেবেন্দ্রমোহনের সঙ্গে বিশ্বভারতীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শিশুকাল থেকেই দেবেন্দ্রমোহনকে স্নেহ করে এসেছেন। তিনি পরিণত বয়সে দেবেন্দ্রমোহনের বিবিধ বিষয়ের বিচার ক্ষমতার উপরে নানা ভাবে নির্ভর করতেন। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত দেবেন্দ্র বিশ্বভারতীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৫৩

সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হন তিনি। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬১-তে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে। মেঘনাদ সাহা ও প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে তিনি Indian Science News Association গড়লেন ১৯৩৫ সালে – এখান থেকেই ঐতিহ্যসম্পন্ন Science and Culture পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল – তাঁরা পরস্পরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, যদিও দেবেন্দ্রমোহন মেঘনাদ সাহার চেয়ে প্রায় বছর দশেকের বড় ছিলেন।

দেবেন্দ্রমোহন কখনই সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতেন না। ব্যক্তির বিজ্ঞাপনের তিনি বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখেছি (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র শতবার্ষিকীর সময়ে) জহরলাল নেহেরু, বিধানচন্দ্র রায়, হুমায়ুন কবীর প্রভৃতি মানুষেরা দেবেন্দ্রমোহনকে কি অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ দেবেন্দ্রমোহনের আহ্বানে সানন্দে জগদীশ শতবার্ষিকী স্মারক বক্তৃতা দিতে বসু বিজ্ঞানমন্দিরে এসেছিলেন। Niels Bohr, Alexander Oparin, Georgy Gamow, Arthur Compton, J.D. Bernal, P. M.S. Blackett, Irene Curie Joliot, B. L. Horecker প্রভৃতি বহু নামকরা ও নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহনের ডাকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এসেছেন। বহু রাষ্ট্রনায়কও, যেমন Breznev, Ho Chi Minh প্রভৃতিও এসেছেন।

'বিজ্ঞানের ইতিহাস' রচনার যে প্রয়াস এশিয়াটিক সোসাইটি শুরু করে, শেষ জীবনেও দেবেন্দ্রমোহন তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। সমরেন্দ্রনাথ সেন ও সুব্বারায়াপ্পা সংকলিত 'A Concise History of Science in India' গ্রন্থের তিনি প্রধান সম্পাদক।

দেবেন্দ্রমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে। অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত 'নারী শিক্ষা সমিতির'ও তিনি পরিচালক ছিলেন। সিটি কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ছিলেন তিনি।

তাঁর দেহান্ত হয় ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন।

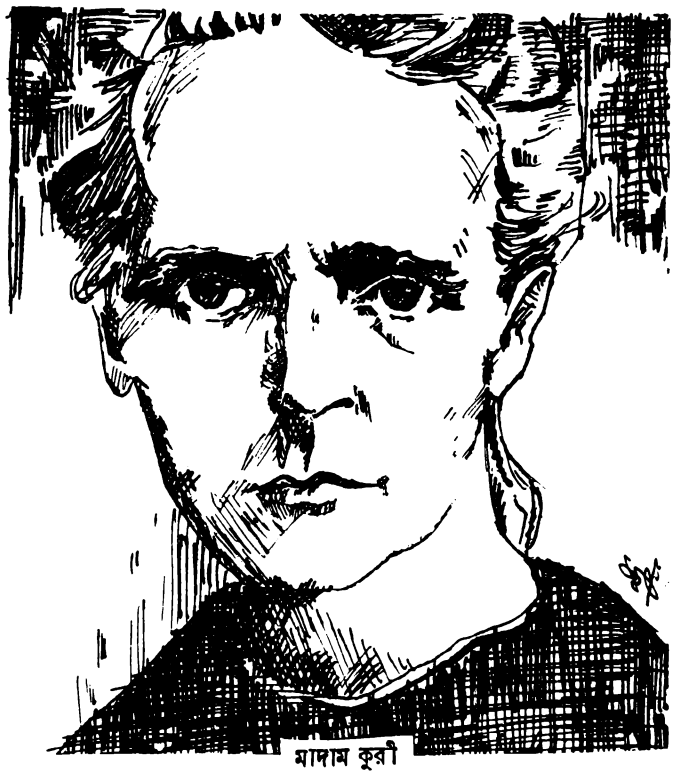

মাদাম কুরী

চন্দন দাশগুপ্ত

পাঁচ লাইনের পাঁচ পাঁচালি

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

বিখ্যাত গবেষক নাম রাও গুন্ডু !
বলে জোরে, শোন্ ওরে কানাকড়ি কুন্ডু !!
দিন-রাত হো-হো ক'রে
চাঁদ ঘোরে, গ্রহ ঘোরে
তারও চেয়ে ঘোরে জোরে মানুষের মুন্ডু !!!

নামকরা বিজ্ঞানী বাড়ি যার কালনায় !
তরকারি রেঁধে রোদে বেঁধে রাখে আলনায় !!
বলে, এই বেসিসে
ফোটো-সিনথেসিসে
'ফুড-ভ্যালু' বেড়ে যায় এঁচড়ের ডালনায় !!!

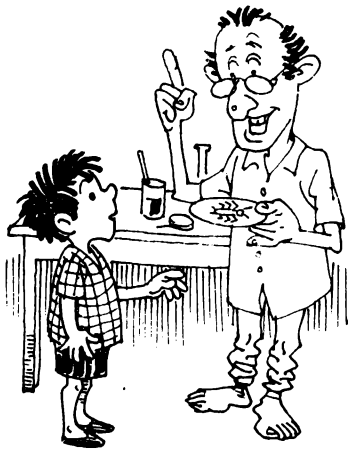

আরও এক গবেষক বাড়ি যার খড়দা !
শঙ্কুর ছোটকাকা, বঙ্কুর বড়দা !!
গবেষণা সেরে শেষে
কাছে এসে বলে হেসে
পটল তুলবে খেলে খৈনি ও জরদা !!!

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী চঞ্চল চন্দ !
পোকা ধ রে ভালো ক'রে দ্যাখে শুঁকে গন্ধ !!
বলে, এইভাবে ভাই
দোষ-গুণ খুঁজে পাই
সহজেই বুঝি তাই কারা ভালো-মন্দ !!!

আরও এক বিজ্ঞানী নাম তার রাম রায় !
ভাবে ব'সে, কি তফাৎ আমে আর আমড়ায় !!
গবেষণা শেষ ক'রে
বলে হেসে বেশ জোরে
ও দুটোর একই গুণ খেলে পেট কামড়ায় !!!

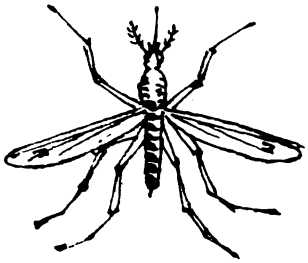

মশা থেকে রোগ

নিমাই দত্তগুপ্ত

এই সুন্দর পৃথিবীতে প্রকৃতি ও বিবর্তনের পরিণতিতে অনেক প্রকারের প্রাণী ও পতঙ্গের জন্ম হয়। তার ফলে যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পায় তেমনি তাদের আক্রমণে মানুষ নানা রোগেও আক্রান্ত হয়। যে সমস্ত রোগে মানুষ সচরাচর আক্রান্ত হয় তার অন্যতম হল ভাইরাস, জীবাণু ও পরজীবী ঘটিত রোগ আর এই রোগগুলি বিস্তারে পতঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এমনই একটি পতঙ্গ হলো - মশা। কি ঠিক বলছি? পড়ার সময় খাবার সময়, আড্ডা মারার সময়, একাগ্রচিত্তে শোনা ভাবা ইত্যাদির সময় মশার কামরে বিরক্তি হইনি, এমন কেউ আমরা আছি কি?

মশা একটি প্রাচীন পতঙ্গ। মোটামুটি ভাবে কোটি বছর আগে মশার আবির্ভাব। প্রকৃতির নানা পরিবর্তনের সায়ে তাল রেখে আজও বিশ্বে মশা বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে, বংশ বৃদ্ধি করছে এবং রোগ বিস্তার করছে। মশক বাহিত রোগগুলির অন্যতম হলো ম্যালেরিয়া, এনকেফেলাইটিস, ডেঙ্গু এবং পীতজ্বর। এর মধ্যে ম্যালেরিয়া একটি প্রাচীন রোগ। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ এর আক্রমণে মৃত্যু বরণ করেছে। ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব ঘটে প্রথমে আফ্রিকা মহাদেশে। তারপর ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল হয়ে ভারতবর্ষ এবং ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দেশেও একদা লক্ষ লক্ষ মানুষ ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যু বরণ করেছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকটি দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল হলেও ভারত সহ অনুন্নত দেশগুলির ফি বছরের ব্যাধি। এর অন্যতম প্রধান কারণ ভারতের মানুষ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অসম বিকাশের পরিণতি ভোগ করছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৪২ বছর। সাতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়েছে এবং তা রূপায়নে কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও বহু ছোট ছোট পীড়াদায়ক অবস্থা আজও আমাদের ভোগ করতে হয়।

আমরা আমাদের সামর্থের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারি—মশা ও মশকবাহিত রোগ হল তার অন্যতম। অথচ মশা ও মশকবাহিত রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদের কোন ধারাবাহিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী নেই। বিজ্ঞান বলে - ছোট ছোট কাজ সুষ্ঠ ভাবে

সমাধা করতে না পারলে বৃহত্তর কাজ সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করা যায় না। তাছাড়া ১৯৭৮ সালে সোবিয়েতের আলমা-আটা শহরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সিদ্ধান্ত ছিল ২০০ সালের মধ্যে সকলের জন্যে স্বাস্থ্য। আমাদের দেশের সরকারও এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু যে হারে মশা বাড়ছে তাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে আমরাও ঐ ঘোষণার বাস্তবায়ন করতে পারব না, যদি না সময় মত মশা প্রতিরোধ ও দমনে বিজ্ঞান সম্মত গণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারি।

মশা ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও দমন সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হলে প্রথমেই মশা ও তার জীবন চরিত্র জানতে হবে, যাতে তোমরাও এই কাজে সহযোগী হতে পার। মনে রেখ সমাজের প্রত্যেক মানুষ সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অন্যদের উপর নির্ভর করেন। পরিবেশ যদি অস্বাস্থ্যকর হয় তবে নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য বিপন্ন হতে বাধ্য। কাজেই নিজের স্বাস্থ্য ও পরিবারের স্বাস্থ্যের সাথে জন স্বাস্থ্যের সম্পর্কটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

মশা একটি পতঙ্গ। এর গতিবিধি আশ্চর্যজনক। সমুদ্র তলের ১৪০০ ফুট উপরে এবং খনিগর্ভের ৪০০০ ফুট নিচে এদের দেখতে পাওয়া যায়। মশার দেহ তিনভাগে বিভক্ত : মাথা বুক এবং পেট। মাথার সামনেই রয়েছে রক্ত রস পানের উপযোগী শুঁড় বা প্রোবোসিস। বুকের দুপাশে দুটি পাখনা ও তিন জোড়া পা, পেটটি নয়-দশ খন্ডে বিভক্ত মশা প্রধানত তিন প্রকার : কিউলেক্স, অ্যানোফিলিস্ ও ইডিস। এদের জীবন চক্রে চারটি অবস্থা দেখা যায়—ডিম লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ মশা। তিন প্রকার মশার মধ্যে কিছু চারিত্রিক পার্থক্য থাকলেও জীবন চক্র মোটামুটি এক। জীবনচক্রের প্রতিটি অবস্থাতেই আত্মরক্ষার নানা পদ্ধতি অবলম্বনে বেশ তৎপর। মশার পরমায়ু একমাসেরও কম কিন্তু তাহলে কি হবে একটি স্ত্রী কিউলেক্স মশা একেবারে ১০০ -৫০০ ডিম পাড়ে। এই সংখ্যাই এদের বংশ বৃদ্ধির বিপুল ক্ষমতার পরিচায়ক। স্ত্রী মশা সাধারণত বদ্ধ নোংরা জলা জায়গায় ডিম পাড়ে। প্রথমেই এই ডিমগুলি থাকে সাদা দানার মত, পড়ে কিছুটা কালো হয় এবং ২-৩ দিনের মধ্যেই ডিম পরিণত হয় লার্ভায়। লার্ভাগুলি বেশ চটপটে, জল শ্যাওলা ও জৈব আবর্জনা খেয়ে বেঁচে থাকে। পাঁচদিন পর লার্ভা পরিণত হয় পিউপাতে। পিউপা খাবার না খেলেও সাঁতার কাটতে বেশ পটু এবং ডুব দিতে পারে। এরা ২৪-৪৮ ঘণ্টায় পূর্ণাঙ্গ মশায় রূপান্তরিত হয়।

মশা মূলতঃ অন্ধকারের পতঙ্গ। দিনের বেলায় ঘরের কোণে, দেওয়ালের ফাটলে, গাছের কোটরে, খাটাল, স্যাঁত সেতে মাটিতে, পচা জলে, ডোবা, কৃত্রিম ঝর্ণা, নর্দমা এবং বদ্ধ জলাশয়ে অবস্থান করে। বর্তমানে বিশ্বে ৪০০ প্রজাতির অ্যানোফিলিস্ মশা দেখা যায়, তার মধ্যে ৬০টি প্রজাতি ম্যালেরিয়ার অনুজীব বহন করে। ভারতে ম্যালেরিয়া বাহক হিসাবে বেশী দেখা যায় অ্যানোফিলিস্ স্টিফেন্সাই, অ্যানোফিলিস্ কিউলিসিফেসিস এবং অ্যানোফিলিস্ কুডিয়াটিলিস্। পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়া ছড়ায় অ্যানোফিলিস্ সানডাইকাস্, অ্যানোফিলিস্ ফিলিপিনেনসিস এবং অ্যানোফিলিস মিনিমাস। তাছাড়া

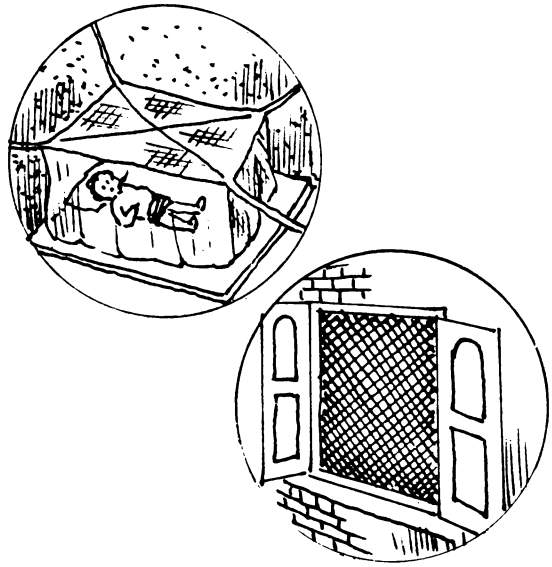

শহরাঞ্চলে অ্যানোফিলিস্ স্টিফেন্সাই ম্যালেরিয়ার প্রধান বাহক। এরা নোনা জল ও জলা ভূমিতে ডিম পাড়লেও সূর্যালোক পছন্দ করে। এদের স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে। একমাত্র স্ত্রী মশাই রক্ত পানের উদ্দেশ্যে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ও ঘর বাড়ীতে ঢোকে। শারীরিক পুষ্টি নয়, ডিম বৃদ্ধির জন্যই রক্ত পান করে। অন্যথায় শাক-সবজির রসপান করেই এরা বেঁচে থাকতে পারে। মানুষের গন্ধ ও উষ্ণতার জন্য মশা আকৃষ্ট হয়। এবং প্রতিটি মশা একবারে প্রায় ০·৩—০·৮ মিলিলিটার রক্ত চুষতে পারে।

ভারতবর্ষে পীতজ্বর না হলেও ম্যালেরিয়া, গোদ, এনকেফেলাইটিস, ডেঙ্গু রোগ হয় এবং কখনো কখনো

ব্যাপকাকারে দেখা যায়। রোগের চিকিৎসা যেমন করতে হবে তেমনি মশা ধ্বংসও করতে হবে। শুধুমাত্র নিজের ঘর-বাড়ী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার রাখলেই কিন্তু মশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না কারণ মশা বাতাসে ও অন্যান্য মাধ্যমের সাহায্যে বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারে। ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত যে সমস্ত রোগে বেশী প্রাণহানি হয়েছে ম্যালেরিয়া তার অন্যতম। এ দেশে দু প্রকারের ম্যালেরিয়া অনুজীব পাওয়া যায়। শতকরা ৮৫ ভাগ রোগীর দেহে পাওয়া যায় প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্স এবং ১৫ ভাগ রোগীর দেহে পাওয়া যায় প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম। যদিও প্রথমটির শতকরা হার বেশী কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয়টি অনেক বেশী ক্ষতিকর। এরাই জীবনহানির প্রধান কারণ।

ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত কোন মানুষের রক্তপান কালে স্ত্রী অ্যানোফিলিস্ মশার লালাগ্রন্থিতে ঐ অনুজীব প্রবেশ করে। এরপর বাহক মশাটি অন্য কোন সুস্থ মানুষকে কামড়ালে মশার শুঁড় বা প্রোবোসিস দিয়ে লালাসহ ঐ অনুজীবটি মানব রক্তে প্রবেশ করে। কামড়ানোর সাতদিন থেকে ত্রিশদিন পর জ্বর আরম্ভ হয়। কখনো কখনো প্রবল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, শ্বাস ও নাড়ীর গতি দ্রুততর হয়, শীত অনুভব হয়, শরীর কাঁপতে থাকে, দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হয় এবং অনেক সময় খিঁচুনিও দেখা দেয়। এরপর গরম অবস্থা, মাথা ব্যথা, জলতেষ্টা পেতে থাকে। ২ থেকে ৪ ঘণ্টা পর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়।

পূর্বেই বলেছি মশা ম্যালেরিয়া ছাড়াও ফাইলেরিয়া, এনকেফেলাইটিস, ডেঙ্গু এবং পীতজ্বর ছড়ায়। এই রোগগুলি ম্যালেরিয়ার মত মারাত্মক না হলেও মানুষ কষ্ট ভোগ করে। ফাইলেরিয়া রোগ বিস্তার করে কিউলেক্স মশা। এ রোগও আমাদের দেশে বাড়ছে। স্ত্রী কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়া রোগীকে কামড়ানোর পর মাইক্রো-ফাইলেরিয়া মশার পাকস্থলীতে যায়। তারপর তা রূপান্তর হয় এবং পরিশেষে ফাইলেরিফর্ম লার্ভা সৃষ্টি হয়। এই মশা মানুষকে কামড়ালে রোগ সংক্রামিত হয়। ফাইলেরিয়া সাধারণত পায়ে বেশী হয় এবং এ রোগ থেকে কারো কারো গোদ হয়। ১৫ বছর বয়সের আগে সাধারণতঃ ফাইলেরিয়া হয় না। ফাইলেরিয়া হলেও জ্বর হয়। মশা অনেক ভাইরাস ঘটিত রোগ ছড়ায়। কিউলেক্স বিশ্রুয়াই ও কিউলেক্স ট্রাইটিনিওরাহিনকাস মশা এনকেফেলাইটিস রোগ বিস্তার করে। শূকর, গরু, অনেক সময় হাঁস, মোরগের মধ্যে এই রোগ থাকে। মশা এই রোগগ্রস্থ প্রাণীর রক্ত পান করে মানুষের মধ্যে রোগ বিস্তার করে। এনকেফেলাটিস সাধারণতঃ আগস্ট মাসে শুরু হয় এবং অক্টোবরে বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গে সব বয়সের লোকের এই রোগ হয়। ইডিস ইজিপ্টাই নামক একপ্রকার মশা ডেঙ্গু রোগ ছড়ায়। ডেঙ্গু রোগীকে কামড়ানোর পর যে কোন সুস্থ মানুষকে কামড়ালে সাধারণত ডেঙ্গু রোগ হয়। এই রোগ হলে ম্যালেরিয়ার মত কাঁপুনী দিয়ে জ্বর আসে। মাথার সামনের দিকে, চোখের পিছনে ও পিঠে থাকে প্রচণ্ড ব্যাথা। সেই জন্য ডেঙ্গু জ্বরকে কেহ কেহ হাড় মুড়মুড়ি জ্বর বলে। এই রোগের অন্যান্য উপসর্গ হলো বমিবমি ভাব, পায়খানা পরিষ্কার না হওয়া ইত্যাদি। অসুখের ছয় দিনের মাথায় চামড়ায় গুটি গুটি দাগ দেখা দেয়। তবে আশার বিষয় হলো, নয় দশ দিনের মধ্যে এমনিতেই রোগ সেরে যায়। প্রথমেই তোমরা জেনেছ—আমাদের দেশে পীতজ্বর হয় না। পীতজ্বর হলো ইডিস ইজিপ্টাই মশকবাহিত রোগ। আফ্রিকা মহাদেশে ছাড়াও আমেরিকায় পীতজ্বর হয়। রোগ হওয়ার কিছুকাল পরে সাধারণতঃ রোগী মারা

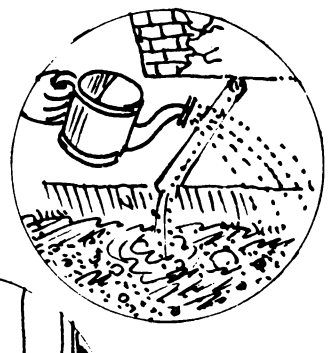

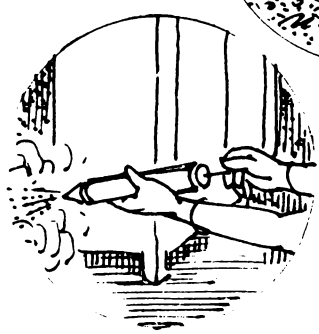

যায়। তোমরা লক্ষ করেছ জ্বর কোন রোগ নয় কিন্তু প্রায় সব রোগেই জ্বর হয় অর্থাৎ জ্বর হলো রোগ লক্ষণ। সুতরাং যে কোন রোগে আক্রান্ত হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই হলো বিজ্ঞান সম্মত উপায়।

জন স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মশা ও মশকবাহিত রোগ আমাদের দেশে আজও একটি বড় সমস্যা। এ সমস্যা দূরীকরণে দরকার : মশা ধ্বংস করা, মশার জন্মহার বৃদ্ধি

কমানো এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। আর এ কাজ সরকার, পৌরসভা, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী, চিকিৎসক, ছাত্র যুব কিশোর কিশোরী ও জনসাধারণের মিলিত প্রচেষ্টাতেই সমাধা করা সম্ভব। বর্তমানে যে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা হল :—

১। সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা।

২) ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করা। এই মশারীতে যাতে প্রতি বর্গফুটে ১৫০টি জালি থাকে ও ছেঁড়া না হয় তা দেখতে হবে।

৩। মশা তাড়ানোর ধূপ ও ঔষধ ব্যবহার করা। মশা মারার ঔষধ হিসাবে ডাই-ইথাইল-টুলমিড (অ্যাল-কোহল ৫০ শতাংশ দ্রবণ) ব্যবহার করা। এই দ্রবন ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এছাড়া মশা মারতে হেক্সাক্লোরোসাইকোহেক্সেন, ডাই-অলড্রিন, প্যারাথিয়ন, ম্যালাথিয়ন প্রোপকসুর, ফেনানাইট্রোথিয়ন প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। বাড়ীতে এ জাতীয় পদার্থ স্প্রে করার কালে ঘরের আসবাবপত্র ও কোণগুলি নাড়িয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে ৫ মিনিট ধরে ঔষধ স্প্রে করতে হবে। এর ৩০ মিনিট পর দরজা-জানালা খুলে দিতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে ঔষধ যেন চোখে-মুখে, খাবারে এবং পানীয় জলে না মেশে। স্প্রে করার পর সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে।

৪। মশা প্রতিরোধ করার অন্যান্য দিকগুলি হল বন্ধ ও নোংরা ভর্তি করা, পুকুর আবর্জনা মুক্ত রাখা, খালগুলি সোজা ও গভীর করা, জলাভূমিতে গাপ্পী ও তেলাপিয়া জাতীয় মাছ চাষ করা, নর্দমা পরিষ্কার রাখা, শহরের খাটালগুলি তুলে দেওয়া ও মশা জন্মানোর স্থান-গুলিতে ঔষধ স্প্রে করা।

লেখাটি পড়ে তোমরা বুঝতে পারছ, মশা ও মশক বাহিত রোগ নিবারণের প্রধান দিক হলো মশা প্রতিরোধ ও ধ্বংস করা। প্রতিরোধের দুইটি দিক আছে। একটি গৃহপ্রতিরোধ। অপরটি হলো সকলে মিলে বহির্প্রতিরোধ। প্রথমটি তো প্রতিটি পরিবারই করতে পারেন। দ্বিতীয়টির জন্য প্রয়োজন সমবেত প্রচেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কলিকাতা জেলা কমিটি এই সমস্যা সম্পর্কে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আশা করছি অন্যান্য জেলা কমিটিও বিষয়টি সম্পর্কে উদ্যোগ নেবে। এই অবস্থায় গৃহ প্রতিরোধ যদি তোমরা শুরু কর তাহলে আমাদের লক্ষ্য সফল হতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তোমরা অনেকেই জান। ১৮৯৮ সালে স্যার রোনাল্ড রস মশা কি ভাবে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় এবং এর প্রতিরোধের তথ্য আবিষ্কার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৯৮ সালে তার শতবর্ষপূর্ণ হবে। তার মধ্যে যদি মশা ও মশক বাহিত রোগ দূর হয় তাহলে তার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে তেমনি জনস্বাস্থ্যেরও একটি দিক সফল হবে।

উদ্ভট প্রশ্ন

সৌমিত্র চৌধুরী

আমার মাথায় অনেক উদ্ভট প্রশ্ন আসে। ক্লাসের বন্ধুরা মজা পায় আমি যখন এধরণের প্রশ্ন করি। অবশ্য প্রশ্নগুলো আমি এমনি এমনি করিনা। ওগুলো সত্যিই আমার মাথার মধ্যে ভুরভুরি কাটে। কখন অজান্তেই মুখ ফসকে বেড়িয়ে পড়ে। কেউ হাসে, কেউ বলে তোর মাথায় এ সব প্রশ্ন আসে কি করে রে ?

সেবার মামার বাড়ী গেছি। মেদিনীপুর। মায়ের সাথে বেড়াচ্ছি। বিকেলবেলা। গ্রামের চারদিকে উঁচু উঁচু নারকেলগাছ। ওগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা প্রশ্ন গজাল মাথায়। বললাম, মা, এই নারকেলগাছটা কত উঁচু হবে ?

আমি বললাম, আচ্ছা, চল্লিশফুট উপরে ডাবের ভিতর জল ঢোকে কেমন করে ?

মা গম্ভীর হয়ে বললেন, না ঢুকবার কী আছে ?

আমি বললাম, বা-রে তুমি তো সেদিন পড়ালে "সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জল কখনই বত্রিশ ফুটের উপর উঠিতে পারে না।" আমি বই এর কথাগুলো মুখস্ত বললাম। মা একটু কী ভেবে নিয়ে বললেন, উদ্ভট প্রশ্ন। তোর মাথায় আসেও বাবা। মায়ের গম্ভীর মুখ দেখে সেদিন আর প্রশ্ন করিনি। কিন্তু উত্তরটা জানতে না পারায় এখনও খারাপ লাগে। ঠিক করেছি বায়োলজির নতুন টিচারকে জিজ্ঞেস করব একদিন !

উনি খুব ভালো পড়ান। কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রশ্ন করলে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন। মধুমিতা, তপতী পার্থ ওরা কিছু জানতে চাইলে আমাকে দিয়ে প্রশ্ন করাবে। বলবে, গার্গী, আমার একটা প্রশ্ন আছে। তুই জিজ্ঞেস কর না স্যারকে। ওদের সব প্রশ্ন আমি কেন জিজ্ঞেস করতে যাব ? এমনিতে আমার মাথাতেই অসংখ্য প্রশ্ন। তবে হ্যাঁ, যদি মনের মত প্রশ্ন থাকে আমি জিজ্ঞেস করি। জিজ্ঞেস করলে যে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাব তা নয়। স্যার তাঁর সুবিধামত সময়ে উত্তরগুলি দেন। কখনও বলেন, আগে এই টপিকটা পড়িয়ে নি পরে তোমার প্রশ্নের দেব। আবার বলেন, আজকে সময় নেই। পরের ক্লাসে উত্তরটা পাবে তোমরা। কখনও কিন্তু বলেন না, তোমাদের ক্লাস নাইনের বিদ্যায় এ জিনিশ বুঝবে না। এসব উদ্ভট প্রশ্ন তোমার মাথায় আসে কি করে, বলত !

গত মঙ্গলবার বিপাক ক্রিয়া (digestion)। মঙ্গল আর বুধ সপ্তাহে উনার দুদিন ক্লাস। প্রথম ক্লাসেই পাকস্থলী

(stomach), যকৃত (liver), অগ্নাশয় (paccreas) এ সব পড়ানো হয়ে গেছিলো। বুধবার খুব মন দিয়ে স্যারের লেকচার শুনছিলাম আমরা। কেমন করে পাকস্থলীতে যাবার পর খাদ্যগুলো হজম হয়। হজম হওয়া মানে খাদ্যগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন। জটিল যৌগ থেকে সরলতম যৌগে রূপান্তর। যেমন ভাত খেয়েছি আমরা। ভাতের রাসায়নিক উপাদান স্টার্চ (starch)। একে পলিস্যাকারাইড (poly saccaride) বলা হয়। পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (hydrochloric acid) ও অন্যান্য রাসায়নিকের উপস্থিতিতে পলিস্যাকারাইড রূপান্তরিত হয় মনোস্যাকারাইড বা গ্লুকোজ-এ। এই গ্লুকোজ (glucose) লিভারে জমা থাকে গ্লাইকোজেন হিসাবে। শরীরের প্রয়োজন মত এ শক্তি সরবরাহ করে। স্যার বলছিলেন, পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমানে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জমা হয়। এর ক্ষমতা অনেক। এসব কথা শুনতে শুনতে ভুস্ করে একটা প্রশ্ন মাথার উপরে উঠে এল। আমি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

গার্গী, কিছু বলবে ?

স্যার, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো লোহা গলিয়ে দেয়। তাহলে পাকস্থলীটা গলাচ্ছে না কেন ? ক্লাসের কয়েকজন বন্ধু হেসে উঠল। স্যার ও মৃদু হাসলেন। বললেন, উত্তরটা কি এখনই জানতে চাও ? ক্লাসে অনেকেই দেখি মুখ খুলল। হ্যাঁ স্যার। এখনই বলুন। একটু থেমে স্যার বললেন, শোন আগে যা বলেছি আবার বলছি বিপাক ক্রিয়ার বেশীর ভাগটাই সম্পন্ন করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। পাকস্থলীর এই অ্যাসিড লোহা গলিয়ে দেবার মত শক্তিশালী। অবশ্য সর্বদা যে একই পরিমাণ অ্যাসিড জমা হয় তা নয়। জমা খাদ্যের পরিমাণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাসিড নির্গত হয়। এখন প্রশ্ন হল, শক্তিশালী হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাকস্থলীর কোষগুলোকে নষ্ট করে দেয় না কেন ? কিম্বা বলতে পার, পাকস্থলীটাই কেন হজম হয়ে যায় না।

স্যার একটু থামলেন। ঘড়ি দেখে বললেন, উত্তরটা আমি সংক্ষেপে দিচ্ছি।

পাকস্থলীর ভিতরের পর্দার উপর একধরণের আবরণ থাকে। তাই এই পর্দা অ্যাসিডের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। যেমন একখণ্ড লোহা খোলা জায়গায় ফেলে রাখলে তাতে মরিচা (Rust) পড়ে। জল ও বাতাসের অক্সিজেন (oxygen) বিক্রিয়া করে ঐ মরিচা তৈরী করে। কিন্তু লোহার টুকরোটাতে যদি রং বা পেন্ট (paint) লাগানো হয় তাহলে মরিচার আক্রমণ হয় না। পেন্টের আবরণ লোহাকে রক্ষা করে। ঠিক তেমনি পাকস্থলীকে অ্যাসিডের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখে এক ধরণের আবরণ।

স্যার থামলেন। আমাদের মুখগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। হঠাৎ পার্থ উঠে দাঁড়াল। স্যার ঐ আবরণটা কী ধরণের ?

স্যার বোধ হয় এ প্রশ্নটাই আশা করছিলেন। বললেন, গুড। পার্থ বসলে উনি আবার শুরু করলেন।

পাকস্থলীর ভিতরের পর্দা আর অ্যাসিডের মাঝখানে থাকে মিউকাসের (mucus) ঘন আবরণ। এর সংস্পর্শে এলে অ্যাসিড প্রশমিত (neutralised) হয়ে যায়। মিউকাস অংশিক ক্ষারধর্মী অ্যাসিডের ক্রিয়া নষ্ট করে তোমরা জান, অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় তৈরী হয় লবণ ও জল। এভাবেই মিউকাসের আবরণ পাকস্থলীকে রক্ষা করে। আবার কখনও যদি পাকস্থলীর পর্দার সামান্য ক্ষতি করে অ্যাসিড তাহলে পাকস্থলীতে নোতুন কোষ তৈরী হয়ে ঐ ক্ষতি পূরণ করে নেয়। যেমন আমাদের কেটে গেলে ঐ স্থানে আবার কোষ তৈরী হয়। ক্ষতস্থান স্বাভাবিক হয়ে উঠে।

ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ল। স্যার বললেন, একটা কথা বলা হয়নি। মিউকাস কোষ কিন্তু শরীরের অনেক জায়গাতেই থাকে। যেমন ঠোঁট, গাল, অন্ত্র (intestine) ইত্যাদি।

স্যার চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ ক্লাস চুপচাপ ছিল। একটা পুরানো উদ্ভট প্রশ্ন আমার মনে পড়ল। ঐ নারকেল গাছে জল উঠবার ব্যাপারটা। সামনের সপ্তাহে স্যারকে ওটা জিজ্ঞেস করতেই হবে।

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুজোর ছুটিতে চেরাপুঞ্জিতে বেড়াতে এসেছি। সঙ্গে সুজন কাকা আর পাপিয়া। আমরা সবাই উঠেছি দত্ত-ভিলাতে। খুব সুন্দর সাজানো বাংলো। এটি তৈরি করেছেন শিলংয়ের বড় ব্যবসায়ী ভুবন দত্ত। তবে সারা বছর বিশেষ কেউ থাকে না এ বাড়িতে। কখনো ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে দু'চারদিন এখানে কাটিয়ে যান ভুবনবাবু। কিংবা পরিচিত কোনো বন্ধুবান্ধব।

ভুবন দত্তর ছোট ভাই কলেজে সুজন কাকার সহপাঠী ছিলেন। সেই পরিচয়েই ওখানে উঠেছি আমরা।

দত্ত-ভিলার চৌকিদার দুখীরাম লোকটি বেশ ভালো। পঞ্চাশ-বাহান্ন বয়স। কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে ভিলার আউট হাউসে থাকে। সারা বছর ধরে বাড়িটা দেখাশোনা করে, পরিষ্কার রাখে যাতে অতিথিদের কোনো অসুবিধে না হয়।

শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি বেশি দূর নয়। ট্যাকসিতে ঘণ্টা দুয়েকও লাগল না। শিলং জায়গাটা গাছপালায় ঘেরা সতেজ সবুজ, কিন্তু চেরাপুঞ্জি কেমন যেন গাছপালা-হীন রুক্ষ।

সব জান্তার ভঙ্গিতে আমি বললাম, 'ভুগোল বইতে পড়েছি, চেরাপুঞ্জিতে নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়—'

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে পাপিয়া, 'উঁহু, চেরাপুঞ্জি নয়, জায়গাটার নাম মউসিনরাম—'

হেসে ফেললেন সুজনকাকা, 'আরে ঐ একই হলো। মউসিনরাম জায়গাটা চেরাপুঞ্জির কাছেই। দু-তিন কিলো-মিটারও হবে কিনা সন্দেহ '

'কিন্তু কাকা, এখানে এত বৃষ্টি অথচ জায়গাটা এত রুক্ষ-কেন? তেমন গাছপালা নেই '

জবাবে বেশ বড় সড় বক্তৃতা দিলেন সুজনকাকা, 'আসলে এখানকার মাটি গাছপালা জন্মাবার ঠিক উপযুক্ত নয়। তাছাড়া জমির ঢালও এমন যে বৃষ্টির জল এখানে দাঁড়াতেই পারে না। সেই পড়েছিস না, Water water everywhere, not a drop to drink। এখানে এত বৃষ্টি, অথচ এখানকার মানুষদের জলের জন্য কতই না কষ্ট—'

দুখীরাম আমাদের জন্য দোতলায় দুটো ঘর পরিষ্কার করে রেখেছিল। ঘরের সঙ্গে বেশ বড় বারান্দা। বারান্দায় বসলে চোখে পড়ে বাঁ দিকে বাংলাদেশের সমভূমি। ডান-দিকে বেশ কয়েকটা উঁচু পাহাড়।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘুরতে বেরোলাম।

আকাশে অল্প মেঘ থাকলেও বেশ ঝকঝকে রোদ। তাই নরম শীতে ঘুরতে বেশ ভালোই লাগছিল। ঘুরতে ঘুরতে আমরা গেলাম সেই জায়গাটায়, যেখান থেকে দেখা যায় দূরের বাংলাদেশের সবুজ সমভূমি। ট্যুরিস্টদের জন্য রেলিং-দেওয়া সুন্দর বাঁধানো জায়গা আছে। আমাদের সামনেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি এক বিশাল গভীর খাত। সেই খাতের দেওয়ালের গা বেয়ে অপূর্ব ছন্দে নেমে আসছে কত জলপ্রপাত। পাহাড়, জলপ্রপাত গভীর খাত, দূরে সমভূমি, আকাশ সব মিলিয়ে প্রকৃতি এখানে এত উদার যা আমার মনকে ভরে তুলল এক মুগ্ধ আবেশে।

দত্ত-ভিলায় ফেরবার পথে আমরা দেখতে গেলাম কিনরেম জলপ্রপাত আর মউসমাই গুহা। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। সবকিছু দেখে যখন দত্ত-ভিলায় ফিরলাম, তখন বিকেল শেষ হয়ে সন্ধে। তার সঙ্গে জাঁকিয়ে নেমেছে শীত। আর ঝোড়ো হাওয়া।

দুখীরাম ফায়ার-প্লেসে কাঠকয়লা ধরিয়ে রেখেছিল আগেই। তাই বসবার ঘরটা বেশ গরম। সেখানে আমরা তিনজনে বসলাম বেশ আয়েস করে। দুখীরাম দিয়ে গেল কফি আর পটাটো চিপস্। খেতে খেতে গল্প হলো নানা রকম।

দুখীরাম বলল পুরনো আমলের গল্প। সে আট-দশ বছর বয়সে বিহারের ভাগলপুর থেকে এখানে চলে এসেছে। আগে কাজ করত ভুবনবাবুর শিলংয়ের দোকানে। চেরাপুঞ্জির এই বাড়িটা তৈরি হবার পর থেকে এখানেই আছে। বিয়ে-শাদি করেছে। ছেলেমেয়ে হয়েছে। সেও আজ অনেক বছর হয়ে গেল।

গল্প করতে করতে জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে বলল দুখীরাম, 'আজ বহুৎ ঠাণ্ডা পড়বে হুজুর। বৃষ্টিও হতে পারে

আমরাও বাইরে তাকালাম। মনে হলো ঝর আসছে যেন। কাচের শার্সি বারবার কেঁপে উঠছে। খানিকক্ষন পরে শুরু হলো বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ। ক্রমশই সে আওয়াজ যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

কাঁপা কাঁপা গলায় পাপিয়া, 'কাকামণি, বড় ভয় করছে।' সান্ত্বনা দিয়ে বললেন কাকা, 'না না, ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া আমরা তো আছি বাড়ির ভেতরে'

হঠাৎ কোথায় যেন কাচ ভেঙে পড়বার আওয়াজ হলো। ভয়ে কান দুটো ঢেকে দুখীরাম বলল, 'হুজুর, এখনই শুরু হবে ভুতের গান। ভূতের গান শুরু হলেই আমার খুব ভয় করে--'

'ভুতের গান, সে আবার কী দুখীরাম!' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন সুজনকাকা।

কাঁপা কাঁপা আঙুলে কাচের জানলার ভেতর দিয়ে দূরের পাহাড়গুলো দেখায় দুখীরাম, 'ঐ যে দেখছেন পাহাড়। ওখানে এক্ষুণি কোথা থেকে জড়ো হবে ভূতের দল। তারপর শুরু হবে ভূতের গান। একটু ধৈর্য ধরুণ, এক্ষুণি শুনতে পাবেন—'

সত্যিই, মিনিট তিনেকও কাটল না। অনেকটা বাঁশির সুরের মতো আওয়াজ। তবে এমন ভয়ংকর বাঁশির আওয়াজ কখনো শুনি নি। মনে হলো যেন পৃথিবী ধ্বংসের পালার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে। বাঁশির আওয়াজ শুরু হওয়ামাত্র মুখ কান ঢেকে বসে রইল দুখীরাম। আমরা তিনজনেও পাথরের মতো চুপচাপ।

কতক্ষণ ধরে যে সে বাঁশি বেজে চলল, সে খেয়াল নেই। হুঁশ এলো সুজনকাকার কথায়। 'এই যে বাদল, অমন ফ্যালফ্যাল করে বসে আছিস কেন?'

সুজনকাকার কথায় আবার নড়েচড়ে বসলাম। দেখলাম ঝর কমে গেছে। বাঁশির আওয়াজও নেই। ধীরে ধীরে গল্পগুজব শুরু হলো আবার। কিন্তু তা যেন কেমন ছাড়াছাড়া। আসলে আমাদের মনের মধ্যে সেই বাঁশির সুর কী যেন এক অলৌকিক প্রভাব রেখে গেছে। আমরা সবাই সেই ঝড় আর বাঁশির সুরের কথাই ভাবছিলাম।

দুখীরাম বলল, 'চলুন আপনারা। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ুন। আবার ভূতের বাঁশি শুরু হলে আর খাওয়াই হবে না—'

ভুরু কুঁচকে সুজনকাকা বললেন, 'কেন, বাঁশির আওয়াজ শুরু হলে খাওয়া দাওয়া কি বারণ নাকি!'

'না, বারণ নয়। তবে পাহাড়ে গান শুরু হলে আমরা খানাপিনা করি না। বলা যায় না, ভূতের গানের সময় খানাপিনা করলে ওঁনারা যদি চটে যান!'

দুখীরামের কথা শুনে আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। ভূতের গানের যোগ্য শ্রোতা বটে! সারাক্ষণ তো কান মাথা ঢেকেই বসে ছিল দুখীরাম।

খেতে বসে দেখলাম, সুজনকাকা কী এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। বুঝলাম, এই গানের ব্যাপারটা নিয়ে খুবই চিন্তায় পড়ে গেছেন। এটাকে ভূতের গান বলে কিছুতেই মানতে পারছেন না। যদি ভূতের গান না হয়, তবে এটা কী?

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, সুজনকাকা নেই। কী ব্যাপার! কোথায় গেলেন?

দুখীরামকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, সকালেই জামাজুতো পরে পাহাড়ের দিকে চলে গেছেন। বুঝলাম, জিয়োলজিস্টদের অভ্যেসটা ছাড়তে পারেন নি। পাহাড় দেখলে এক চক্কর ঘুরে না এলে শান্তি নেই।

দুপুরে সুজনকাকা ফিরলে আমি আর পাপিয়া দুজনে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, 'কোথায় গিয়েছিলে কাকা? আমাদের নিয়ে যাও নি কেন?'

'আরে ঐ পাহাড়ের দিকটায় গিয়েছিলাম। বড় দুর্গম জায়গা। তোদের কষ্ট হতো—

'বুঝেছি, ঐ ভূতের বাঁশির রহস্য ভেদ করতে গিয়েছিলে' তা ভূতের দেখা পেলে"?

'ইয়ার্কি মারিস না বাদল। তুইও খুব ভালো করে জানিস, এসব ভূতের কাজ নয়। অন্য ব্যাপার—'

'কী ব্যাপার কিছু বুঝলে?

'না, এখনো পারি নি। তবে মনে হয় দু'চারদিনের মধ্যেই রহস্যভেদ করতে পারব। কাল ভাবছি, খুব সকাল বেলায় লাঞ্চ-প্যাক করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। ভালো করে খুঁজে দেখব, ঐ পাহাড়ে এমন কী আছে, যার জন্য ঝড় হলেই বাঁশির আওয়াজ বেরিয়ে আসে—'

কাকার কথা শেষ হওয়ামাত্র আমি আর পাপিয়া একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আমরাও যাব কাকা'

পরের দিন সকালেই আমরা বেড়িয়ে পড়লাম পাহাড়ের দিকে। আজ আমাদের পুরোপুরি ফিল্ড-ওয়ার্কের পোষাক। পাপিয়া পড়েছে শালোয়ার কামিজ। সঙ্গে জল লাঞ্চ প্যাকেট দুখীরামের বউ তৈরি করে দিয়েছে। কাকার কমপাস আর হাতুড়িও আছে। পাহাড়ের দিকে খানিকটা পর্যন্ত রাস্তা আছে, তারপর এবড়ো খেবড়ো প্রান্তর। বড় গাছ বেশি না থাকলেও ঝোপঝাড় প্রচুর। পাথুরে প্রান্তর কাঁটাঝোপ পেরিয়ে এগোতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। একটাই বাঁচোয়া। আজ আকাশ মেঘলা। তাই রোদ্দুরের আঁচ গায়ে লাগছে না।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম পাহাড়টার কাছে। উঁচু খাড়াই পাহাড়।

পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ভয়-ভয় গলায় পাপিয়া বলল, 'পাহাড়টার চেহারা কেমন অদ্ভুত দেখেছিস?'

তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই পাহাড়টার চেহারা কীরকম পাতলা সরু। অনেকটা লম্বা হলেও চওড়ায় খুবই কম।

কথা বলতে বলতে আমি আর পাপিয়া আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখি, সুজনকাকা আমাদের পেছনে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছেন।

কোনোরকমে ছুটে গিয়ে কাকাকে ধরে ফেললাম কাকা তখন হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙতে শুরু করেছেন।

'এই যে পাথরটা দেখছিস, এটা হলো লাইমস্টোন। বাংলায় বলে চুনাপাথর। এই পাথর থেকেই তৈরি হয় সিমেন্ট।'

পাপিয়া বলল, 'কিন্তু সিমেন্ট তো কীরকম গুঁড়ো পাউডারের মতো। তারপর রঙটা কেমন কালচে ধরনের। আর এই পাথরটা এত ধপধপে সাদা।

পাপিয়ার কথা শুনে হেসে ফেললেন সুজনকাকা। তারপর বললেন, 'এর মধ্যে অনেকটা কেমিস্ট্রিও আছে। আসলে পাথরটা গুঁড়ো করে তার সঙ্গে কিছুটা মাটি আর

কয়েকটা জিনিস মেশানো হয়। আর সেজন্যই চেহারাটা এমন কালচে ধরনের—'

কথা বলতে বলতে আমরা উঠে এসেছি অনেক ওপরে। হঠাৎ পাপিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে কত টিয়া দেখছি ওখানে—'

পাপিয়ার কথা শুনে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি, ঝাঁক ঝাঁক টিয়া পাখি উড়ছে। একটা দুটো নয়, অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশটা সবুজ টিয়া।

আমি বললাম, 'বাঃ, দারুন সুন্দর তো পাখিগুলো। নিচে বসলে একটা ধরব '

পাপিয়াও হাততালি দিল আনন্দে, 'ঠিক বলেছিস দাদা। দুটো টিয়া কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পুষব '

পাখিগুলোকে ধাওয়া করে আমরা সবাই ছুটলাম, যাতে পাখিগুলো কোথাও বসলে খপ করে ধরতে পারি। কিন্তু পাখিরা নিচে কোথাও বসল না। উড়তে উড়তে বসল গিয়ে পাহাড়ের খাঁজে। তারপর সব কটা পাখিই এক এক করে ঢুকে পড়ল পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে।

'আশ্চর্য, এখানকার পাহাড়গুলোর মধ্যে দেখছি অনেক গর্তটর্ত আছে—' পাহাড়ের ওপর দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন কাকা।

'চলো কাকা, ঐ গর্তের কাছে গিয়ে দেখি, একটা পাখি ধরা যায় কিনা—'

'একটা নয়, দুটো- ' পাপিয়া বলল।

কাকা একটু পিছিয়ে পড়লেও আমি আর পাপিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হলাম পাহাড়ের একটা খাঁজের কাছে। উঁকি মেরে দেখি, খাঁজের ভেতরটা অনেকটা সুড়ঙ্গের মতো। সুড়ঙ্গগুলো বেশি লম্বা নয়, দশ-বারো ফিটের বেশি হবে না। এদিক থেকে শুরু হয়ে ওপাশে শেষ হয়েছে। সুড়ঙ্গের ওপারে খোলা আকাশ। কিন্তু আশ্চর্য, সুড়ঙ্গের ভেতরে কোনো পাখির দেখা পেলাম না।

'অবাক কাণ্ড! পাখিগুলো গেল কোথায়?'

'আমাদের শিকারী ভেবে বোধহয় ওপাশের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছে—' জবাব দিলাম আমি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি, সৃজনকাকা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে।

'কী রে বাদল, কী দেখছিস?'

'দেখেছ কাকা, কীরকম অদ্ভুত সুড়ঙ্গ এখানে। মনে হচ্ছে কেউ যেন পাহাড় খুঁদে তৈরি করেছে। তাই না?'

সুড়ঙ্গের ভেতরে ও আশেপাশে ভালো করে দেখে সৃজনকাকা বললেন, 'নারে, কেউ তৈরি করে নি এসব সুড়ঙ্গ। নানারকম প্রাকৃতিক শক্তির দাপটে তৈরি হয়েছে এসব সুড়ঙ্গ '। কথা বলতে বলতে একটু থেমে সৃজনকাকা আবার বললেন, 'আরে এরকম সুড়ঙ্গ তো একটা নয়, আরো রয়েছে দেখছি—'

কাকার আঙুল বরাবর তাকিয়ে দেখলাম, কিছুটা দূরে পরপর আরো কয়েকটা একই রকম সুড়ঙ্গ।'

দিনটা সকাল থেকেই মেঘলা। এখন হঠাৎ কোথা থেকে জোর হাওয়া বইতে শুরু করল। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোঁ সোঁ আওয়াজ। আকাশে মেঘ বাড়ছে।

উদ্বিগ্ন গলায় পাপিয়া বলল, 'সঙ্গে ছাতা আনা হয় নি। বৃষ্টি শুরু হলে কী হবে কাকা?'

কিন্তু পাপিয়ার কোনো কথা কানে গেল বলে মনে হলো না। গভীর নিমগ্ন ভাবে কাকা যেন শুনতে চেষ্টা করছেন হাওয়ার শব্দ। হাওয়ার জোর ক্রমেই বাড়ছে। সঙ্গে বাড়ছে হাওয়ার শব্দ। শব্দটা যেন পরশু রাতের শব্দের মতো। বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। তবু আমরা সবাই এখন চুপচাপ। স্থির হয়ে কোনো তীক্ষ্ণ শব্দের প্রতীক্ষায় বসে রয়েছি যেন।

হঠাৎ চারদিক কাঁপিয়ে আবার বেজে উঠল বাঁশির সুর। অবিকল আগের দিনের মতো আকাশ-বাতাস তোলপাড় করা বাঁশির সুর। আমরা তিনজনেই অবাক বিস্ময়ে শুনছিলাম তীক্ষ্ণ বাঁশির সুর। বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে সৃজনকাকা বসেছিলেন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। হঠাৎ আর্কিমিডিসের স্টাইলে লাফিয়ে উঠলেন সৃজনকাকা, 'ইউরেকা! ইউরেকা!! এই হলো প্রকৃতির বাঁশি। এই যে পরপর সুড়ঙ্গ—এগুলোই হলো বাঁশির গর্ত। বেশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলে আপনা থেকেই বেজে ওঠে পাহাড়ের বাঁশি '

সেই মাতাল ঝোড়ো হাওয়া আর অঝোর বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম, গাইয়ে পাহাড়ের অনৈসর্গিক গান। পাহাড়ও যে গান গাইতে পারে, তা আগে জানতাম না।

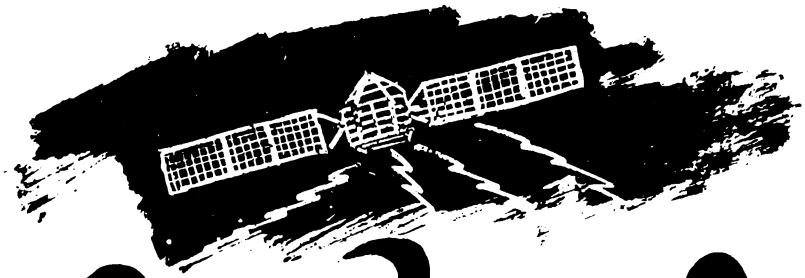

রিমোট সেনসিং

দিলীপকুমার বসু

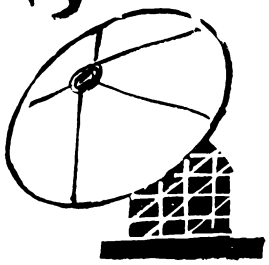

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়গুলি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে "রিমোট সেন্সিং" বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রিমোট সেন্সিং বলতে আমরা বুঝি, দূর থেকে কোন বস্তুকে দেখে তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। পৃথিবী-পৃষ্ঠে বা সমুদ্র-পৃষ্ঠের বাস্তব অবস্থা বোঝাবার জন্য আমরা যদি পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে সমতল ভূমির দিকে তাকাই তাহলে নদী, হ্রদ, বনভূমি, কৃষিক্ষেত্র, পতিত-জমি, জনপদ অথবা দ্বীপ, উপদ্বীপ, প্রবাল বলয় ইত্যাদি সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। ঠিক এই ভাবে হেলিকপ্টর অথবা বিমান থেকে ছবি নিলে সেই ছবিতে, যেখান দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে তার নীচে পৃথিবীর ছবি আমরা তুলে নিতে পারি। আমরা যত উঁচু থেকে ছবি তুলবো তত বড় এলাকা ছবির মধ্যে আসবে। কিন্তু সেই সঙ্গে ছবি থেকে কোনও ছোট বস্তু বা এলাকার খুঁটিনাটি চিহ্নিত করাও কঠিন হয়ে পড়বে। তবে বিশেষ যন্ত্রের সহায়তায় এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এই ছবিকে বিশ্লেষণ করে আমরা ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

মহাকাশ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই "রিমোট সেন্সিং" পদ্ধতিকে কাজে প্রয়োগের ক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছে। প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ "স্পুটনিক" কে মহাকাশে স্থাপন করার অনেক আগেই প্রখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক ও প্রবন্ধকার আর্থার ক্লার্ক মহাকাশকে টেলি-যোগাযোগ ও রিমোট সেন্সিং এর কাজে ব্যবহার করার কথা কল্পনা করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে স্পুটনিক উৎ-ক্ষেপণের মধ্য দিয়ে এই কল্পনা বাস্তবরূপ নেবার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। ৬০-এর দশকের প্রথম থেকে উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের চিত্র গ্রহণ শুরু হয়। জেমিনি, অ্যাপোলো, স্কাইল্যাব, সয়ুজ অথবা আমাদের দেশের ভাস্কর, রোহিনী ইত্যাদি উপগ্রহ থেকে ছবি তুলে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি। কিন্তু এই সমস্ত উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ছবির সাহায্যে পৃথিবীর উপরের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তার পরিবর্তনশীল প্রকৃতি সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা পাই না। তাই পরবর্তীকালে এই প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে মার্কিন দেশে "ল্যান্ডস্যাট" ফ্রান্সে "স্পট" অথবা আমাদের দেশে "আই, আর, এস" শ্রেণীর উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। এই উপগ্রহগুলির বিশেষত্ব হ'ল যে এই উপগ্রহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট স্থানের ওপর দিয়ে পরিক্রমা করবে আর এই উপগ্রহে অতি উচ্চ-

ক্ষমতা সম্পন্ন বিশেষভাবে উদ্ভাবিত ক্যামেরা থাকবে।

উপগ্রহের কক্ষপথ "সান-সিনক্রোনাস" অর্থাৎ সূর্য ও পৃথিবীর আপেক্ষিক গতিবেগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যার ফলে উপগ্রহের কক্ষতলের ঘূর্ণনবেগ পৃথিবীর গতিবেগের সমান হবে। এতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উপগ্রহ পৃথিবীর নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর অবস্থান করবে। ভারতীয় উপগ্রহ আই, আর, এস ১এ-র ক্ষেত্রে এর সময় হ'ল ২২ দিন। অর্থাৎ ২২ দিনে মোট ৩০৭ টি কক্ষপথ অতিক্রম করে উপগ্রহটি আবার একই অঞ্চলে এসে হাজির হয়।

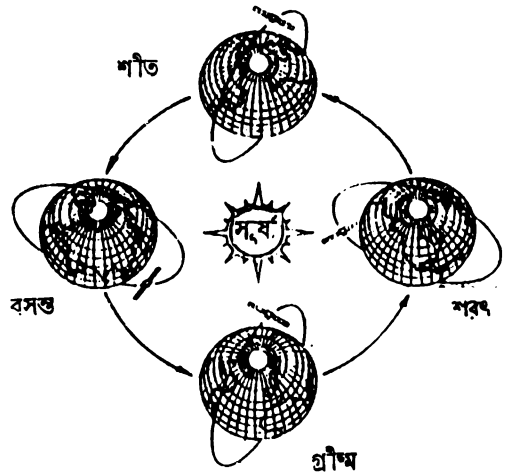

উপগ্রহের উপর রক্ষিত ক্যামেরা পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির সাহায্যে চিত্র গ্রহণ করে। এই চিত্র তারা বৈদ্যুতিক সিগন্যাল হিসাবে ভূ-পৃষ্ঠস্থ স্টেশনে প্রেরণ করে। সেখানে এর বিশ্লেষণ করা হয়। ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুর প্রতিফলন ক্ষমতা ভিন্নতর হয়। এই ভিন্নতর

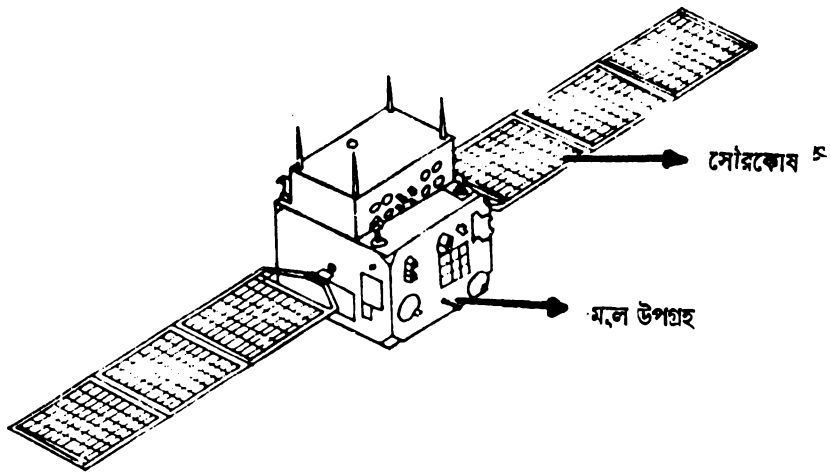

প্রতিফলণ ক্ষমতার জন্য আমরা উপগ্রহ ক্যামেরার ছবিতে কতগুলো ইঙ্গিত পাই। এই ছবিগুলিকে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পারেন কোথায় বনাঞ্চল আছে, কোথায় কৃষিক্ষেত্র আছে, কোথায় জলাভূমি আছে, কোথায় খনিজ পদার্থ আছে, কোথায় আবাদি জমি আছে ইত্যাদি। এই উপগ্রহ ছবির বিশ্লেষণ করে ভূ-গর্ভস্থ জল, জমির আর্দ্রতা, ফসল ও বনভূমির স্বাস্থ্য, সমুদ্রে মৎসক্ষেত্র, পশুপক্ষীর ঝাঁক, বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল, নদীগর্ভে পলিমাটির পরিমান, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা তথ্য পেতে পারেন।

আই আর এস—১এ

উৎক্ষেপ সময় - —১৭ই মার্চ, ১৯৮৮

কার্যকাল ——৩ বৎসর

কক্ষপথ ——সান-সিনক্রোনাস, বৃত্তাকার।

উচ্চতা ৯০৭ কি. মি.
প্রদক্ষিণ সময় - ১০৩ মিঃ
মোট কক্ষপথ— ৩০৭
প্রতিদিনে কক্ষ পরিক্রমা — ১৪ টি পথ
একই কক্ষপথে পুনরাগমন - ২২ দিনে
বিষুবরেখা অতিক্রমের সময় - ১০ টা ২৫ মি. প্রতিদিন

এই সমস্ত তথ্য আমাদের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে। নদী পরিকল্পনা, পরিবেশ পরিকল্পনা, পার্শ্বর্ত্য অঞ্চল পরিকল্পনা অথবা ব-দ্বীপ বা তটভূমি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই "রিমোট সেন্সিং" প্রযুক্তি এক অতি প্রয়োজনীয় সংযোজন।

দীর্ঘদিন ধরে। গত ১৯৮৮ সালের ১৭ই মার্চ আমরা নিজেদের "রিমোট সেন্সিং" উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছি। আই, আর, এস—১ এ উপগ্রহের কার্য্যকাল ৩ বৎসর। এই পর্য্যায়ের আরও উপগ্রহ উৎক্ষেপনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে আমরা এই নতুন প্রযুক্তিকে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজে প্রয়োগ করার উদ্যোগ করছি। খড়্গপুর "রিজিওন্যাল রিমোট সেন্সিং সার্ভিস সেন্টার" স্থাপিত হয়েছে। এটা ভারত সরকারের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা পরিচালিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে "রিমোট সেন্সিং ল্যাবরেটরি" তেও কিছু কাজ কর্ম হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান

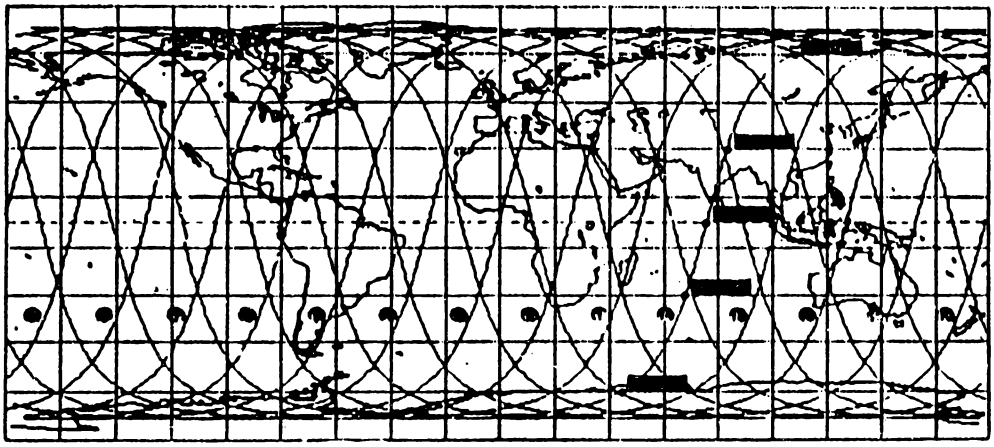

ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা "রিমোট সেন্সিং" প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে প্রায় এক দশকের ওপর। "ল্যান্ড স্যাট" এবং "স্পট" উপগ্রহ প্রেরিত চিত্র থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাড় করছি ও প্রযুক্তি দপ্তরে "স্টেট রিমোট সেন্সিং সেন্টার" স্থাপিত হয়েছে। আমরা আশা রাখি এই নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে আমরা আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে আরও বিজ্ঞান ভিত্তিক ও বাস্তবমুখী করতে সমর্থ হব।

উপেক্ষিত অভোগাড্রো

প্রবীর গুপ্ত

একশো তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা। রসায়নের এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। অ্যাটম (পরমাণু), মলিক্যুল (অণু) ও ইকুইভ্যালেণ্ট (তুল্যাঙ্ক) - এই শব্দগুলোর মধ্যে কোনও বাস্তব যোগাযোগ নেই। মৌলের পারমাণবিক গুরুত্বের হিসেব নির্দিষ্ট নয়। নানা মুনির নানা মত। যেমন, কারও কাছে অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ৮ আবার কারও মতে ১৬। অন্য মৌলের একই হাল। ফলে যৌগের ফরমুলা বা আনবিক সংকেত একাধিক। ভাবতে পারো, অগস্ট কেকুলের লেখা প্রচলিত জৈব রসায়ন বইতে তখন অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ফরমুলা উনিশ রকমের! রসায়নবিদ্‌দের মত বিরোধে রসায়ন তখন বিভ্রান্ত। সকলে মিলে লালনপালন করলেও মূল রসায়নের যেন অনাথ অবস্থা।

এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে জার্মানীর বিজ্ঞানী অগস্ট কেকুলে স্থির করেন যে, বিভিন্ন দেশের রসায়নবিদ্‌দের মতামত নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কার্লসরুহে শহরে এক মহাসভার আয়োজন করা হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে! সেসময় রসায়নের পটভূমিকাটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

জন ডালটনের পরমাণু তত্ত্ব প্রকাশিত হয় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে—পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা হল পরমাণু। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জোসেফ গে-লুসাক প্রমাণ করেন (১৮০৯) যে বিক্রিয়ক গ্যাসগুলির মোট আয়তন এবং উৎপাদিত গ্যাসগুলির মোট আয়তন- এই দুই আয়তনের অনুপাত সর্বদা পূর্ণসংখ্যার অনুপাত মেনে চলে। ডালটনের পরমাণুতত্ত্ব কিন্তু গে-লুসাকের এই সূত্র প্রমাণ করতে পারলো না। এক আয়তন নাইট্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় কেন দুই আয়তন নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয়? ডালটনের তত্ত্ব অনুযায়ী এক পরমাণু নাইট্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় শুধু এক আয়তন নাইট্রিক অক্সাইড হবার কথা। খোদ ডালটনকে এ সমস্যা সমাধানের কথা বলা হল। তিনি গে-লুসাকের পরীক্ষায় ভুলচুক আছে বলে ব্যাপারটা নাকচ করে দিলেন। রসায়নের দিকপাল জন বার্জেলিয়াসের কথাটা মনঃপূত হল না। কেননা গে-লুসাক বারবার বিভিন্ন বিক্রিয়া করে তবে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। তিনি ডালটনকে এ ব্যাপারে চিঠি লিখলেন। কিন্তু কিছু ফল হল না। বার্জেলিয়াসের কাছেও বিষয়টা হেঁয়ালী হয়ে রইলো। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ পরমাণুকে দুভাগ করলেন, এমনকি কেউ চারভাগ। গে-লুসাকের পরীক্ষালব্ধ সত্য আর ডালটনের পরমাণু তত্ত্ব কোনওটাই বাতিল করা যায় না—তবু সমাধান নেই।

সমন্বয় নেই। বিজ্ঞানীরা বিভ্রান্ত।

এমন বিভ্রান্তির মাঝে ইতালির পদার্থবিদ আলমেডো আভোগাড্রো ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে গে-লুসাকের গ্যাসীয় সূত্র ও ডালটনের পরমাণু তত্ত্বের মাঝে এক সংযোগ ঘটালেন :- সমান চাপ ও তাপমাত্রায় সম আয়তন বিশিষ্ট যে কোনও গ্যাসে সমসংখ্যক অণু থাকে। তিনি বললেন—সাধারণ গ্যাসগুলোকে যদি একাধিক পরমাণু বিশিষ্ট অণু অবস্থায় বিবেচনা করা যায় তবে সহজেই এই সমস্যার সমাধান হয়। অণু হল পদার্থের অস্তিত্ব। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ অণু অবস্থায় থাকে, অণু হিসেবেই পাওয়া যায়।

এর বছর তিনেক পর পদার্থবিদ আঁদ্রে আম্পেয়ারের গবেষণায় আভোগাড্রোর প্রকল্প সমর্থিত হয়। কিন্তু প্রায় সবার কাছেই আভোগাড্রোর কথা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। অথচ কি সুদূরপ্রসারী কল্পনাপ্রবণ ভাবধারায় তিনি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা আজ ভাবলে অবাক লাগে—গ্যাসের সম আয়তনে সমসংখ্যক অণু! তিনি কোনোদিন এটা পরীক্ষা করে প্রমাণিত করেননি বা পারতেন না। এমন কোনও তুলাদণ্ড ছিল না যা একটা অণুর ওজন বার করতে পারবে। লাখ লাখ অণুর সমষ্টিগত পদার্থের ওজন যদিও তুলাদণ্ডের মাধ্যমে জানা যাবে তবু অণুগুলো গোনা অসম্ভব ব্যাপার। কোনও অণুবীক্ষণ যন্ত্র নেই যা দিয়ে অণুগুলোকে দেখা যাবে। তবু আভোগাড্রো তাঁর অনুভূতি ও কল্পনা মিশিয়ে এমন বলিষ্ঠ কথা বলেছিলেন।

যাইহোক, তৎকালীন রসায়ন সমাজ আভোগাড্রোর অবিশ্বাস্য কথা মানতে নারাজ। একই মৌলের দুটি পরমাণু পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে—এই বলে বার্জেলিয়াস অণুর অস্তিত্বকে খারিজ করলেন। আর ডালটনের কাছে অণুর ব্যাপার হল অবান্তর। এই দুই প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীর প্রতিবাদে আভোগাড্রোর কথা নাকচ হয়ে গেল। জাঁ ডুমা বাষ্প-ঘনত্ব প্রণালীর মাধ্যমে (১৮২৬) মৌলের পরমাণু-ভরের যে হিসেব দিলেন দেখা গেল তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বার করা পরমাণু ভরের থেকে আলাদা। এই হেরফের কেন, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামালো না।

এর পরের তিরিশ বছর জৈব রসায়নের অগ্রগতি। যৌগের সঠিক সংকেতের প্রয়োজনীয়তা দারুণভাবে দেখা দিল। র‍্যাডিকাল (মূলক) সম্পর্কে হরেকরকম তত্ত্ব পেশ করা হল। কিন্তু মুস্কিল আসান হল না। এমন বিভ্রান্তি ও বিতর্কের মাঝে আভোগাড্রো অধ্যাপনা ও গবেষণা করে চলেছেন নীরবে। এবার তাঁর দিকে একটু চোখ ফেরানো যাক।

কুড়িবছর বয়সে আইনশাস্ত্রে ডক্টরেট হয়ে আলমেডো আভোগাড্রো ওকালতি শুরু করেন। কোর্টকাছারি, মামলামোকদ্দমা আর সত্যিমিথ্যের আইনে তাঁর ভাবুক মন একাত্ম হতে পারে না। বছর তিনেক পর তিনি হঠাৎ বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। তড়িৎসংক্রান্ত এক গবেষণার মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞান জগতের কাছে পরিচিত হন। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারসেলির রয়াল কলেজে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর ঠিক ছবছর আগে ডালটনের পরমাণু তত্ত্ব আর কয়েক মাস আগে গে-লুসাকের গ্যাসীয়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। আর আভোগাড্রো ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে অণু সংক্রান্ত প্রকল্প প্রকাশিত করেন জার্নাল-দা-ফিজিক পত্রিকায়। এই লেখা কয়েকজন যারা দেখলো তারা ভাবলোনা। আর যারা পড়লো তারা বুঝলো না। সেবছর আয়োডিন আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হল কিন্তু অণুর কথা কেউ জানলো না। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি টুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। দেশের এক রাজনৈতিক আলোড়নে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। আভোগাড্রো আবার ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের নেশা তাঁকে ছাড়ল না। দশবছর পর রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন হয়। বন্ধ টুরিন বিশ্ববিদ্যালয় আবার খোলে। আভোগাড্রো আবার সেখানে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ শুরু করেন। আরও কুড়ি বছর অধ্যাপনা করার পর তিনি অবসর নেন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে আশি বছরের এই বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়। পৃথিবী জানলো না। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে যখন রসায়নবিদ্‌দের এক ঐতিহাসিক মহাসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তখন ডালটন, বার্জেলিয়াস, গে-লুসাক এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত বিজ্ঞানী আভোগাড্রো কেউ বেঁচে নেই।

কার্লসরুহে রসায়নবিদ সম্মেলন শুরু হয় ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬০ তারিখে। এই সভায় যোগ দেন বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী—ফ্রান্সের ফ্রিডেল, মেচাম, ভূর্ৎস্, ইংল্যাণ্ডের এন্‌ডারসন, ফ্রাংকল্যাণ্ড, রস্‌কো, রাশিয়ার মেণ্ডেলীভ, বাইলস্টাইন, ইতালির কানিৎজারো, জার্মানীর কেকুলে, কোলবে, কপ্, ভলার, লীবিগ, বেয়ার, আরলেনমাইয়ার, মিচারলিখ, বুনসেন। প্রায় একশো চল্লিশজন রসায়নবিদ এই আলোচনাসভায় যোগ দেন। প্রথম দিন মূলতঃ বিজ্ঞানীদের পুনর্মিলনের সুরে কাটলো। আর দ্বিতীয়

দিনের আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করা হল।

অধিবেশনের দ্বিতীয়দিন অ্যাটম, মলিকুল, র‍্যাডিকাল ও ইকুইভ্যালেন্ট কথাগুলোর ব্যবহারিক দিকগুলো খুঁটিয়ে দেখা হল। কিন্তু কোনও মতৈক্যে পৌঁছানো গেল না। শেষদিনের অধিবেশনে তিনটি মূল প্রশ্নকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে ঠিক করা হল। অ্যাটম ও মলিকুল কি আলাদা? মলিকুল কি পদার্থের সবচেয়ে ছোট অবস্থা যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়? ডালটনের 'কম্পাউন্ড অ্যাটম' (যৌগ-পরমাণু) ব্যাপার কি অবান্তর?

কেকুলের বক্তব্যে পরমাণু ও অণুর মধ্যে প্রভেদের সুর থাকলেও তা সোচ্চার নয়। তিনি 'ভৌত' ও রাসায়নিক' অণুর তফাতের কথা বললেন। এরপর অনেকে বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু কারও কথা যুক্তির আলোকে স্পষ্ট হল না। অণু ও পরমাণুর জটিলতা আরও কঠিন আকার ধারণ করলো।

এবার ইতালির চৌত্রিশ বছরের যুবক স্তানিসলাও কানিৎজারো মঞ্চে এলেন। আভোগাড্রোর প্রকল্প তাঁর কাছে তখন বাস্তব সত্য। সমকালীন তত্ত্বগুলিকে অণুর বাস্তব যুক্তি দিয়ে তিনি ছাত্রদের বোঝাতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পাঠ্যধারা পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সুবক্তা কানিৎজারো তাঁর বক্তৃতায় আভোগাড্রো প্রকল্পের বৈশিষ্ট ব্যাখ্যা করলেন। যাঁরা আভোগাড্রোকে মেনে নিয়ে রসায়নকে ব্যাখ্যা করে চলেছেন তাঁদের কথা ও যুক্তি তিনি তুলে ধরলেন! ভ্যুমার বাষ্প ঘনত্ব গবেষণার সমর্থনের তিনি সোচ্চার হলেন। অণুর অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে তার ভিত্তিতে পরমাণুভরের হিসেব করে দেখালেন। সভায় আবেদন করলেন যে, আভোগাড্রো প্রকল্পের ভিত্তিতে হিসেব করা পারমাণবিক ও আণবিক ভর যেন বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি পায়। কেউ কেউ মোটামুটি সমর্থন করলেও অনেকে এ ব্যাপারে আপত্তি জানালেন। সভা দ্বিধাবিভক্ত। কেউ কেউ ভোটাভুটির প্রস্তাব তুললেন, শেষ পর্যন্ত ঠিক হল —বিজ্ঞানের ব্যাপার নিয়ে কখনই ভোট হতে পারে না। সভা অনিশ্চয়তার মাঝে শেষ হল, কোনও সিদ্ধান্ত হল না। পঞ্চাশ বছর পরও আভোগাড্রো অন্তরালে রয়ে গেলেন।

এই মহাসভার সবটাই কিন্তু বৃথা যায়নি। কানিৎজারোর সোচ্চার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মাঝে আভোগাড্রোর অণু আবার নতুন করে ভাবনায় সুযোগ পেল। আভোগাড্রোর প্রকল্প সম্বলিত যে নিবন্ধ তিনি পত্রিকায় ছেপেছিলেন তার কিছু কপি কানিৎজারো সভায় বিলি করেছিলেন। যা হয় বেশিরভাগ কপি আবর্জনার সঙ্গে গেল। সামান্য কয়েকজন লেখার বিষয়বস্তু গুরুত্ব দিয়ে পড়লেন। যার মধ্যে একজন হলেন লোথার মেয়ার। পরে তাঁর প্রকাশিত (১৮৬৪) রসায়ন বইতে স্থান পেল আভোগাড্রোর প্রকল্প ও অণুর কথা। মেন্ডেলীভ ও নিউল্যান্ড এই প্রকল্পকে গুরুত্ব দিলেন।

এদিকে কার্লসরুহে অধিবেশনে যখন রসায়নবিদদের অণুর আলোচনা চলছে, তখন জেমস ম্যাক্সওয়েল গ্যাসের কাইনেটিক তত্ত্বের গাণিতিক রূপ দিতে ব্যস্ত। তাঁর বিশ্লেষণে জানা গেল এক সেন্টিমিটার গ্যাসে অণুর সংখ্যা কত। আভোগাড্রোর সিদ্ধান্ত গাণিতিক হিসেবে প্রথম প্রমাণিত হল। তারপর জাঁ পেরিঁ অদ্রবনীয় রজনের মিহি গুঁড়োকে জলের মাঝে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আলোড়িত করে আরও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণায় রূপান্তরিত করলেন। এবার এর এক ফোঁটা জল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে তার উপর আলো ফেলে যন্ত্রের মাধ্যমে কণাগুলোকে দেখতে লাগলেন। যেই একটা কণা সামনে এলো একটা আলোর ঝিলিক দেখলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে পেরিঁ এই আলোর ঝিলিকের সংখ্যা গুনলেন। প্রতিটি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট মাত্রার বস্তুর মধ্যে অণুর সংখ্যা দেখা গেল একই। প্রায় একশো বছর পর (১৯০৮) আভোগাড্রোর কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হল। তারপর রবার্ট মিলিকান ও আরভিং ল্যাংমুরের পরীক্ষায় আভোগাড্রোর সত্যতা প্রমাণিত হল। আভোগাড্রোর প্রকল্প প্রণয়নের ঠিক একশো বছর পর যখন কানিৎজারো মারা যান তখন তিনি অণুর সত্যতার প্রমাণ দেখে গেছেন। এর পর রসায়নে শৃঙ্খলা ফিরে আসে অণুর অরুন আলোকে। আভোগাড্রো প্রকল্প রূপান্তরিত হয় আভোগাড্রো সূত্রে।

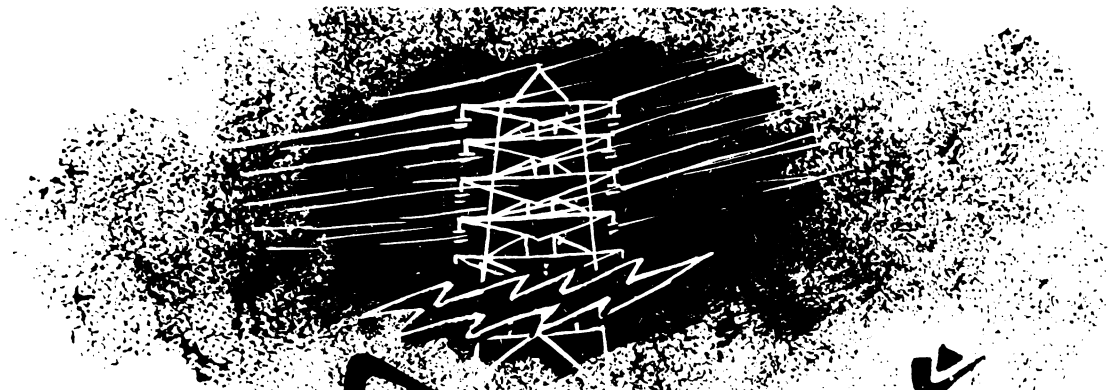

আরো বিদ্যুতের খোঁজে

জয়ন্ত বসু

'কিশোর বিজ্ঞানী'র সম্পাদক অনুরোধ করেছেন শারদ সংখ্যায় একটা লেখা দেওয়ার জন্যে। বিষয় সম্বন্ধে তাঁর কোন বক্তব্য নেই—মনে হয় বিষয়ে ভদ্রলোকের অনাসক্তি। আমি কিন্তু বিষয়-বিষে জর্জরিত হচ্ছি মানে বিষয় নির্বাচনের বিষে। নানান বিষয় এসে মাথায় সজোরে টোকা দিয়ে যাচ্ছে। কাকে ছেড়ে কাকে ধরি কেই বা এমন আহা মরি। যা হোক, আমি একটা সিদ্ধান্তে প্রায় এসে গেছি, এমন সময়ে একটি অঘটন ঘটে গেল। বিদ্যুৎ চলে গিয়ে ঘর অন্ধকার। এ যেন ঠিক গোল দিতে যাওয়ার সময়ে হাফ-টাইমের বাঁশি বাজলো। লোড-শেডিং নাকি বিভ্রাট? মনে পড়লো সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কথা, যেটা ঘটেছিল বিহারের অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গ যখন কয়েক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিহারকে দিতে গেছিলো। বিহার বুঝি পশ্চিমবঙ্গের বাড়ানো সাহায্যের হাত বেশ করে মুচড়ে দিয়েছিল ১৫০।২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ হু-হু করে টেনে নিয়ে। প্রায় ২৪ ঘণ্টা ধরে পশ্চিমবঙ্গের বহু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ, এ রাজ্যে শহুরে জনজীবন তো অনেকখানি স্তব্ধ।

আচ্ছা, বিদ্যুৎ-শক্তির বিষয় নিয়ে কিছু লিখলে হয় না! —হ্যারিকেনের আলোয় লিখতে বসে এ কথা মনে আসে। বর্তমান সভ্যতার মেরুদণ্ড বলা যেতে পারে বিদ্যুৎ শক্তিকে। এবং সভ্যতার চাহিদা যত বাড়ছে, মেরুদণ্ডের জোর অর্থাৎ বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ ততই বাড়াবার দরকার হচ্ছে। এজন্য চেষ্টা চলেছে বিদ্যুতের নতুন উৎস উদ্ভাবনের যা থেকে বলতে গেলে অফুরন্ত শক্তি পাওয়া যেতে পারে। এই উৎসকে সাধারণ ভাবে কৃত্রিম সূর্য বলা হয়, কারণ এটি আকারে সূর্যের চেয়ে, বলা বাহুল্য, অনেকাংশে ছোট হলেও প্রকৃতিতে প্রায় একই রকম। বিদ্যুতের বিষয় অনেকেরই কিছু না কিছু জানা আছে, কিন্তু এই সম্ভাব্য নতুন উৎস সম্বন্ধে জ্ঞান কতখানি?

যে সব উদ্ভাবন এখনো গবেষণা-গর্ভে সেগুলি সম্পর্কে স্বভাবতই সমাজে তেমন সচেতনতা নেই, কিন্তু সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন সম্বন্ধে বেশ কিছুটা সচেতনতার দরকার আছে। কেননা দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব আমাদের দেখিয়েছে, প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার যুগে কোন উদ্ভাবনের জন্ম হওয়ার অল্প কালের মধ্যেই সমাজে তাকে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

পরীক্ষামুখী শিক্ষাব্যবস্থার দৌলতে আমরা সকলেই তো প্রশ্নোত্তর ব্যাপারটার সঙ্গে ভাল ভাবে পরিচিত। কৃত্রিম সূর্য সম্বন্ধে আমি যে দু'চার কথা এখন বলতে চাই, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তা পেশ করবো। ইচ্ছে করলে তুমি এটাকে একটা মজার পরীক্ষা হিসেবেও ভাবতে পারো, যাতে তুমি উত্তরদাতাও বটে, পরীক্ষকও বটে। আমি নিম্ন ৫টি প্রশ্ন দিচ্ছি এবং প্রত্যেক প্রশ্নের পর তার উত্তরও। ধরা যাক, প্রতি প্রশ্নে নম্বর আছে ২০। ইচ্ছে করলে তুমি প্রশ্ন পড়ে তার উত্তর নিজের মনে ভাবতে পারো (চাই কি, লিখেও ফেলতে পারো) এবং তারপর সেই উত্তরকে মিলিয়ে দেখতে পারো প্রদত্ত উত্তরের সঙ্গে। এরই ভিত্তিতে তোমার নিজের বিচার অনুযায়ী তোমার উত্তরের জন্যে নম্বর দাও। এইভাবে তুমি ১০০-এর মধ্যে মোট যত নম্বর পাবে, তা থেকে কিছুটা ধারণা করতে পারবে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের।

* * * *

প্রশ্ন ১ : বিদ্যুৎ উৎপাদনের নানারকম উৎস থাকলেও কৃত্রিম সূর্যরূপ নতুন উৎস উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

উ : বর্তমান বিশ্বে উৎপন্ন মোট বিদ্যুৎ শক্তির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ পাওয়া যায় জীবাশ্ম জ্বালানি কয়লা ও পেট্রোলিয়াম থেকে। কিন্তু মানুষের চাহিদা মেটাতে 'কালো হীরে' আর 'তরল সোনার' মজুদ এত দ্রুত হারে কমে আসছে যে, আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই মাটির নিচে এই হীরের সব ভাঁড়ার কার্যত শূন্য হয়ে যাবে ; তরল সোনার সঞ্চয় তো নিঃশেষ হয়ে যাবে তার অনেক আগেই। জলের গতীয় শক্তি, বায়ুশক্তি ইত্যাদি থেকে যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, চাহিদার তুলনায় তা খুবই কম। সৌর শক্তি অকৃপণভাবে পৃথিবীতে ঝরছে বটে কিন্তু তার দাক্ষিণ্য এত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর প্রসারিত যে, তা দিয়ে কিছু কিছু আঞ্চলিক কাজকর্ম সম্ভব হলেও ব্যাপক চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে পারমাণবিক চুল্লী চালু রয়েছে, তা হল বিভাজন চুল্লী (fission reactor) ; ইউরেনিয়ামের মতন অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে অর্থাৎ প্রায় সমান দু' খণ্ডে ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে এই চুল্লিতে শক্তি উৎপন্ন হয়। বিভাজন চুল্লির উপযোগী জ্বালানি মেলে যে ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম থেকে, পৃথিবীর বুকে তাদের সঞ্চয় সীমিত হওয়ায় বিভাজন চুল্লীর ব্যাপক ব্যবহার শক্তির অনটনকে খুব বেশি হলে কয়েক দশক হয়তো পিছিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া এই ব্যাপক ব্যবহারের একটি বড় সমস্যাও আছে। বিভাজন চুল্লিতে যে তেজস্ক্রিয় ভস্ম উৎপন্ন হয়, তার সদ্গতি করা এক দুরূহ সমস্যা। ২০০০ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীতে যে মোট শক্তির চাহিদা হবে যদি কেবল বিভাজন চুল্লি থেকে সংগ্রহ করা হয়, তাহলে যে তেজস্ক্রিয় ভস্মের সৃষ্টি হবে, তা প্রায় এক কোটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় ভস্মের সমান। বিভাজন চুল্লি ব্যবহার করলে থ্রী-মাইল আইল্যাণ্ড বা চের্ণোবিলের মতন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কৃত্রিম সূর্যরূপ যে নতুন উৎস গঠনের চেষ্টা হচ্ছে, তাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় 'সংযোজন চুল্লী' (fusion reactor) হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডিউটেরিয়ামের মতন অপেক্ষাকৃত হাল্কা পরমাণুর নিউক্লিয়াস পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গেলে সেই সংযোজন বিক্রিয়ায় অনেকখানি শক্তি উৎপন্ন হয়। মূলত একই ধরনের বিক্রিয়ায় অবিরত শক্তির উৎপাদন হচ্ছে সূর্যে—সূর্যের অমিত তেজের এই হল জন্ম কথা। সংযোজন চুল্লীর মূল জ্বালানি যে ডিউটেরিয়াম, তা সমুদ্রের জলে পাওয়া যায়। সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে যে ডিউটেরিয়াম আছে, তার পরিমাণ হল $১০^{১৫}$ টন অর্থাৎ যদি এমন আধার তৈরী করা যেত, যাতে এক কোটি টন ডিউটেরিয়াম ধরে, তাহলে সেইরকম এক কোটি আধার ভর্তি হয়ে যেত ঐ ডিউটেরিয়ামে। সংযোজন চুল্লীতে এই ডিউটেরিয়ামকে ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যেতে পারে, তার পরিমাণ হল $১০^{১৮}$ মেগাওয়াট ঘণ্টা। এই বিপুল শক্তি মানব সভ্যতার ক্রমবর্ধমান ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারবে কয়েক শো কোটি বছর ধরে।

বিভাজন চুল্লীর তুলনায় সংযোজন চুল্লী থেকে তেজস্ক্রিয় দূষণের সম্ভাবনা অনেক কম। এই চুল্লীতে কিছু কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হবে ঠিকই কিন্তু তাদের পরিমাণ বেশি নয় এবং তাদের তেজস্ক্রিয়তার জীবনকাল তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট কম। আরো একটি কথা—সংযোজন চুল্লীতে দুর্ঘটনা হলেও তা কখনোই বিভাজন চুল্লীর মতন ভয়াবহ হবে না। বিভাজন চুল্লীর মধ্যে বেশ কিছুটা জ্বালানি থাকে, চুল্লী নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে মাত্রাতিরিক্ত বিভাজনের ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সংযোজন চুল্লীতে যে কোন সময়ে

জ্বালানির পরিমাণ কম জ্বালানি যেমন নিঃশেষিত হতে থাকে, বাইরে থেকে সেই হিসেবে জ্বালানি চুল্লীতে সরবরাহ করা হয়। সেজন্যে এক্ষেত্রে তেমন কোন বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে না।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কৃত্রিম সূর্যের মতন শক্তি উৎপাদনের কোন নতুন উৎস তৈরি করা ক্রমেই জরুরী হয়ে উঠছে। আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি :

বিশ্ব জুড়ে ঘনিয়ে আসে লোড-শেডিংয়ের ভয়
ক্ষুদে সূর্য তৈরি হলে মুশকিল আসান হয় !

* * *

প্রশ্ন ২ : সংযোজন চুল্লী নির্মাণের জন্যে চেষ্টা চলেছে গত প্রায় ৩০/৪০ বছর ধরে। এখনো এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নি কেন ?

উঃ সার্থক সংযোজন চুল্লী তৈরি করা একটি অত্যন্ত দুরূহ সমস্যা। অনেক বিজ্ঞানী তো একে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন। প্রথমত, এই চুল্লীর মধ্যে পদার্থকে প্রচণ্ড রকম উষ্ণ হতে হবে - সূর্যের কেন্দ্রস্থলে যে উষ্ণতা, তার চেয়ে এই উষ্ণতা অন্তত ৬।৭ গুণ বেশি হওয়া দরকার। সূর্যের কেন্দ্রস্থলে উষ্ণতা যেখানে প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস, সংযোজন চুল্লীতে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থাতেও সেখানে উষ্ণতা হতে হবে ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরকম উষ্ণতায় পদার্থ থাকে তার চতুর্থ অবস্থায়—যেমন রয়েছে সূর্যে। একে বলা হয় প্লাজমা অবস্থা। প্লাজমার মধ্যে অণু পরমাণুরা অক্ষত থাকে না, সেগুলি ভেঙ্গে গিয়ে নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন মুক্ত ভাবে বিরাজ করে। এখন, সব নিউক্লিয়াসই ধনাত্মক আধানযুক্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে বিকর্ষণ কাজ করে, এবং তারা যত পরস্পরের কাছে আসে, এই বিকর্ষণের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে। ফলে নিউক্লিয়াসরা সাধারণত পরস্পরের কাছে আসতে পারে না। কিন্তু প্লাজমার উষ্ণতা যথেষ্ট বেশি হলে নিউক্লিয়াসরা যথেষ্ট গতিশীল হয় এবং প্রচণ্ড গতির ফলে বিকর্ষণ সত্ত্বেও পরস্পরের খুব কাছে চলে আসতে পারে। তখন নিউক্লীয় বল কার্যকর হয় এবং দুটি নিউক্লিয়াস পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে যায় অর্থাৎ সংযোজন ঘটে। প্রাকৃতিক সূর্যের তুলনায় কৃত্রিম সূর্যের আয়তন অনেকাংশে কম ; সেজন্যে উৎপন্ন শক্তির সঙ্গে বিকিরণের ফলে বিনষ্ট শক্তির অনুপাত এক্ষেত্রে অনেকখানি বেশি। এই ব্যাপারটাকে সামাল দেবার জন্যে কৃত্রিম সূর্যের উষ্ণতা প্রাকৃতিক সূর্যের কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি হওয়া দরকার, এরকম উষ্ণতা সৃষ্টি করতে পারা সহজ কথা নয়।

সার্থক সংযোজন চুল্লী নির্মাণের দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে এই যে, চুল্লীর ভিতরের অত্যন্ত উষ্ণ প্লাজমা নিমেষের মধ্যেই চারধারে ছড়িয়ে পড়তে চায় কিন্তু তাকে অন্তত কিছুক্ষণ আধারের মধ্যে এমন ভাবে আবদ্ধ করে রাখা দরকার যাতে তা আধারের দেওয়াল স্পর্শ না করে। কারণ তা করলে প্লাজমার উষ্ণতা অনেক কমে যাবে এবং সংযোজনে বিক্রিয়া যাবে বন্ধ হয়ে। আবার, এই যে আবদ্ধ প্লাজমা, তার মধ্যে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া দরকার, কেননা নিউক্লিয়াস বেশি থাকলে তবেই তো তাদের সংযোজনের ঘটনাও বেশি হবে। বস্তুত নিউক্লিয়াসের সংখ্যা ও আবদ্ধকরণের সময় সম্পর্কিত একটি শর্ত আছে, যা পালিত হলে তবে সংযোজন চুল্লী সার্থক হবে। বিজ্ঞানী জে. ডি. লসনের নাম অনুযায়ী একে বলা হয় 'লসনের শর্ত'। যদি প্লাজমায় প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা n হয় ও আবদ্ধকরণের সময় হয় t সেকেণ্ড, তাহলে সংযোজন চুল্লীর সাফল্যের জন্যে লসনের শর্ত অনুযায়ী n ও t-এর গুণফলকে একটি নির্দিষ্ট মানের চেয়ে অবশ্যই বেশি হতে হবে। চুল্লীতে জ্বালানি হিসেবে যদি কেবল ডিউটেরিয়াম ব্যবহার করা হয়, তাহলে এই মান হল $১০^{১৬}$। আর যদি জ্বালানী হয় ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের (হাইড্রোজেনের অন্য আইসোটোপ) মিশ্রণ, তাহলে উক্ত মান হচ্ছে $১০^{১৪}$। বাস্তব ক্ষেত্রে লসনের শর্ত সার্থক সংযোজন চুল্লী নির্মাণের একটি প্রধান অন্তরায়।

অত্যুষ্ণতা, লসন শর্ত : বিরাট দৈত্য দুই,
তাদের বশ করলে তবে সাফল্যকে ছুঁই।

* * *

প্রশ্ন ৩ : সংযোজন চুল্লী নির্মাণের জন্যে কোন্ কোন্ ধরনের প্রচেষ্টা হয়েছে বা হচ্ছে ?

উঃ সংযোজন চুল্লী নির্মাণের বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টাকে মূলত নিম্নলিখিত দু ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) চৌম্বক আবদ্ধকরণ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে চুল্লীর আধারের মধ্যে উষ্ণ প্লাজমার সৃষ্টি করে চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে তৈরি এক অদৃশ্য পিঞ্জরে তাকে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করা হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের একটি ধর্ম এই যে, তা গতিশীল আহিত কণার (অর্থাৎ বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কণার) গতিকে প্রভাবিত

করতে পারে। বিশেষ ব্যবস্থায় চুল্লীর আধারের মধ্যে যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করা হয়, তার কাজ হল প্লাজমা থেকে বেরিয়ে আসা পলায়ন পর আহিত কণার গতির অভিমুখ এমন ভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া যে, তা আবার প্লাজমার মধ্যে ঢুকে যায়। চৌম্বক আবন্ধকরণের ভিত্তিতে যে নানারকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলির নাম হল টোকাম্যাক, স্টেলারেটর, চৌম্বক দর্পণ, ফেরোম্যাক ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে প্লাজমার প্রতি ঘন সেন্টি-মিটারে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা মোটামুটি ভাবে $১০^{১৪}$। সুতরাং লসনের শর্ত পালিত হওয়ার জন্যে ডিউটেরিয়াম-ট্রিটিয়াম জ্বালানির ক্ষেত্রে প্লাজমার আবন্ধকাল অন্তত ১ সেকেণ্ড হওয়া দরকার, আর কেবল ডিউটেরিয়াম জ্বালানি হলে অন্তত ১০০ সেকেণ্ড।

চৌম্বক আবন্ধকরণ ব্যবস্থায় প্লাজমাকে উষ্ণ করা হয় উচ্চমাত্রার বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে। যেহেতু প্লাজমার বৈদ্যুতিক রোধ আছে, সেজন্যে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ গেলে তাপের উদ্ভব হয়। আমাদের সুপরিচিত বৈদ্যুতিক হিটারে যে কারণে তাপের উদ্ভব হয়, মূলত সেই কারণে আর কি! তবে এক্ষেত্রে বিদ্যুৎপ্রবাহ অনেক বেশি হওয়ায় তাপও হয় প্রচণ্ড। এইভাবে প্লাজমার উষ্ণতা বাড়ানোর অবশ্য একটা সীমা আছে। কেননা প্লাজমা যথেষ্ট উষ্ণ হলে তা অত্যন্ত সুপরিবাহী হয়ে যায়, তার রোধ হয়ে যায় নগণ্য। বিদ্যুৎপ্রবাহ বাড়িয়েও তার উষ্ণতা আর বাড়ানো যায় না। এ জন্যে প্লাজমার উষ্ণতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পরিপূরক ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। যেমন, অত্যন্ত গতিশীল বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণাগুচ্ছকে প্লাজমার মধ্যে পাঠিয়ে তার গতিশক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করে প্লাজমার উষ্ণতা বাড়ানো যায়। অত্যন্ত শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ এবং মাইক্রো-তরঙ্গকেও প্লাজমার উষ্ণতা বাড়ানোর কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে।

(২ জাড্যজনিত আবন্ধকরণ ব্যবস্থায় লেসার নামক বিশেষ রকম আলোর উৎস থেকে সুতীব্র রশ্মি নিক্ষেপ করা হয় ডিউটেরিয়াম-ট্রিটিয়াম খণ্ডের উপর। ঐ খণ্ডটি নিমেষের মধ্যে উষ্ণ প্লাজমায় রূপান্তরিত হয় এবং প্রথমে সংকোচনের ফলে তার ঘনত্ব যায় খুব বেড়ে। তবে সামান্য সময় পরে প্লাজমা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পদার্থের জাড্য ধর্মের জন্যেই প্লাজমার এই সময়টুকু আবন্ধ হয়ে থাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেসার রশ্মির পরিবর্তে দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুচ্ছ বা আয়নগুচ্ছকেও প্লাজমা তৈরি করবার কাজে ব্যবহার করা হয়। এসব ক্ষেত্রে ঘন প্লাজমার আবন্ধকাল মোটামুটি ভাবে মাত্র ১ ন্যানো-সেকেণ্ড অর্থাৎ ১ সেকেণ্ডের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ। কিন্তু প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা ১০ হতে পারে বলে লসনের শর্ত পালিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সংযোজন চুল্লীর উপযোগী প্লাজমা সৃষ্টি করবার পদ্ধতি সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যায়

উষ্ণ প্লাজমা তৈরি করো আধারের ভিতরে
বিদ্যুৎপ্রবাহ ইত্যাদিকে কাজে ঠিক লাগিয়ে,
কিছুক্ষণ ধরো তাকে চৌম্বক পিঞ্জরে।
অথবা তীব্র রশ্মি বা কণাগুচ্ছ দিয়ে
উষ্ণ ও ঘন প্লাজমা সৃষ্টি করালে
ক্ষণেক তা থাকবে ধরা জাড্যের জালে।

* * *

প্রশ্ন ৪: কৃত্রিম সূর্য গঠনের উদ্দেশ্যে তৈরি নানা-রকম যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ যে টোকাম্যাক যন্ত্র, সেটি তো চৌম্বক আবন্ধকরণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই যন্ত্রের মধ্যে কিভাবে প্রচণ্ড বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা হয়? কি ভাবেই বা সৃষ্টি করা হয় চৌম্বক পিঞ্জরের?

উঃ টোকাম্যাক যন্ত্রে একটি বলয়াকৃতি ধাতব আধারকে অনেকাংশে বায়ুশূন্য করে তার মধ্যে প্রচণ্ড বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা হয় বিদ্যুৎচুম্বকীয় আবেশের সাহায্যে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ট্রান্সফর্মার নামক যান্ত্রিক উপাদানের কথা আমরা অনেকেই জানি - টোকাম্যাক যন্ত্রে বলয়াকৃতি আধার একটি বড় ট্রান্সফর্মারের গৌণ কুণ্ডলী হিসেবে কাজ করে। কোন উপযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে ঐ ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে উচ্চমাত্রার পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠানো হয়; বিদ্যুৎচুম্বকীয় আবেশের ফলে তখন বলয়াকৃতি আধারের মধ্যে বিভব—পার্থক্য বা ভোল্টেজের সৃষ্টি হয় এবং তাই থেকে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ। যেহেতু এক্ষেত্রে মুখ্য কুণ্ডলীতে অনেকগুলি পাক থাকে আর গৌণ কুণ্ডলী মাত্র একটি পাকের, সেজন্যে ট্রান্সফর্মারের নিয়ম অনুযায়ী গৌণ কুণ্ডলী অর্থাৎ বলয়াকৃতি আধারে আবিষ্ট বিদ্যুৎ-প্রবাহ মুখ্য কুণ্ডলীতে উচ্চমাত্রার বিদ্যুৎপ্রবাহের চেয়েও বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহ বলয়াকৃতি আধারে প্লাজমার সৃষ্টি করে তাকে উত্তপ্ত করে তোলে 'জুল তপ্তকরণ' পদ্ধতিতে অর্থাৎ রোধযুক্ত পদার্থের মধ্য

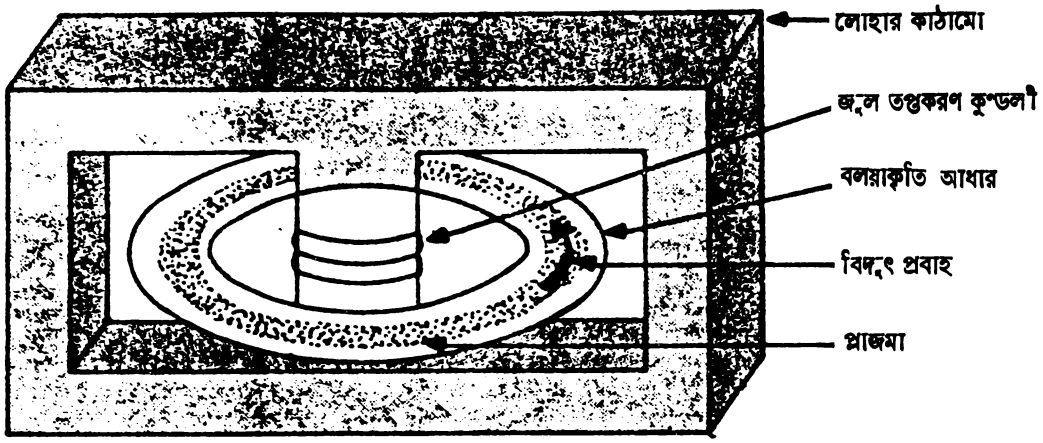

১ নং চিত্র টোকাম্যাক যন্ত্রের বলয়াকৃতি আধারে বিদ্যুৎ প্রবাহের উৎপত্তি

দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ গেলে বৈদ্যুতিক শক্তি যে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেই পদ্ধতিতে। এজন্যে টোকাম্যাকের ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীকে বলা হয় 'জুল তপ্তকরণ কুণ্ডলী (Joule heating coil)। ১নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, ট্রান্সফর্মারে তেমনি লোহার কাঠামো ব্যবহার করলে জুল তপ্তকরণ কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প

থাকায় এবং অন্যান্য দু' একটি অসুবিধার জন্যেও বর্তমানে অনেক টোকাম্যাক যন্ত্রে, বিশেষত খুব বড় যন্ত্রগুলিতে বায়ু মাধ্যমেই বিদ্যুৎচুম্বকীয় আবেশের কাজটি হয়ে থাকে।

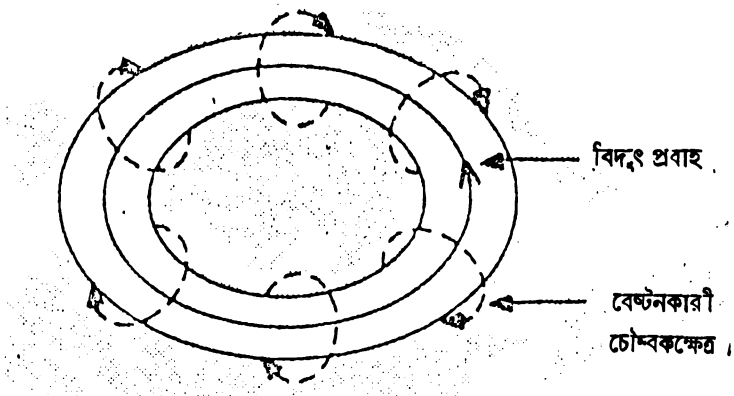

২ নং চিত্র—বলয়াকৃতি আধারে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি

বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে বলয়াকৃতি আধারের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা যায়। তবে এর সীমাবদ্ধতা টোকাম্যাকের বলয়াকৃতি আধারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে যে চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয় (২নং চিত্র

দ্রষ্টব্য), তাকে বলা হয় 'বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র'। বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ার প্লাজমার উপর যে চাপের সৃষ্টি হয়, তাইতে আধারের মধ্যে দেওয়াল থেকে দূরে প্লাজমাকে আবদ্ধ করে রাখা যাবে, এরকম আশা করা হয়েছিল এক সময়ে। বস্তুত পঞ্চাশের দশকে ইংল্যান্ডের জিটা (ZETA) নামক যন্ত্রে এইভাবে সংযোজনের উপযোগী প্লাজমা তৈরি করা গেছে বলে মনে করা হয়েছিল। পরে দেখা গেল, সে ধারণা ঠিক নয়। ষাটের দশকে রাশিয়ায় যে টোকামাক যন্ত্র উদ্ভাবিত হল, তাতে বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়াও শক্তিশালী বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হল অনেকগুলি ক্ষেত্র কুণ্ডলী ব্যবহার করে ৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য। বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র ও বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্র, এই দুইয়ের সমন্বয়ে যে চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়, তাতে আধারের মধ্যে প্লাজমা-কণাগুলির আবদ্ধ হয়ে থাকবার কথা। তবে বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্রের মান আধারের ভিতরের দিকে বাইরের দিকের চেয়ে বেশি হওয়ায় ভিতরের দিক থেকে প্লাজমার উপর চাপ বাইরের দিক থেকে চাপের চেয়ে বেশি। এজন্যে প্লাজমার বাইরের দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। প্লাজমার এই গতি রোধ করবার জন্যে বলয়াকৃতি আধার থেকে কিছুটা উপরে ও কিছুটা নিচে তার কুণ্ডলী রেখে উল্লম্ব চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্র, বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র ও উল্লম্ব চৌম্বক ক্ষেত্র, মূলত এই তিনটি উপাদান দিয়ে টোকাম্যাকের চৌম্বক পিঞ্জর গঠিত।

টোকাম্যাক যন্ত্রে বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বক পিঞ্জর সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমরা এ রকম একটা ছড়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারি

টোকাম্যাক যন্ত্রের বলয় আধারে
বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে আবেশের বশে,
চৌম্বক ক্ষেত্রও গড়ে নিজের হরষে।
তাছাড়া কুণ্ডলী কত ঘিরে বলয়টারে
এবং ওপরে নিচে ক্ষেত্র গড়ে সবে।
উদ্দেশ্য : উত্তপ্ত প্লাজমা বন্দী হয়ে রবে।

* * * *

প্রশ্ন ৫ : সংযোজন চুল্লী নির্মাণের জন্যে টোকাম্যাক নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে, তার বর্তমান পরিস্থিতি কি? প্রধানত কোন্ কোন্ উপায়ে এই গবেষণায় অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে?

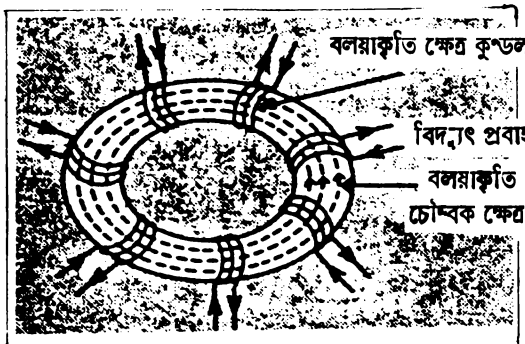

৩ নং চিত্র—টোকাম্যাকে বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎপত্তি।

উ : রাশিয়ার টি-৩ নামক টোকাম্যাক যন্ত্রে আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে, ১৯৬৮ সালে এ কথা ঘোষিত হওয়ার পর টোকাম্যাক সম্পর্কিত গবেষণা ক্রমাগতই বিস্তৃততর হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ব্রিটেন, জার্মানি প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে যেমন একদিকে টোকাম্যাক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি চীন, ব্রাজিল প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও টোকাম্যাক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। আনন্দের কথা আমাদের দেশেও টোকাম্যাক সম্বন্ধীয় গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে একটি টোকাম্যাক যন্ত্র চালু হয়েছে কলকাতার সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ। সম্প্রতি কয়েক মাস আগে আর একটি টোকাম্যাক আংশিক ভাবে চালু হয়েছে গুজরাটের গান্ধীনগরে ইনস্টিট্যুট ফর প্লাজমা রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠানে।

এ পর্যন্ত যে সব টোকাম্যাক নির্মিত হয়েছে, সেগুলি নানা আকারের। বড় টোকাম্যাকের বলয়াকৃতি আধারই যে কেবল বড়, তা নয়, সাধারণত তাতে বিদ্যুৎপ্রবাহ, চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদির মানও বেশি। বর্তমানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য টোকাম্যাক হল :—ইউরোপের জেট (জয়েন্ট ইউরোপীয়ান টোরাস—ইংল্যান্ডে অবস্থিত), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টি এফ টি আর, জাপানের জে টি-৬০ ও রাশিয়ার টি-১৫। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হল জেট এর বলয়াকৃতি আধার। এত বড় যে তার মধ্য দিয়ে একজন মানুষ সহজে হেঁটে যেতে পারে। এতে বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ কয়েক মেগা-অ্যামপীয়ার, বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্র কয়েক টেসলা (১ টেসলা = ১০,০০০ গাউস)। এরকম ২।১টি

যন্ত্রে প্লাজমার উষ্ণতা এতখানি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে যে, তা সংযোজন চুল্লীর পক্ষে উপযোগী। আবার অন্য যন্ত্রে পালন করা গেছে লসনের শর্ত। আশা করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে সংযোজন চুল্লী তৈরি করবার দুটি শর্তই এক সঙ্গে পালন করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে এত আশাবাদী যে পরবর্তী পর্যায়ের টোকাম্যাক নির্মাণের কিছু কিছু পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। যেমন জেট-এর উত্তরসূরী হবে নেট (নেকস্ট ইউরোপীয়ান টেরাস)। আন্তর্জাতিক ভাবে ইনটর নামে একটি টোকাম্যাক নির্মাণের তোড়জোড় আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু সেই প্রচেষ্টা এখন অনেকটা স্তিমিত। তবে উন্নত দেশগুলি যৌথ ভাবে আর একটি বিরাট টোকাম্যাক নির্মাণের জন্যে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে।

প্রধানত যে যে উপায়ে টোকাম্যাক সম্বন্ধীয় গবেষণায় লক্ষণীয় অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, সেগুলি নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

১) তপ্তকরণের পরিপূরক ব্যবস্থা—শক্তিশালী বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কণাগুচ্ছ বা উচ্চশক্তি সম্পন্ন বেতার তরঙ্গকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করে টোকাম্যাকের প্লাজমার উষ্ণতাকে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বস্তুত এই ভাবেই প্লাজমাকে সংযোজন চুল্লীর উপযোগী উষ্ণতায় পৌঁছে দেওয়া গেছে।

২) ডি-টি খণ্ডের অনুপ্রবেশ—টোকাম্যাক যন্ত্রে সাধারণতঃ ডিউটেরিয়াম—ট্রিটিয়াম (সংক্ষেপে ডি-টি) গ্যাসকে প্লাজমায় রূপান্তরিত করে তাকে উত্তপ্ত করা হয়। সাম্প্রতিক কালে পরীক্ষায় দেখা আছে যে, ঐ প্লাজমার মধ্যে যদি যথাসময়ে ক্ষুদ্রাকৃতি ডি-টি খণ্ডকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তা তৎক্ষণাৎ বাষ্পীভূত হয়ে প্লাজমায় রূপান্তরিত হয় এবং প্লাজমায় কণার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এই পদ্ধতিতেই লসনের শর্ত পালন করা সম্ভব হয়েছে।

৩) অতি পরিবাহী চুম্বকের ব্যবহার বিদ্যুৎবাহী উপাদান যদি অতিপরিবাহী হয়, তাহলে তার মধ্য দিয়ে বিপুল বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালেও তার রোধশূন্যতার ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সমস্যা থাকে না এবং এইভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী চুম্বক তৈরি করা যায়। এরকম অতি পরিবাহী চুম্বক (super conducting magnet) ব্যবহার করে টোকাম্যাকের চৌম্বক ক্ষেত্রকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

৪) প্লাজমার আকৃতির পরিবর্তন—কোন কোন টোকাম্যাকে (যেমন জেট-এ) বলয়াকৃতি আধারে প্লাজমার আকৃতিকে এমন করা হচ্ছে যে, তার উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদের আকৃতি বৃত্তাকার না হয়ে হয় ইংরেজি অক্ষর D-এর মতন। এর ফলে একই চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত বেশি চাপযুক্ত প্লাজমাকে (অর্থাৎ যে প্লাজমায় সমান উষ্ণতায় কণার সংখ্যা বেশি) আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব।

৫) অবিশুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ—প্লাজমার মধ্যে অবিশুদ্ধির (impurities) উপস্থিতি দূষণের কাজ করে। দূষিত পদার্থের উপস্থিতি যেমন মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, অবিশুদ্ধির উপস্থিতি তেমনি প্লাজমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বিশেষত কয়েক ধরনের অবিশুদ্ধি প্লাজমার মধ্যে থাকলে তা থেকে বিকিরণের ফলে শক্তির অপচয় অনেকাংশে বেড়ে যায় এবং প্লাজমা অত্যন্ত অল্প সময়েই উষ্ণতা হারায়। বলয়াকৃতি আকারের ভিতরের দেওয়ালকে যাতে যথাসম্ভব পরিষ্কার অক্ষত রাখা যায়, তার জন্যে নানান ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্লাজমায় অবিশুদ্ধির পরিমাণকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা গেছে। সম্প্রতি জেট-এর আধারের দেওয়ালে বেরিলিয়ামের প্রলেপ দিয়ে আরো সার্থক ভাবে অবিশুদ্ধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হচ্ছে।

শক্তির নতুন উৎস সন্ধানে টোকাম্যাক গবেষণার পথে অভিযাত্রী যাঁরা, আজ তাঁদের মনের কথা হল

হরেক রকম টোকাম্যাকে বিশ্ব জুড়ে সাধনা
সাফল্য তো আধেক ধরা—বাকি আধেক পাব না ?

ডেভির শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মোটামুটি পৌনে দুশো বছর আগেকার কথা।

সে সময় লণ্ডনে বিখ্যাত এক বইয়ের দোকানে প্রায়ই দেখা যেত একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য।

দোকানের সমস্ত কর্মচারী যখন বই বিক্রি করতে হিমসিম খাচ্ছে, তখন কুড়ি-পঁচিশ বছরের একটি যুবক দোকানের এক কোণে বসে মন দিয়ে বই পড়ছে। যুবকটিও ঐ দোকানেরই কর্মচারী। আর শুধু তো পড়া নয়, এমন মন দিয়ে পড়া যে, ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না। অবশ্য অন্য কর্মচারীরা কেউ ডেকে বিরক্তও করতো না।

দোকানের মালিক শুধু পুস্তক বিক্রেতা নন, একজন নামকরা প্রকাশকও। তিনি অতিশয় সজ্জন এবং শিক্ষিত। শহরের বহু জ্ঞানী, গুণী লোকের সঙ্গে তাঁর চেনাশোনা।

ভদ্রলোক অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন যুবকটিকে। এর একটা বড় কারণ, যুবকটির দুঃখের ছেলেবেলাটা তিনি জানতেন। আর সেটা মাঝে মাঝেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো। চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে যুবকটি। তার বাবা ছিলেন একজন সামান্য চর্মকার।

যাই হোক, একদিন সেই দোকানে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এক সুদর্শন ভদ্রলোক। তিনি এসেছেন একটি বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির তরফ থেকে। সঙ্গে একটি সেমিনারের নিমন্ত্রণপত্র। ঐ সেমিনারের আয়োজন একটি আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে। এবং বলাই বাহুল্য, আয়োজক ঐ বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিটি।

কয়েক মাস আগে এই দেশেরই বৈজ্ঞানিক, স্যার হামফ্রে ডেভি এক ধরনের আলো আবিষ্কার করেছেন, যা খনি-শ্রমিকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ।

মাটির নীচে খনির মধ্যে কয়লা কাটার সময়, বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক গ্যাস বেরিয়ে আসে। এদিকে খনির অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে আলোরও দরকার। কিন্তু গ্যাসের মাত্রা বেশি হলে, প্রায়ই বিস্ফোরণের সৃষ্টি হতো।

স্যার হামফ্রে ডেভি আবিষ্কৃত 'ডেভিস সেফ্‌টি ল্যাম্প' সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

আবিষ্কারের পর স্যার ডেভি, এই আলোর নক্সা ঐ এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিকে বিক্রি করে দেন বিশাল অর্থের বিনিময়ে। এবং প্রাপ্ত মূল্যের সবটাই খনি-শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য দান করেন।

সেই স্যার হামফ্রে ডেভি-ই ঐ সেমিনারের প্রধান বক্তা।

প্রকাশক ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। তিনি নিমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু উপস্থিত থাকার প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না।

আগন্তুক ভদ্রলোক চলে যাবার পর তিনি যুবকটিকে

ডেকে বললেন,—আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি ঐ সেমিনারে চলে যাও। স্যার হামফ্রে ডেভি'র মত লোকের মুখোমুখি বসে বক্তৃতা শোনাটা কম কথা নয়!

নির্দিষ্ট দিনে যুবকটি সেমিনারে গেল, এবং খুব মন দিয়ে শুনলো স্যার হামফ্রে ডেভির বক্তৃতা।

আর সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, ফিরে এসে স্যার ডেভির লেকচারের একটা সিনপসিস লিখে ফেললো পুরোপুরি স্মৃতি থেকে। কিন্তু দেখলো, কয়েকটা পয়েন্ট সে বুঝতে পারছে না। সারা রাত ধরে ভেবেও সমস্যার সমাধান হলো না।

পরদিন যুবকটি ঐ পয়েন্টগুলোর ব্যাখ্যা চেয়ে স্যার ডেভির কাছে চিঠি লিখলো।

ডেভি তো চিঠি পেয়ে অবাক! এইরকম একজন অচেনা যুবকের কাছ থেকে তাঁকে চিঠি পেতে হবে, এ তিনি ভাবতেই পারেন নি। তাছাড়া যে পয়েন্টগুলোর ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে, সেগুলো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

সাত-পাঁচ ভেবে, স্যার ডেভি যুবকটিকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠালেন।

একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে যুবকের অনেকক্ষণ ধরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। কথায় কথায় স্যার ডেভি যুবকটির ব্যক্তিগত জীবনেরও অনেক কিছু জেনে নিলেন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মুখোমুখি বসে শিক্ষালাভ করার আনন্দে যুবকটি আত্মহারা। শুধু কি তাই? সেমিনারে লেকচার দেওয়ার সময় যে ব্যক্তিত্ব দেখা গেছে মানুষটার মধ্যে, এখন তার লেশমাত্র নেই। একেবারে দিলখোলা মানুষ।

এর কিছুদিন পর যুবকটি স্যার হামফ্রে ডেভিকে আবার একটা চিঠি লিখলো। সেই সঙ্গে রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিলো নিজের ডায়েরিটা।

চিঠিটার মূল বক্তব্য, যুবক স্যার ডেভির ল্যাবরেটরিতে যে কোনো রকমের একটা চাকরি চায়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডেভি একদিন তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সমস্ত ঘটনাটা শুনিয়ে পরামর্শ চাইলেন। চিন্তা-টিন্তা করার পর বন্ধুটি বললেন,—তুমি যুবকটিকে ডেকে ওর চাকরি চাওয়ার আসল উদ্দেশ্যটা জেনে নাও। যদি তেমন বোঝ, তাহলে এমন কম মাইনে অফার কর, যাতে ও চাকরি না নিতে পারে।

সেই মতই ডেভি যুবকটিকে একটা ছুটির দিনে আসতে বললেন। বেশ হার্দ্য পরিবেশে কফি টফি খাওয়ানোর পর ডেভি যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা, তুমি তো এখন নিজেই স্বাধীনভাবে বই বাঁধানোর ব্যবসা করছো। আগের দিন যা বলেছিলে, তাতে রোজগারপাতিও নেহাত মন্দ নয়, তাহলে তুমি চাকরি চাইছো কেন?

যুবকটি গম্ভীরভাবে বললো, স্যার, প্রথমেই আপনি ভুল করছেন। পয়সা রোজগারের জন্য আমি বই বাঁধানোর ব্যবসা করি না। এই সূত্রে এমন অনেক বই আমার কাছে আসে, যেগুলো কোনো দিনই আমার পক্ষে কিনে পড়া সম্ভব নয়। বাঁধানোর অবকাশে এ সমস্ত বই থেকে অনেক দরকারি জিনিস আমি টুকে রাখি।

ফ্যারাডে

ডেভি যুবকটির কথায় মনে মনে খুশিতে উপচে পড়লেন। বললেন,—তাহলেও তুমি তোমার রোজগারটাকে তো অস্বীকার করতে না। আমি এখানে তোমাকে আর কত মাইনে দেবো? শেষ অবধি দেখবে ব্যবসাও গেল, এদিকে পেটও ভরছে না।

—না ভরুক, কষ্ট সহ্য করা আমার কাছে নতুন নয়।

যুবকটির উৎসাহে ডেভি মুগ্ধ। কিন্তু একেবারে ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে দিতে, মন সায় দিচ্ছে না। যতই বলুক, কত দিনেরই বা পরিচয়! তার ওপর অসাবধানে যদি কোনো যন্ত্রপাতি ভেঙে যায়, সর্বনাশ হয়ে যাবে। মুখে বললো,—তুমি এক কাজ করো। আমারও বিশাল

সংগ্রহ আছে বিজ্ঞানের বইয়ের। অযত্নে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নাও।

যুবকটি তাতেই রাজি হয়ে গেল। যৎসামান্য মাইনেতে সারাদিন পড়ে থাকতো ডেভির লাইব্রেরিতে। বইগুলো যেন তার বুকের পাঁজর।

কাজের আন্তরিকতায় খুশি হয়ে ডেভি একদিন যুবককে ডেকে পাঠালেন তাঁর পরীক্ষাগারে।

—তোমাকে একটা নতুন কাজ দিলুম। এবার থেকে তুমি এই যন্ত্রপাতিগুলোর দায়িত্ব নাও। রোজ আমার সময় হয় না, এগুলোকে পরিষ্কার-টরিষ্কার রাখার।

যুবকটি যেন হাতে স্বর্গ পেল। এর জন্যই তো চাকরি নেওয়া। সে তো মনেপ্রাণে চায় হামফ্রে ডেভির গবেষণাগারের ঐ যন্ত্রগুলোর সঙ্গী হতে।

স্যার ডেভিও এতদিনে চিনতে পেরেছেন যুবকটিকে। জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা তার প্রতিটি রক্তকোষে। স্যারের অনুমতি পেয়ে যুবকটি আস্তে আস্তে নিজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিলো।

বিজ্ঞানের প্রতি যুবকটির এই অনুরাগ এবং অধ্যবসায় ডেভিকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি সবরকম সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছিলেন তার দিকে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভাবছো, যুবকটির নাম কি?

যুবকটির নাম মাইকেল ফ্যারাডে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি আবিষ্কার করেন, তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ।

ফ্যারাডের এই আবিষ্কারের ফলেই জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার, ডায়নামো, এবং অন্যান্য বহু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আজ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

আচ্ছা এবার বলতো, স্যার হামফ্রে ডেভি আর মাইকেল ফ্যারাডে, এঁদের মধ্যে কার আবিষ্কার বেশি মূল্যবান?

একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বললেই উত্তর দিতে পারবে। একজন সাংবাদিক একবার স্যার হামফ্রে ডেভিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কোন্‌টি?

স্যার ডেভি একটুও চিন্তা না করে উত্তর দিয়েছিলেন,—মাইকেল ফ্যারাডে!

কথার কথা শেখার নয়

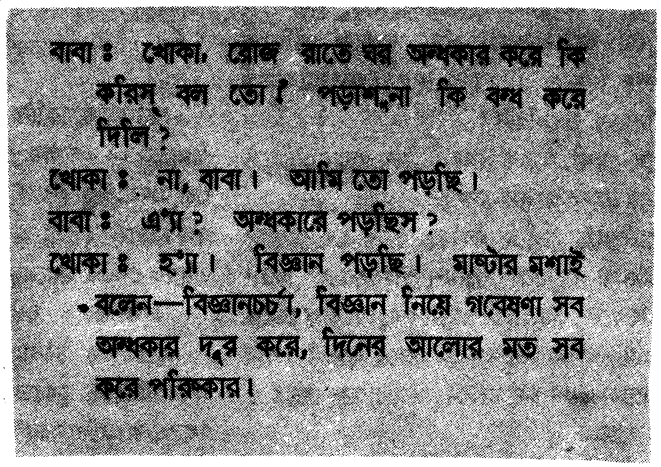

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর

ধীরেন গুহ

আমাদের একটা প্রবাদ আছে যে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। এই প্রবাদ বাক্যটি সম্ভবত এসেছে ঈশ্বর তথা ধর্মে অবিশ্বাসী নাস্তিকদের ঈশ্বর বিশ্বাসী করে তোলা এবং প্রচলিত কুসংস্কারকে জীইয়ে রাখার জন্য। বর্তমানের মতো সুদূর অতীতেও কিছু লোক নিশ্চয়ই ছিল যারা যে কোন ঘটনা বিনা তর্কে বা বিনা যাচাইয়ে, কেবল অন্ধ বিশ্বাসে মেনে নিত না। আর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রশ্ন করার, যুক্তি দিয়ে ভাববার কিছু লোক ছিল বলেই না সমাজ সভ্যতা বর্তমান স্তরে উঠে আসতে পেরেছে। অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলার অপরাধে আজ থেকে চারশত বছর আগে ইটালীর দার্শনিক জিয়ারডানো ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। পুড়িয়ে মারার আগে ধর্মযাজকরা ব্রুনোর মুখের সামনে একটা ক্রশ এনে তাতে চুম্বন করতে বলেছিলেন। ব্রুনো ঘৃণায় মুখটি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী স্থির এবং একে কেন্দ্র করে সূর্য ও তারারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, গ্রীক জ্যোতির্বিদ ক্লডিয়াস টলেমী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে এই মতবাদ প্রচার করেন। দীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে সাধারণ মানুষ এই মতবাদ বিশ্বাস করে এসেছে। প্রাচীন গ্রীসের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তত্ত্ব পড়ান হয়েছে।

সাল ১৫৩২। স্থান রোম বিশ্ববিদ্যালয়। বক্তা ২৯ বছরের তরুণ জ্যোতির্বিদ্যার ছাত্র। বক্তৃতার বিষয় গ্রহ নক্ষত্র। তরুণ অধ্যাপক বক্তৃতা শুরু করলেন—"পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। সূর্য, চন্দ্র এবং পাঁচটি গ্রহ পৃথিবীর উপগ্রহ হিসেবে বৃত্তাকারে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করছে আমাদের মহান পৃথিবীকে, এগুলি ছাড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত স্থির নক্ষত্র গোলক। এই হল মূল সত্য যা দেড় সহস্রাধিক বছর পূর্বে মহান ক্লডিয়াস টলেমী বর্ণনা করে গেছেন এবং আজও প্রাত্যহিক অনুভূতি দ্বারা সত্য বলে পরিগণিত হচ্ছে। "এমন সময় একজন তরুণ ছাত্র ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল," মাননীয় অধ্যাপক, গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস কি এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন নি? তিনি কি বলেন নি যে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র সূর্য, পৃথিবী নয়।" এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর আগেও কয়েকবার দিতে হয়েছে অধ্যাপককে। তাই উত্তর তার মুখস্থ। প্রতিবারের মতো এবারেও হয়তো বলতেন, "মহান আরিস্টটল পীথাগোরাসের যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মানুষ সুতরাং মানুষের আবাসস্থান পৃথিবী অবশ্যই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র।

কিন্তু এবার তরুণ অধ্যাপকের একি হল? তিনি হঠাৎ বক্তৃতা বন্ধ করে ক্লাশ থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

তাহলে অধ্যাপকের মনেও কি সন্দেহ রয়েছে? হ্যাঁ, অধ্যাপকও আর আস্থা রাখতে পারছেন না বই প্রচলিত ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বে। তা সত্ত্বেও মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে আরো তিন বছর শিক্ষকতা করে কাটিয়ে দিলেন। অবশেষে মনের সব টানা পোড়েন কাটিয়ে উঠে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত নিলেন—না আর নয়। তিনি নিজে যে বিষয়ে সন্দিহান সেটা আর ছাত্রদের পড়াবেন না। অতএব শিক্ষকতায় ইস্তফা। কে এই তরুণ অধ্যাপক? ইনি হলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস। বহু বছরের পর্যবেক্ষণ ও সাধনার শেষে কোপার্নিকাসই প্রথম গাণিতিক উপায়ে প্রমাণ করেন যে টলেমীর ভূকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তা ভ্রান্ত। সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ঘুরছে। তিনি এও বুঝে-ছিলেন যে পৃথিবী নিজেও ঘোরে যার ফলে দিন রাত হয়। তাঁর এই ধারণা নির্ভুল গাণিতিক নিয়মানুসারী। এই গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে যে কোন সময়ে যে কোন গ্রহের অবস্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। এই নিয়মে গ্রহণের দিনগুলি আগে থেকে বলে দেওয়া যায়। তৎ-কালীন রক্ষণশীল সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মযাজকদের ভয়ে তাঁর এই মতবাদ কিন্তু সোজাসুজি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ২২শে মে ১৫৪৩ তাঁর এই মতবাদের অনেক তথ্য কাটছাট ও বিকৃত করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায় অজ্ঞান, অনড়। তাই সারা জীবনের সাধনার সেই বিকৃত রূপ দেখা বা পড়ার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়নি। তবে তাঁর মূল পাণ্ডুলিপিটি তাঁরই এক বন্ধু শাস্তির ভয়ে লুকিয়ে ফেলে-ছিলেন। কোপার্নিকাসের মৃত্যুর দু'শ আড়াইশ বছর পর সে পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধার হয়েছিল। তারপর গ্যালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যখন এই তথ্য প্রমাণ করে দিলেন সেই ধর্মযাজকরা তাঁর কথা উড়িয়ে দিতে না পারলেও গ্যালিলিও রেহাই পেলেন না। বৃদ্ধ বয়সে নিজের মত ভ্রান্ত স্বীকার করে ধর্মান্ধদের হাতে বন্দী হয়ে রইলেন। অবশ্য তিনি পেরেছিলেন ধর্মযাজকদের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর মূল পাণ্ডুলিপিটি নিরাপদে সরিয়ে দিতে। তাই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা বন্ধ করতে পারেনি অন্ধবিশ্বাস।

আজ মানুষ যখন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি দিচ্ছে তখন ও অন্ধ বিশ্বাসের কবলে অসংখ্য মানুষ। এখনও হাঁচি, টিকটিকি, বারবেলা, তেলপড়া, ডাইনী পোড়ানো, সতীদাহের মতো ঘটনার কথা প্রায়ই শোনা যায়। অনেকে বলেন যে শিক্ষার প্রসার হলেই এই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার কেটে যাবে। এটা বোধ হয় সবটা ঠিক নয়। কারণ পাশ্চাত্য জগতে আজও অনেক অন্ধ বিশ্বাসের নজীর পাওয়া যাবে সেই দেশের মানুষের আচার আচরণে। আমাদের দেশেও নিরক্ষর সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম। অগণিত উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যেও বহু অন্ধ বিশ্বাস বাসা বেঁধে আছে। রাস্তায় চলতে চলতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা বিজ্ঞানী যখন কোন মন্দির মসজিদ এর সামনে এসে হঠাৎই দেখ্-না-দেখ করে কপালে হাত ঠেকান তখন তাকে কি বলব? বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের পাঁচ আঙ্গুল যখন পাঁচটি বিভিন্ন ধাতুর আংটিতে শোভাবর্ধন করতে দেখি তখন তাকে কি বলব? রোগী পরীক্ষারত কোন ডাক্তারবাবুর জামার আস্তিনের নীচে যখন মাদুলী বেরিয়ে পড়ে সেটাকেই বা কি বলা যাবে? এর থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যাক, যে কথা দিয়ে সুরু করেছিলাম সেখানে ফিরে আসি। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু এটা কি সত্যি? সত্যিই কি কেবল বিশ্বাসের বলেই কেউ কোন দিন কোন বস্তু পেয়েছে? যাকেই প্রশ্ন করা যাবে সেই কিন্তু প্রমাণ দিয়ে বলতে পারবে না যে সে স্বচক্ষে এরকম কোন ঘটনা দেখেছে। পক্ষান্তরে বহুদিন বহুভাবে এই ধরণের বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তত্ত্বের অসাড়তা আমরা জীবনে প্রত্যক্ষ করে থাকি। এ রকমই তিনটি ঘটনা উল্লেখ করব আজ।

গলায় পরালে মালা হাতে দিলে নীলা
জণ্ডিস তবু সারিল না, যমে গেল নিয়া।

এটি আমার এক অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ের অকাল মৃত্যুর ঘটনা। দশ বছর আগের কথা। আমার এই আত্মীয়ের কঠিন জণ্ডিস হয়। তিনি নিজে ডাক্তার, প্রগতিশীল চিন্তায় বিশ্বাসী। ব্যক্তিগত জীবনে সমস্ত রকমের কুসংস্কার ও ধর্মভীরুতার উর্ধ্বে। জণ্ডিসের প্রকৃতি ও আক্রমণ ছিল ভীষণ। সেরে উঠা নাকি সম্ভব ছিল না। সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষার পর ডাক্তারবাবুরা সেইরকম আশঙ্কাই প্রকাশ করেছিলেন। রোগীও হয়তো সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। বাড়ীর লোকজন স্বাভাবিক ভাবে এ অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতিবেশী হিতাকাঙ্খীদের পরামর্শে আজীবন সংস্কার মুক্ত মানুষটির মাথায় পরিয়ে দেওয়া হল ন্যাবার মালা। এই মালা মাথা গলে ধড় দিয়ে নেমে গেলে নাকি জণ্ডিসের বিষ নেমে যাবে। একই সঙ্গে অন্য কিছু হিতাকাঙ্খীর পরামর্শে

ডেকে আনা হল জনৈক খ্যাতমান রত্নবিশারদ জ্যোতিষীকে। তিনি নাকি রত্ন ধারন করিয়ে গ্রহের কুপ্রভাব থেকে বিপদ মুক্ত করেছেন বহু মানুষকে। দশ অবতারে ভগবান ভূত। এখানেও তাই। যাইহোক মালা মাথা গলে নেমে এলো কিন্তু জন্ডিসের বিষ নামলো না। জ্যোতিষ মশায় রোগীর রাশিফল বিচার করে বিধান দিলেন নীলা ধারন করতে হবে। বেশ মোটা অর্থ মূল্যে তিনি নিজে দেখে শুনে সোনার আংটিতে খাঁটি নীলা বসিয়ে শান্তি স্বস্তয়ন করে পরিয়ে দিলেন রোগীর আঙ্গুলে। নীলা ধারনের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোন অঘটন না ঘটে তবে নাকি বুঝতে হবে যে নীলা রোগীর সহ্য হয়েছে এবং রোগীর বিপদ মুক্তি হবে। ৪৮ ঘণ্টার জায়গায় আরো কয়েকটি ৪৮ ঘণ্টা কেটেছিল বটে তবে শেষ রক্ষা হয়নি। মালা বা নীলা কোনটাই রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

চণ্ডীর চান-জলে আশ্চিক সারে না গতবছরের ঘটনা। বর্ধমান জেলার খণ্ডকোষ অঞ্চলে একটি গ্রামে আশ্চিক দেখা দিয়েছে। বর্ধমান থেকে শহীদ শিবশংকর সেবা সমিতির পক্ষে কয়েকজন ডাক্তার গেছেন সেই গ্রামে। রাত দশটা নাগাদ হঠাৎ ডাক পড়ল এক বাড়ীতে! ডাক্তারবাবু যেয়ে দেখেন এক মা তার শিশুপুত্র কোলে নিয়ে অঝোরে কাঁদছেন আর মাঝে মাঝে শিশুর মুখে ঘোলাটে জল দিচ্ছেন একটু করে। ডাক্তারবাবু দেখেই বুঝলেন যে শিশুটির ডি-হাইড্রেশন হয়েছে। এই মুহূর্তে স্যালাইন দেওয়া দরকার। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কোন স্যালাইন নেই।

আর এখন রোগীকে হাসপাতালেও পাঠান যাবে না। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করে জানলেন যে মা'টি মাঝে মাঝে শিশুর মুখে যে জল দিচ্ছেন সেটা স্থানীয় এক জাগ্রত চণ্ডীর চান জল চিকিৎসা। কিন্তু মায়ের মন শেষ পর্যন্ত চান-জলে আর আস্থা রাখতে পারেনি। তাই তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন ডাক্তারবাবুদের। ডাক্তারবাবুর মনস্থির করতে সময় লাগে নি। তিনি চটজলদি একটু নুন এবং চিনি চেয়ে নিয়ে তৈরী করে ফেলেন ORS বা ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউসন। তারপর একটু একটু করে শিশুর মুখে ঢেলে দেন সেই ORS. সারারাত ধরে চলে এই চিকিৎসা। সকালে শিশুটি আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায়। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঐ মা এখন আর চান জলে বিশ্বাসী নন। তিনি ঐ গ্রামে এখন একজন বিজ্ঞান কর্মী।

দাঁতের ব্যথায় কানে ঝোলালে মাদুলী
গেল না ব্যথা কেবল মানুষ হাসালি।

নিঃসন্দেহে এটি একটি চমৎকার হাসির খোরাক। আমার পরিচিত একজন প্রেস শ্রমিক গতবছর বেশ কিছুদিন ধরে দু'টি দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। দাঁত দু'টি ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে গেছে। বললাম দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেয়ে দাঁত দু'টো তুলে ফেলা ছাড়া কোন পথ নেই। মুখের হাবভাব দেখে বুঝলাম পরামর্শটা মন মতো হয়নি। পরদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা। বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে শহরের বুকে এ এক অভিনব দৃশ্য। দেখি ঐ শ্রমিকটির কানে ঝুলছে একটা মাদুলী। জিজ্ঞাসা করি, "কি পাঁচুদা, কানে ওটা কি ঝুলিয়েছেন?" উত্তরে পাঁচুদা জানান যে তাঁদের পাড়ায় একজন ব্যক্তি গাছ গাছড়ার শিকড় দিয়ে অনেক কঠিন অসুখ সারিয়ে দিতে পারেন। তিনিই কি একটা গাছের শিকড় মাদুলী করে বেঁধে দিয়েছেন। তিন দিন তিন রাত যে দিকে দাঁতের ব্যথা সেই দিকের কানে ঐ মাদুলীটি ঝুলিয়ে রাখতে হবে। তাহলেই দাঁতের ব্যথা কমে যাবে আমি আর কথা বাড়াইনি। চতুর্থ দিনে বেলা দেড়টা নাগাদ প্রেসে বসে আছি হঠাৎ দেখি পাঁচুদা মুখে তুলোর পুলটিশ গুঁজে প্রেসে ঢুকলেন। কি হলো জিজ্ঞাসা করি। কথা বলতে পারছেন না। দুটো আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে যা দেখালেন তাতে বুঝলাম যে পাঁচুদা দাঁতের ব্যথায় থাকতে না পেরে শেষে ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তার-বাবু দু'টি দাঁতই তুলে দিয়েছেন। ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাওয়ায় তুলতে বেশ কষ্ট হয়েছে। পাঁচুদা ডাক্তারখানা থেকেই এখন আসছেন। আজ আর কাজ করবেন না। ব্যথামুক্ত পাঁচুদার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করি, কি দাদা, শিকড় ঝুলিয়ে দাঁতের পোকা গেল না?" পাঁচুদা সলজ্জ হাসতে হাসতে উত্তর দেন, "আর বলবেন না, যত্তো সব…"

আলো আমার আলো

প্রদীপ চক্রবর্তী

দিনে এবং রাতে কত রকমের আলোর রোশনাই না দেখি ; সকালে পূব দিগন্তে সূর্যের রক্তিম আলো, দিন শেষে সূর্য ডোবার মুহূর্তে পশ্চিম দিগন্তে লাল রঙের শেষ ছটা ; সাঁঝের আধারে পৃথিবীর বুকে জ্বলে ওঠা বিভিন্ন আলোক উৎস—সবই খুবই মনোরম এবং নয়ন মুগ্ধকর। আলোর ফলেই কোন বস্তু আমাদের চোখে দৃশ্যমান হয়, ফোটা ফুলের শোভা, আকাশে ফুটে ওঠা রামধনুর বাহারী বনচ্ছটা—সবই আলো থেকে সৃষ্টি। তাই আমাদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—আলো কি ? এর প্রকৃতি কি ? বৈশিষ্ট্যই বা কি ? এখানে আমরা এই বিষয়ের কিছু উত্তর খুঁজে বার করার চেষ্টা করবো।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি নিয়ে আমরা আলোকে দেখতে চেষ্টা করেছি সপ্তদশ শতকে। কিছুটা বাস্তব কিছুটা অবাস্তব চিন্তাধারা নিয়ে। জন্ম হল নিউটনের কণাবাদ (Newton's Corpuscular Theory)। একটা মোমবাতি জ্বালালে আমরা তা দেখতে পাই কেন ? এর উত্তরে নিউটন তার কণাবাদ তত্ত্বে বলেছেন, কোন আলোক উৎস থেকে ছোট ছোট অদৃশ্য কণা প্রচণ্ড বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কণাগুলোকে নাম দেয়া হয়েছিল, আলো-কণা (Corpuscle), উৎস থেকে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে গিয়ে আমাদের আঘাত হেনে অক্ষিপটে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় সজাগ করে তোলে যার ফলে আমাদের দর্শন-অনুভূতি জন্মায়।

সে সময় আলোর কতগুলো ঘটনা জানা ছিল যেমন আলোর সরল পথে চলা, কিংবা কোন একটা মাধ্যমে চলতে চলতে কোন চকচকে তল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসা ইত্যাদি। নিউটনের কণাবাদ থেকে এই দুটো ঘটনা বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হয়ত হয় না। কেননা কণাগুলো প্রচণ্ড বেগে ছড়িয়ে পড়লে সরলরেখায় যেতেই পারে আর চকচকে তলের পরমাণুর সংগে কণাগুলোর সংঘর্ষের ফলে প্রতিফলন ঘটনাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাদ সাধলো প্রতিসরণ ঘটনা। যখন কণাগুলো বায়ু মাধ্যম থেকে অন্য কোন ঘন মাধ্যমে যায়, তখন কণাগুলোর বেগ, ভারী মাধ্যমের পরমাণুর অপেক্ষাকৃত বেশী আকর্ষনের ফলে বাড়া উচিত। কিন্তু পরীক্ষিত সত্য এর ঠিক উল্টো। কাজেই আলো সম্পর্কে নিউটনের ধারণা অভ্রান্ত নয়।

এমতাবস্থায় একদল নূতন বিজ্ঞানী নিয়ে এলেন নূতন ধরনের ভাবনা এবং ধারণা। এরা হলেন ইয়ং, ফ্রেনেল এবং হাইগেনস্। তারা বললেন, আলো কণার সমষ্টি নয়, আলো হল শক্তি, একপ্রকার শক্তি যা মাধ্যমের কণাগুলোর আন্দোলনের ফলে একস্থান থেকে অন্য স্থানে তরংগাকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই মতবাদকে বলা হয় তরংগবাদ (Wave Theory)। কাজেই এবার আমরা ধরে নেব আলো একপ্রকার তরংগ। হাইগেনস্ বলেছেন, কোন তরংগমুখে অবস্থিত মাধ্যমের কণাগুলো আন্দোলিত হয়ে গৌণ তরংগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কোন তরংগ এগিয়ে চলে। এই ধারণার সাহায্য নিয়ে আলোর সরল পথে গমন প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ঘটনা বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। কিন্তু আলোর একটা ঘটনা যে একটু অসুবিধে ঘটায় নি তা নয়। ঘটনাটা হল আলোর অপবর্তন (Diffraction)। দেখা গেল, ধারালো প্রতিবন্ধকের, যেমন দাড়ি কামানোর ব্লেডের ধার ঘেষে যাবার সময় আলো কিছুটা বেঁকে যায়। এই বেঁকে যাবার ঘটনাকে বোঝাতে গিয়ে ফ্রেনেল তরংগ মুখকে অসংখ্য ফ্রেনেল Zone এ ভেঙ্গে দেখালেন—প্রতিবন্ধকের ধার ঘেষে গেলে কিভাবে আলো তার চলার পথ থেকে বেঁকে যায়। এইবেঁকে যাবার ফলে কোন প্রতিবন্ধকের ছায়ার সামান্য অংশে আলো-আধারী দেখা যায়। তবে এই বেঁকে যাওরা খুবই সামান্য। তাই সাধারণভাবে বলা হয় আলো সরল রেখায় গমন করে।

অপবর্তন ঘটনা ছাড়াও আরো একটি ঘটনা ঘটলো। কোন কেলাসের মধ্য দিয়ে আলো পাঠিয়ে দেখা গেল কেলাস থেকে নির্গত আলোর কোন একটি নির্দিষ্ট কম্পনতল আছে। এ ধরনের আলোকে বলা হয় সমবর্তিত আলো। আলোকে তির্যক তরংগ ধরে সমবর্তন ঘটনারও ব্যাখ্যা দেয়া গিয়েছিল তরংগবাদ থেকে।

সবই তো হল, কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেল। তরংগ বয়ে যাবার জন্যে তো মাধ্যম দরকার। কিন্তু আমরা জানি রাতের শেষে ভোর হওয়া মাত্র ঐ সুদূর সূর্য থেকে বহু দূরত্ব পেরিয়ে আলোর ঢেউ এসে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে। এই পথের অনেকটা জুড়েই আছে অসীম শূন্যতা। তা হলে ? একটা বিরাট প্রশ্ন এসে দাঁড়ালো। তরংগবাদের সমর্থকরা যেন একটু হোচট খেলেন। নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তারা নিয়ে এলেন "ঈথার" মাধ্যমের ধারনা। তারা বললেন অসীম শূণ্যতা বলে কোথাও কিছু নেই, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই 'ঈথার'। ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে, আছে অন্তঃরীক্ষে, ছড়িয়ে আছে অণু-পরমাণুর মধ্যে। এই রকমের একটা সর্বত্র বিদ্যমান মাধ্যমের ধারনা প্রচার করেও কিন্তু বিজ্ঞানীরা পারলেন না বাঁচাতে তাদের তরংগবাদকে।

যদি ধরা যায় এই রকম কোন মাধ্যমের অস্তিত্ব তা হলে আলোর বেগ হবে $c = \sqrt{n/d}$, এখানে n হলো মাধ্যমের দৃঢ়তা গুনাংক, c হলো আলোর বেগ, d ঘনত্ব। কাজেই c বেশী বলে d কম অথচ n বেশী হতে হবে। কি আশ্চর্য্যের তা হলে এই ধরনের মাধ্যম, যার দৃঢ়তা হবে বেশী অথচ ঘনত্ব হবে কম। সত্যি অবিশ্বাস্য ধরনের ধারনা। পরীক্ষা করেও কিন্তু এ ধরনের কোন মাধ্যমের অস্তিত্বের হদিস বিজ্ঞানীরা পাননি। কাজেই আলোর তরংগবাদের ত্রুটি এখানেই রয়ে গেল।

এরই কাছাকাছি সময়ে Oersted, Faraday প্রভৃতি বিজ্ঞানী প্রমান করেন যে তড়িত এবং চুম্বক পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তাদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। তড়িত প্রবাহের সংগে চৌম্বক ক্ষেত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তড়িত-প্রবাহ পরিবর্তিত হলে চৌম্বক ক্ষেত্রও পরিবর্তিত হয়। এই ঘটনার ফলশ্রুতি হিসাবে ঘোষিত হল আলোর তড়িৎ চুম্বকীয় মতবাদ। ম্যাক্সওয়েলের মতবাদ। তিনি বলেন, আলোক উৎসের পরমাণুর কম্পনের ফলে একটা যুগ্ম তরংগ প্রবাহের সৃষ্টি হয়, একটি তরংগ হল তড়িত তরংগ অপরটি হল চুম্বক তরংগ। এই তড়িত চুম্বকীয় তরংগ যে বেগ নিয়ে এগিয়ে চলে তা ম্যাক্সওয়েলের গননায় বলা যায়

$$v = \frac{c}{\sqrt{\mu k}} \quad \left(\begin{array}{l} k = \text{মাধ্যমের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক} \\ \mu \quad \text{মাধ্যমের প্রবেশ্যতা।} \end{array} \right)$$

ম্যাক্সওয়েলের এই ধারণাকে প্রথম বাস্তবায়িত করেন বিজ্ঞানী হার্টজ্ (Hertz), ম্যাক্সওয়েলের এই তড়িতচুম্বকীয় তরংগবাদ প্রয়োগ করে আলোর সব রহস্যের মোটামুটি উত্তর পাওয়া গেল। মাধ্যমহীন স্থানেও তড়িতক্ষেত্রের এবং চুম্বকক্ষেত্রের অস্তিত্ব আছে বলে শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে তড়িতচুম্বকীয় তরংগ বয়ে যাবার ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। ঘটনা কিন্তু এখানেই থেমে রইল না। উনিশ শতকের শেষের দিকে ঘটলো বেশ কয়েকটা নূতন ঘটনা যেমন আলোকতড়িতক্রিয়া, রমনক্রিয়া – এদের ব্যাখ্যা কিন্তু তড়িতচুম্বকীয় মতবাদ থেকে দেয়া সম্ভব নয়। আলোর অন্তরে নিহিত রহস্য আমাদের এবার নিয়ে এসে দাঁড় করালো একটা গোলমেলে জায়গায়। উপরে বর্ণিত ঐ দুটো ঘটনা আবিষ্কৃত হবার পর আমাদের ফিরে তাকাতে হল পেছনের দিকে। না, অনেকগুলো বাঁক পেরিয়ে এসেছি। তবু ফিরে যেতে হবে। আইনস্টাইন আলোক-তড়িতক্রিয়া ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটনের কণাবাদই আবার প্রচার করলেন, যদিও নূতন আঙ্গিকে এবং নূতন ভঙ্গিমায়।

তিনি বললেন, আলোর মধ্যে রয়েছে বিকিরণ-কণা (Radiation quanta) যার শক্তি হল কম পক্ষে $h\nu$ h হলো প্ল্যাঙ্ক (Planck) ধ্রুবক এবং ν হলো কম্পাংক। তাঁর বক্তব্য হল, উৎস থেকে যখন আলোক শক্তি বিকীর্ণ হয় তখন বৃত্তাকার তরংগমুখে শক্তি সমভাবে ছড়ায় না, বরং শক্তি সঞ্চিত থাকে কতগুলো কণার মধ্যে। এই কণাগুলোকে ফোটন বলে। তবে এই ফোটন বা কোয়াণ্টাম তত্ত্ব থেকে ব্যতিচার, অপবর্তন বা সমবর্তন ইত্যাদি কোন ঘটনাই ব্যাখ্যা করা যায় না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোন কোন ঘটনা ব্যাখ্যা করতে হলে তরংগবাদ (যান্ত্রিক বা তড়িতচুম্বকীয়) উপযোগী আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কোয়াণ্টাম মতবাদ উপযোগী। দেখা গেছে পদার্থের সংগে বিকিরণের পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্যে কোয়াণ্টাম মতবাদ (কণাবৈশিষ্ট্য) ধরা সুবিধেজনক, অন্যান্য ক্ষেত্রে তরংগবাদ (তরংগবৈশিষ্ট্য) ধরা সুবিধেজনক।

কাজেই আলো কখনও তরংগের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে কখনও কণার। মোটামুটি ভাবে ধরা যায়, তীব্র রশ্মির ক্ষেত্রে কণা বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী রশ্মির ক্ষেত্রে কণা বৈশিষ্ট্য। কাজেই আলোর যেন দ্বৈত সত্ত্বা বিদ্যমান, অনেকটা Mr. Jekyl এবং Mr. Hyde এর ঘটনার মত।

আন্ত্রিক আতঙ্ক ও প্রতিকার

কুণাল দত্ত

আবার গরম এসে গেল, এরপরই বানভাসির দৌলতে পশ্চিমবাঙলার গ্রামাঞ্চলে ভেসে যাবে পানীয় জলের সূত্র। আর ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে "আন্ত্রিক।" গত বেশ কিছু বছর থেকে গণমাধ্যমে প্রচারের সূত্রে নানান জাতের পেটের অসুখেরই সাধারণ নাম দাঁড়িয়ে গেছে "আন্ত্রিক।" এককথায় বলতে গেলে অন্ত্রের জীবাণু ঘটিত প্রদাহ হল "আন্ত্রিক"! এই জীবাণু হয় নানান জাতের—কখনও অতি ছোট ভাইরাস গোষ্ঠীর, কখনও ব্যাসিলাস জাতীয় ইত্যাদি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে জীবাণুর রকম ফেরে আন্ত্রিকের প্রকোপ ও শারীরিক ক্ষতি ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়, কিন্তু গণমাধ্যমে ছড়ান আতঙ্কের প্রভাবে এখন আন্ত্রিক শব্দটাই ভীতির অনুভূতি জাগায়। মৃত্যুর ছোঁয়া দেয়।

আন্ত্রিক ব্যাপকহারে হওয়ার সময়কাল হল গ্রীষ্ম আর বর্ষাকাল। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, উত্তরবঙ্গের নানান অঞ্চলে। আন্ত্রিকের প্রকোপ শুধু এই দু ঋতুতেই বাড়ছে কেন? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে। এই সময় পরিষ্কার (জীবাণুমুক্ত) পানীয় জল পাওয়া বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। গ্রামের পুকুর, কুয়ো যায় শুকিয়ে - খরাপ্রবন এলাকায় নলকূপের জলতলও নেবে যায়, ফলে মানুষ বাধ্য হয় অপরিস্রুত জল খেতে। বর্ষায় আবার বন্যাপ্রবন এলাকায় পানীয় জলের সূত্রগুলি যায় ডুবে। আর দূষিত জলের মাধ্যমে পানীয় জলের কুয়ো, নলকূপ ইত্যাদিও দূষিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পানীয় জলের দূষণই হল নানান জাতের "আন্ত্রিক"-এর মূল কারণ। অবশ্যই একমাত্র কারণ নয়। যেমন খুব পরিস্রুত জল যদি কেউ অপরিষ্কার পাত্রে নিয়ে পান করেন, তবে ঐ পাত্র থেকেই জীবাণু দূষণ ঘটতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ই আমরা খাবার জল খুব যত্ন করে ভরি, ঢাকা দিয়ে রাখি, কিন্তু জলখাবার ঘটি বা গ্লাসটা পুকুর ঘাটে কি খালের জলে ধুয়েই চালিয়ে দিই। "আন্ত্রিক" প্রবণ এলাকায় এই বিষয়ে খেয়াল রাখলে আরও কিছু আন্ত্রিক রোগী রোগের কবলে পড়ার থেকে বেঁচে যাবেন। অবশ্য শহরাঞ্চলে খাবার জল কতটা পরিস্রুত সে ব্যাপারে যাঁরা চিন্তিত থাকেন, তাঁরা সরবরাহ করা জলের পরিমাণের ব্যাপারেও একটু চিন্তা করলে ভাল হয়, কেননা জলের সরবরাহ কম হলে অপরিস্রুত জলে খাবারের থালা বাসন ধোওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং আন্ত্রিক জাতীয় রোগের সম্ভাবনা বাড়ে।

আন্ত্রিক রোগ সবচেয়ে ভয়াবহ হল শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে। কেননা এই দুই দলেরই শারীরিক সহনক্ষমতা প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় অনেক কম। শিশুদের মধ্যে আন্ত্রিকের আরও নানা কারণের সঙ্গে বোতল ও নিপলে খাবার খাওয়ানও একটা বড় কারণ। কেননা ফুটিয়ে পরিষ্কার না করলে বোতল নিপলের গায়ে জমা খাবারের অণু-কণায় জীবাণুরা বংশবৃদ্ধি করে। তাই শিশুদের খাওয়াতে ফোটান জলে পরিষ্কার করা বাটি চামচ আন্ত্রিক রুখতে সাহায্য করে। শিশুদের ক্ষেত্রে আরও একটা দরকারী জিনিষ হল আন্ত্রিক হলে নিয়মিত পুষ্টির যোগান বন্ধ না করা। অর্থাৎ দুধ ও অন্যান্য খাবার খাওয়ান। সে কথায় পরে আসা যাবে।

এবার আসা যাক "আন্ত্রিক" জাতীয় রোগের লক্ষণ ও উপসর্গর কথায়। আন্ত্রিক যেহেতু নানান জীবাণু ঘটিত হতে পারে—তাই তার লক্ষণও হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন। তবে সেই সব ভিন্নতার মধ্যে সাধারণ উপসর্গ হল—(১) ঘন ঘন অর্থাৎ সাধারণ এর থেকে বেশী বার তরল বা তরলাকৃতির পায়খানা। (২) পেট মোচড়ান ব্যাথা। (৩) কখনও কখনও শুরু থেকে, কখনও বা রোগের বৃদ্ধিতে - বমি এবং (৪) জ্বর। এছাড়া পায়খানার সাথে মিশ্রিত রক্ত (রক্ত আমাশা) ইত্যাদিও থাকতেই পারে। আর প্রথমটি ছাড়া এক বা একাধিক উপসর্গ নাও থাকতে পারে।

মোদ্দা কথা হল—আন্ত্রিকে, অন্ত্রের ও কখনও পাকস্থলীর প্রদাহের ফলে শরীরের কোষকলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে

শরীর থেকে রক্তরস তথা জলীয় উপাদান ও লবন পায়খানা, বমি, রক্তর আকারে বেরিয়ে যায়। আর আন্ত্রিকের ভয় এই কারণেই। কেননা জলই জীবন। শরীরে জলীয় উপাদানের ঘাটতি দেখা দিলে দেহের তাপ বাড়ে। কখনও তাপ উৎপাদন বন্ধ হয়ে দেহ শীতল হয়ে যায়। দেহযন্ত্রের কাজকর্ম বাধা পায়, পেশী দুর্বল হয়, শ্বাস কষ্টকর হয়ে পড়ে এমনকি মানুষ মারাও যায়। এত গেল ভয়ের কারণ—কিন্তু রোগ হলে কতদূর এগিয়েছে তা বোঝার কায়দা কি ?

শরীরে জল ও লবণের ঘাটতি অর্থাৎ Dehydration এর মাত্রা মাপার কিছু সরলীকৃত মাপকাঠি হল এরকম

১। প্রথম স্তর—ঘন ঘন পিপাসা, ছটফটানিভাব আর জিভ শুকান। প্রস্রাব গাঢ় হয়।

২। দ্বিতীয় স্তর—জিভ শুকানো, চোখ বসে যাওয়া, আর চামড়ার জলীয়ভাব কমে তা খসখসে হওয়া। যাতে চামড়াকে চিমটি দিয়ে টেনে তুললে তা ঐ রকম কুঁচকেই থেকে যায়, পুরান টানটান অবস্থায় ফিরতে সময় নেয়। প্রস্রাব এর পরিমাণ কমে যায়, রঙ হয় তেলের মত।

৩। তৃতীয়-স্তর—এতে আগের সব উপসর্গের সঙ্গে রোগী ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করে। শিশুদের খিঁচুনী হতে পারে। পেট ফেঁপে বা ফুলে উঠতে শুরু করে। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়।

৪। চতুর্থ স্তর—এতে দেহ চামড়া কুঁচকে যায়, রোগী ক্রমশঃ ঝিমিয়ে শেষে বেহুঁশ হয়ে পড়ে।

বলে রাখা ভাল প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে কিছু চিকিৎসা বাড়ীতেই করা সম্ভব, কিন্তু রোগ আরও বাড়লে হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্র ছাড়া এবং শিরায় স্যালাইন ইঞ্জেকসান ছাড়া রোগীকে বাঁচানই মুস্কিল। এবং সে চেষ্টা না করাই বাঞ্ছনীয়।

এবার বলা দরকার আন্ত্রিক রোগে আমরা যারা চিকিৎসক নই তারা কি করতে পারি ?—প্রথমতঃ আন্ত্রিকের কারণ যেহেতু জল দূষণ আর দূষিত পানীয় বা জল ও খাবারের মাধ্যমেই এ রোগ ছড়ায়, তাই অঞ্চলে আন্ত্রিকের শুরুতেই জল ফুটিয়ে পরিষ্কার পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখা আর ভাল জলে ধোয়া পাত্রে জল খাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। বাড়ীতে কারও আন্ত্রিক হলে তাকে একটু আলাদা রাখতে, তার পায়খানা বমি ও কাপড় চোপড় পুকুরে বা নদীতে না কেচে জলের সূত্র থেকে দূরে কোথায় পরিষ্কার করতে বা ফেলতে পারি। সেখানে একটু ব্লিচিং দিলে বা চুন দিলে আরও ভাল হয়। এছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্য বিধি হিসাবে খাবার ঢেকে রাখা, মাছি তাড়ানর জন্যে বাড়ীঘরের আশেপাশে নোংরা না জমতে দেওয়ার চেষ্টা ত আছেই। আর বানভাসির সময় অবশ্যই খাবার জলে ক্লোরিন ট্যাবলেট অন্ততঃ দিয়ে খাওয়া এবং জলে ডোবা নলকুপ বা কুয়োর জল ব্যবহার না করাটা খুবই দরকারী। এই সবই হল প্রতিরোধী ব্যবস্থা।

এবার বলি আন্ত্রিক হয়ে গেলে কি করা যায় ?—প্রথমেই বলা ভাল ডাক্তারী মতে আন্ত্রিকের শতকরা ৬০-৬৫ ভাগ ক্ষেত্রেই জীবাণু ধ্বংসী কোন ওষুধের কোনও ভূমিকা নেই। শুধুমাত্র জল ও লবণের যোগান ঠিক রাখতে পারলেই শরীর আন্ত্রিকের ধাক্কা সামলে নেবে। তাই অযথা শুরুতেই মুড়ি মিছরির মত নানান পাঁচমেশালী "পায়খানা বন্ধের" ওষুধ না খেলেই ভাল। কেননা এরা সবাই শরীরে নানান পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও ঘটায়।

ORS বা লবণ জলের সরবৎ—বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে "আন্ত্রিক" জাতীয় রোগের শুরু থেকেই যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ, চিনি গুড় ও জলের মিশ্রণ রোগীকে দেওয়া হতে থাকে তবে তা প্রাণদায়ী ওষুধের কাজ করে। কেননা শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জল ও লবণ ফেরৎ দেওয়ার ফলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। এবং পুষ্টিরও ঘাটতি মেটে এই সরবতে। এই ORS বাজারে পাওয়া যায় প্যাকেটে এবং ওষুধ কোম্পানীরা বেশ চড়া দামেই তা বিক্রি করে থাকে নানান নামে। তবে কাজ চলা সরবৎ বাড়ীতে বানিয়ে নেওয়াই সেরা উপায়—যে জন্য লাগবে ছোট কাচের গ্লাসের ৪ গ্লাস ফোটান জলে (মোটামুটি ১ লিটার) হাতের মুঠোর মাপে দু মুঠো গুড় বা চিনি, তর্জনী মধ্যমা আর বুড়ো আঙুলে চিমটি দিয়ে তুলে দু চিমটি খাবার নুন আর সম্ভব হলে এক চিমটি খাবার সোডা। এই মিশ্রণটা বানিয়ে পরিষ্কার পাত্রে ঢাকা দিয়ে রেখে রোগীকে রোগের প্রথম স্তর থেকেই চামচে করে বা গ্লাসে করে অল্প অল্প দিয়ে যেতে হবে। উদ্দেশ্য হল—যতটা জল পায়খানা ও বমিতে বের হচ্ছে তা আবার শরীরে ফেরৎ দেওয়া। অর্থাৎ বমি হলেও সরবৎ বন্ধ হবে না। তবে হ্যাঁ—সরবৎ দিয়েও যদি রোগীর রোগ লক্ষণ ক্রমশঃ খারাপ হয় তবে অবশ্যই ডাক্তার বা চিকিৎসাকর্মীর সাহায্যের দরকার হবে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই লবণ জলের সরবৎ প্রাণদায়ী ভূমিকা পালন করবে—নিশ্চিত ভাবেই।

আন্ত্রিক ভীতির বদলে বিজ্ঞানভিত্তিক এই প্রচেষ্টায় এবছর আন্ত্রিকের মোকাবেলার চেষ্টা হোকনা বাঙলার সব প্রান্তে। ওপার বাঙলায় ইতিমধ্যেই এই চেষ্টা প্রায় একটা আন্দোলনের রূপ নিয়েছে—আর আন্ত্রিক পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে অনেকটাই। আসুন না আমরা ওদের দেখে শিখি।

'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে,' -- জীবনানন্দ দাশ

কবির ভাবনা যাই-ই হোক না কেন বাস্তবে আমাদের রক্তের মধ্যে যেসব ঘটনা প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে তার সামান্য তথ্যই যে কোনো মানুষকে বিস্মিত করে দেবে। আমাদের রক্তের মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে তিরিশ লক্ষের মতো লোহিত কণিকা সৃষ্টি হচ্ছে, আবার ঐ একই পরিমাণ লোহিত কণিকা ধ্বংস হচ্ছে। প্রায় তিনমাস সময়ে রক্তে বর্তমান সমস্ত লোহিত কোষ নবজাত লোহিত কোষ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই সমতা বিঘ্নিত হলেই শরীরে নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

ক্যান্সার কোষ ও অ্যানিমিয়া

গোপাল ভট্টাচার্য

লোহিত কণিকার মূল উপাদান হিমগ্লোবিন। স্বাভাবিক পরিণত হিমগ্লোবিনের একটি অণুতে থাকে চারটি পলিপেপটাইড চেইন এবং প্রতিটি চেইনের সঙ্গে যুক্ত থাকে এক অণু করে হিম (heme)। এই অংশের মধ্যে থাকে একটি লৌহ অণু। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, হিমগ্লোবিন হ'ল এক জাতের প্রোটিন। অন্যান্য প্রোটিনের মতই এই পলিপেপটাইড চেনগুলিও কুড়ি রকমের বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড জুড়ে জুড়ে তৈরী হয়। এই চারটি চেনের মধ্যে হিমগ্লোবিনের দুটি চেন একরকম—তার প্রত্যেকটিতে আছে ১৪১টি অ্যামিনো অ্যাসিড। এটিকে বলে আলফা চেন। অন্য দুটি চেন ভিন্নরকম—তার প্রত্যেকটিতে আছে ১৪৬টি করে অ্যামিনো অ্যাসিড, এটিকে বলে বিটা চেন।

আমাদের শরীরে যেমন স্বাভাবিক বা সুস্থ হিমগ্লোবিন রয়েছে তেমনি বেশ কয়েক রকমের অস্বাভাবিক হিমগ্লোবিনও রয়েছে। আসলে ১৪১ কিংবা ১৪৬টি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে যে চেন তৈরী হয়, তার কোথাও একটা-দুটো উলট পালট হলেই হিমগ্লোবিন অস্বাভাবিক রূপে দেখা দেয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

হিমগ্লোবিন হনলুলু→আলফা চেনের 30 নং অ্যামিনো অ্যাসিড glutamic acid এর বদলে glutamine

হিমগ্লোবিন টরিনো→আলফা চেনের 43 নং অ্যামিনো অ্যাসিড phenylalanine এর বদলে valine

হিমগ্লোবিন বোষ্টন→বিটা চেনের 6নং অ্যাসিড glutamic acid এর বদলে lysine

হিমগ্লোবিন বাল্টিমোর→বিটা চেনের 16 নং অ্যামিনো অ্যাসিড glycine এর বদলে aspartic acid.

হিমগ্লোবিন পাঞ্জাব→বিটাচেনের 121 নং অ্যামিনো অ্যাসিড glutamic acid এর বদলে glutamine

হিমগ্লোবিন বেথেস্‌ডা→বিটা চেনের 145 নং অ্যামিনো অ্যাসিড tryptophan এর বদলে histidine

এই জাতীয় অস্বাভাবিক হিমগ্লোবিনের সংখ্যা প্রায় 300 ছাড়িয়ে গেছে।

লোহিত কণিকার অস্বাভাবিক গড়ন ● ● ●

সরু, লম্বা অর্ধচন্দ্রাকার কাস্তের মতো দেখতে লোহিত কণিকার প্রথম অস্তিত্ব ধরা পড়ে ডঃ জেমস হেরিকের কাছে। তিনি ছিলেন চিকিৎসক। থাকতেন শিকাগো শহরে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কুড়ি বছর বয়সের এক কৃষ্ণাঙ্গ (আফ্রিকান) ছাত্র হাসপাতালে ভর্তি হল, উপসর্গ সর্দি, কাশি, জ্বর, দুর্বলতা, ক্লান্তি, মাথাধরা ইত্যাদি। একবছর ধরে তার বুক ধড়ফড় করে, ঘনঘন শ্বাস নিতে হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেল তার দেহের বৃদ্ধি স্বাভাবিক, চোখের সাদা অংশে সামান্য হলুদের আভাস। সবচেয়ে লক্ষণীয় হল তার হৃদ্‌পিণ্ডটি বেশ বড় মাপের। ছেলেটির রক্তাল্পতা প্রকট রকমের। সুস্থ মানুষের দেহে যে লোহিত কণিকা থাকে এই ছেলেটির ক্ষেত্রে রয়েছে তার অর্ধেক। রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল তার লোহিত কণিকার আকারও অস্বাভাবিক। বহুসংখ্যক লোহিত কণিকাই সরু, লম্বাটে, কাস্তের মত বা বলা যায় আধখানা চাঁদের মতো। এর জন্যই এদের বলা হয় কাস্তে কোষ। ছেলেটির একমাত্র চিকিৎসা হ'ল

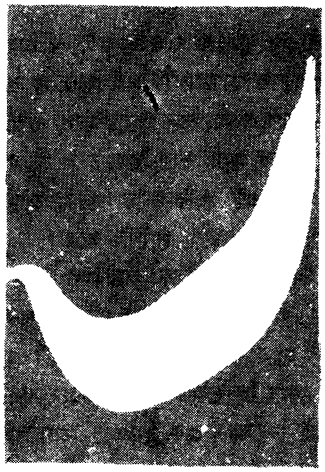

রক্তাল্পতায় আক্রান্ত কাস্তে কোষের ছবি

প্রধানত বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু এতে তার শরীরের খানিকটা উন্নতি হ'লেও রোগ সারল না—পরে আরো নানারকমের উপসর্গ দেখা দিতে থাকলো। ডঃ হেরিক বুঝলেন, রক্তকণিকার উপাদানের কোনো এক অজ্ঞাত পরিবর্তনই সম্ভবতঃ এই রোগের কারণ।

রোগটি জন্মসূত্রে আসে ● ● ●

এই রোগটি কিন্তু মোটেই বিরল নয়। আফ্রিকার কালো মানুষদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে এই রোগ দেখা যায়। তাদের প্রতি হাজারে প্রায় চারজনের মধ্যে এই রোগ রয়েছে—যার বৈজ্ঞানিক নাম হল sickle cell anemia. প্রথমদিকে এই রোগটি এতই ভয়াবহ ছিল যে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই এই রোগাক্রান্ত লোক মারা যেত। কাস্তের আকারের লোহিত কণিকা সরু সরু রক্তবহ নালীর মধ্যে আটকে গিয়ে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। তার ফলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর কাস্তের চেহারার লাল কোষ স্বাভাবিক লাল কোষের অনেক আগেই ধ্বংস হয়। তারই ফল এই রক্তাল্পতা।

লোহিত কণিকার এই অস্বাভাবিকত্বের জিন কিন্তু বংশসূত্রেই প্রাপ্ত হয়। যদি বাবা অথবা মায়ের একজনের কাছ থেকে একটি অস্বাভাবিক জিন এবং আরেকজনের কাছ থেকে একটি স্বাভাবিক জিন সন্তানের দেহে আসে, তবে তাকে বলে Heterozygote। সেক্ষেত্রে ধমনীতে প্রবাহিত কাস্তে কোষের সংখ্যা থাকে খুবই কম—এদের বলা হয় sickle cell trait. যখন বাবা এবং মা দুজনের কাছ থেকেই কাস্তে কোষের জন্য দায়ী অস্বাভাবিক জিন সন্তানের দেহে আসে—তাদের বলে Homozygote, এরাই কাস্তে কোষ রক্তাল্পতার রোগী হয়।

কাস্তে হিমগ্লোবিন ● ● ●

কাস্তে কোষ অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর হিমগ্লোবিন ত্রুটীযুক্ত। অক্সিজেনহীন হিমগ্লোবিনের দ্রাব্যতা খুবই কম। স্বাভাবিক অক্সিজেনহীন হিমগ্লোবিনের তুলনায় কাস্তে হিমগ্লোবিনের দ্রাব্যতা মাত্র শতকরা চার ভাগ। কাস্তে হিমগ্লোবিনের গাঢ় দ্রবণ অক্সিজেনহীন হলে তাতে সুতোর মতো অধঃক্ষেপ পড়ে আর তার আকার দাঁড়ায় কাস্তের মতো।

বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী লাইনাস পাউলিং কাস্তে কোষ হিমগ্লোবিন নিয়ে প্রথম গবেষণা সুরু করেন। এজন্য তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাকে বলা হয় ইলেকট্রোফোরেসিস। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার সাহায্যে জানা গেল যে হিমগ্লোবিনের একটি অণুর পরিবর্তনই এই ব্যাধির কারণ তাই এটি একটি আনবিক রোগই বলা যায়।

১৯৫৪ সালে ভার্নন ইনগ্রাম একটি অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতির নাম দিলেন তিনি Finger printing বা আঙুলের ছাপ। ইনগ্রামের পরীক্ষার শেষে জানা গেল কাস্তে হিমগ্লোবিনের বিটা চেনের ষষ্ঠস্থানে glutamic acid-এর পরিবর্তে থাকে valine. হিমগ্লোবিনে

দুটি বিটা চেনেই অর্থাৎ দুই জায়গায় এই অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবর্তনের ফলে ত্রিমাত্রিক গঠনের পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ফলে ডি অক্সি অর্থাৎ অক্সিজেন বিযুক্ত হিমগ্লোবিন পরপর জুড়ে যায় আর তার ফলে সুতোর মত অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে।

এই ভাবে খাঁজে খাঁজে জোড়া লেগে অক্সিজেনবিহীন কান্তে হিমগ্লোবিন রক্তে বিপর্যয় ঘটায়! অক্সিজেন বিযুক্ত কান্তে হিমগ্লোবিন সুতোর মতো অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করায় লোহিত কনিকার আকারের বিকৃতি ঘটে আর তাকে কান্তের মতো দেখায়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ছবি তুলে দেখা গেছে এই সুতোর ব্যাস ২১৫ অ্যাংস্ট্রম। আরো দেখা গেছে এই তন্তুর মধ্যে চৌদ্দটি অক্সিজেনবিহীন কান্তে হিমগ্লোবিন মিলে একটি সিঁড়ির মত আকার নিয়েছে। অক্সিজেনবিহীন হিমগ্লোবিনের গাঢ়ত্ব বেশ বেশী না হলে এই ধরণের অঃক্ষেপ পড়ে না।

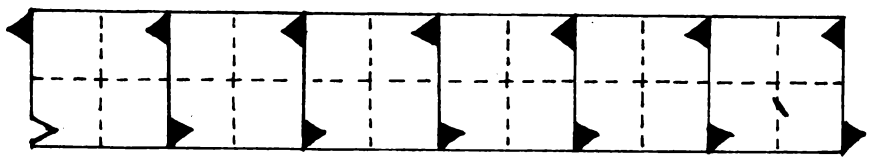

ডিঅক্সি হিমগ্লোবিন পরপর
জুড়ে গিয়ে সুতোর মতো
অধঃক্ষেপ তৈরী করে

কান্তে কোষ রক্তাল্পতা ও আফ্রিকা ● ● ●

হায় ছায়াবৃতা আফ্রিকা! এই ভয়ংকর আণবিক রোগটির প্রকোপ আফ্রিকার মানুষ ছাড়া অন্যদের মধ্যে দেখা যায়নি। আফ্রিকার কিছু কিছু অংশে কান্তের জিনের প্রকাশ শতকরা চল্লিশ ভাগের মতো। ভাবতে গেলে চোখে পড়ে কোন ঘটনার চাপে এই বিপত্তি। যেখানে কান্তেকোষ homozygote বা heterozygote বেশী দেখা যায় সেখানে মারাত্মক রকমের ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। মনে করা হতো এই রোগের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রকৃতি একটি প্রকট স্বাভাবিক জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রচ্ছন্ন অস্বাভাবিক জিনের সৃষ্টি করেছে। ফলে সৃষ্টি হ'ল heterozygote কান্তে কোষ। এরা মানুষকে একদিক থেকে যেমন ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, অপরদিকে তাদের কান্তেকোষ রক্তাল্পতাও দেখা যায় না। কিন্তু homozygote দের ক্ষেত্রেই কান্তেকোষ রক্তাল্পতার ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটবে।

রোগ আমাদের বড় শিক্ষক ● ● ●

"Disease is a great teacher"—Linus Pauling

কান্তেকোষ রক্তাল্পতা রোগটি আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা দেখলেন একটি বিপুল আয়তন অণুর মধ্যে একটি অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবর্তনের ফলে তার ত্রিমাত্রিক গঠনের কতখানি পরিবর্তন ঘটে আর এই পরিবর্তন জীবদেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর কতদূর প্রভাব সৃষ্টি করে। কান্তে কোষ হিমগ্লোবিনের উপর বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা যায় অণুর গঠনের পরিবর্তন অর্থাৎ 'মিউটেশন' একদিকে যেমন উপকারী হতে পারে, তেমন অপকারী হতে পারে। সম্প্রতি কান্তে কোষ জিনকেও পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে এই জিনের এক জায়গায় অ্যাডেনিনের বদলে রয়েছে থাইমিন।

সুতরাং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ধরা পড়া ব্যাধিটি আমাদের কাছে রক্তের গঠনের আর এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল—জানা গেল রক্তের অন্তর্গত অপার বিস্ময়!

● ● ● ● ● ●

খুনীর খোঁজে পোকা

সুশান্ত গুপ্ত

প্রশাসনের কড়া নির্দেশ। অবিলম্বে করতে হবে খুনের কিনারা। গোয়েন্দা কর্তার মাথার ঘাম পায়ে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এলেন তদন্তে। বিশেষজ্ঞদলে আছেন কয়েকজন পতঙ্গবিদও।

১৯৬২ সালের ৫ই মে। রাশিয়ার আজারবাইজান্ প্রদেশে সমুদ্রের জলভর্তি এক জলাধার থেকে উদ্ধার করা হল আধগলা এক মৃতদেহ। শবের দেহ আর জামাকাপড় থেকে খুঁজে পাওয়া গেল এক বিশেষ জাতির মাছির জীবন চক্রের প্রথম দশা যাকে বলে শুককীট বা লার্ভা। শুরু হল গবেষণাগারে পরীক্ষার পালা। কিন্তু পরীক্ষার ফল দেখে সবাই অবাক। পরীক্ষায় দেখা গেল ঐ জাতের মাছির ডিম থেকে যে শুককীট তৈরী হওয়ার কথা, সেগুলো আদৌ সমুদ্রের নোনাজলে বাঁচতে পারে না। এ থেকে বিশেষজ্ঞরা ধরে ফেললেন খুনীর কেরামতি। তারা সিদ্ধান্তে এলেন খুনের ঘটনা কমপক্ষে সাত থেকে দশ দিন আগে হয়েছিল এবং মৃতদেহটাকে কয়েক ঘণ্টা আগে খুনী ঐ জলাধারে ফেলে রেখে গিয়েছিল। পরে খুনীও স্বীকার করে—সে ঐ ব্যক্তিকে ২৬শে এপ্রিল খুন করে এবং ৪ই মে মৃতদেহটাকে ঐ জলাধারে ফেলে রেখে যায়। শুধু কি তাই? প্রমাণ মিলেছে আরও অনেক। মৃতদেহটাকে জলাধারে ফেলবার জন্য যে গাড়ীতে চেপে অপরাধী এসেছিল সেই গাড়ীর সিট থেকেও পাওয়া গেল ঐ মাছির শুককীট বা পিউপা দশা (জীবনচক্রে শুককীটের পরবর্তী দশা) এবং সেগুলোও শবদেহ থেকে খুঁজে পাওয়া পিউপার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল।

এতো গেল এক সাম্প্রতিক ঘটনা। পোকামাকড় দিয়ে খুনের আসামী ধরার প্রাচীন নিদর্শনও আছে বৈকি! সেটা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন এক সময়কার কথা। চীনদেশের গ্রামে খুন হলেন এক চাষী। গ্রামের মোড়ল আশপাশের চাষীদের তাদের নিজ নিজ কাস্তে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো হতে আদেশ করলেন। সবাই জড়ো হলে প্রত্যেকের কাস্তে মাটিতে রাখা হল। কি অবাক কাণ্ড।

এক জাতের অসংখ্য মাছি নিমেষের মধ্যে কোত্থেকে উড়ে এসে একটা বিশেষ কাস্তের উপর জুড়ে বসল। খেল খতম। মোড়ল চেপে ধরলেন। ঐ কাস্তের মালিক নিজেকে খুনী বলে স্বীকার করল।

এবার জানা যাক কোন্ কোন্ বিশেষ জাতের পোকা মৃতদেহে এসে হাজির হয়। ডিপ্টেরা (Diptera) বর্গের (Order) পতঙ্গ ব্লো ফ্লাই (Blow fly), হাউস ফ্লাই (House fly); কোলিওপ্টেরা বর্গের (Coleoptera) পতঙ্গ স্যাপ বিটল্স (Sap beetles), রোভ বিটল্স (Rove beetles), ওয়াটার স্ক্যাভেন্জার বিটল্স (Water Scavenger beetles), প্লাম্প বিটল্স (Plump beetles) আরও কত কি। তবে এই সমস্ত পোকাই যে একসঙ্গে এসে হাজির হয় তা নয়। সাধারণত পোকার আক্রমণের দুসপ্তাহ বাদেই সম্পূর্ণ শবদেহটা পচে যায়। তবে পরিবেশটা যদি একটু বেশি গরম থাকে তবে এই পচে যাওয়াটা অনেক কম সময়েই হয়ে থাকে। মাঝারি আবহাওয়ায় মাটির পোকারা প্রায় একমাস বাদে মৃতদেহে এসে হাজির হয়। আবার শুকনো আবহাওয়ায় এক জাতের পোকা দুমাস আগের মরে থাকা কোন শিশু শবকে আক্রমণ করে।

কবর থেকে শবদেহ তুলে এনে যদি দেখা যায় তাতে ব্লো ফ্লাইয়ের লার্ভা রয়েছে তা হলে বুঝে নিতে হবে মৃতদেহটা অন্ততঃ এক'দিন কবরের বাইরে খোলা অবস্থায় রাখা ছিল। কারণ ঐ পোকারা কেবল আঢাকা মৃতের দেহেই ডিম ছেড়ে থাকে। আর যদি শবদেহটা পুরনো হয় এবং তাতে শুধুমাত্র ডিম বা সদ্য ফোটা লার্ভা থাকে তবে বোঝা যাবে যে মৃতদেহটা কিছু সময়ের জন্য ঐ পোকাদের অগম্য কোন এক জায়গায় রাখা ছিল। যদি রাত্রে কোন শবের দেহে ব্লো ফ্লাইয়ের ডিম পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে খুনের ঘটনা আগের দিন ঘটেছিল। মৃতদেহে যদি পূর্ণাঙ্গ মাছির, ক্রাইসোমাইয়া বেজিয়ানা (Chrysomyia bezziana) বা ক্যালিফোরা এরিথ্রোসেফালা (Calliphora erythrocephala) সন্ধান পাওয়া যায় তবে বুঝবে ১০ থেকে ১৪ দিন আগে ঐ ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছিল।

যদি মৃত ব্যক্তির জীবিত থাকাকালীন মাথায় উকুন থাকে তবে ব্যক্তির মৃত্যুর তিন থেকে ছয়দিন বাদে উকুনগুলো মরে যাবে। তবে চামড়ার উকুন ব্যক্তির মৃত্যুর পর টানা ১৪ দিন না খেয়ে বাঁচতে পারে। এখন যদি কোন মৃতদেহে চামড়ার উকুনগুলো মৃত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায় তবে চোখ বুজে বলা যাবে খুনের ঘটনা কমপক্ষে ১৪ দিন আগে ঘটেছিল। দেখা গেছে দেহের উকুন জলে ডুবে থাকা কোন শবদেহে ১২ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। একটা মৃতদেহ কতক্ষন জলে পড়ে রয়েছে তা ঐ মৃতদেহ থেকে সংগ্রহ করা উকুন পরীক্ষা করে সহজেই বলা যেতে পারে।

এই যে পোকাদের কথা বললাম তাদের কেউ পাহাড়ে থাকতে আবার কেউ বা সমতলে থাকতে ভালবাসে। এখন যদি কোলকাতার পোকাদের খুঁজে পাওয়া যায় দার্জিলিং-এ হদিস পাওয়া কোন মৃতদেহ থেকে তা হলে বুঝতে হবে খুনের ঘটনা কোলকাতায় ঘটেছিল এবং খুনের কয়েকঘণ্টা পর খুনী লাশটাকে দার্জিলিংএ পাচার করে দিয়েছিল। এছাড়াও পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা প্রভৃতি পোকা-মাকড়ের বৃদ্ধির হার, ডিম পাড়া ইত্যাদি ঘটনাকে নিয়ন্ত্রন করে।

হ্যাঁ, এরকমই অনেক পাকা মাথার খুনের ঘটনার সাক্ষী এই সামান্য পোকারা। আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানে প্রচলিত বিভিন্ন রাসায়নিক ও কলাসংস্থানগত (Histopathological) পরীক্ষা ছাড়াও কীটবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়েছে। তৈরী হয়েছে বিজ্ঞানের নতুন শাখা "ফরেনসিক এন্টোমোলজি (Forensic Entomology)"। পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন গবেষণাগারে চলছে খুনীর খোঁজে কীট অভিযান।

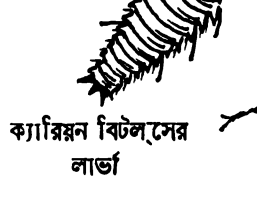

ক্যারিয়ন বিটল্সের লার্ভা

ব্লো ফ্লাই

রোভ বিটল্স

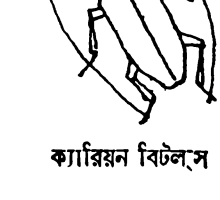

ক্যারিয়ন বিটল্স

সি-এফ-সি-এর কথা

আলোকময় দত্ত

আজকাল অনেক জিনিসকেই স্প্রে হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রং, সুগন্ধী, কীটনাশক, ব্যথা বেদনার মালিশ বা কাটাছেঁড়ার মলম আমাদের ছোটবেলা অর্থাৎ ষাট বা সত্তর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত আমরা টিউব, শিশি বা কৌটো থেকে সরাসরি ব্যবহার ক'রতাম। এখন এগুলো পাওয়া যায় 'স্প্রে-ক্যানে', তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় চাপ দিলেই অত্যন্ত মিহি ধোঁয়ার মতো বেরিয়ে আসে ব্যবহার্য জিনিসটি। জায়গা মতো তাকে এবার লাগালেই হ'লো। এ ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি, ব্যবহারও করি। আমরা এটাও দেখেছি যে এই স্প্রে হিসাবে ব্যবহারের ফলে প্রত্যেকটা জিনিসকে আগের চেয়ে অনেক ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। কোনো দেয়াল, আলমারী, টেবিল বা অন্য যে কোনো জায়গা রং দিয়ে ঢাকতে গেলে রংয়ের টিন থেকে রং লাগালে যতোটা খরচ হয় স্প্রে করলে খরচ হয় তার চারভাগের একভাগ মাত্র, তাছাড়া রংয়ের প্রলেপও সব জায়গায় সমানভাবে দেওয়া যায় যেটা বুরুশ করা অনেক বেশি কষ্টসাধ্য। মচকানি বা অন্য ব্যথায় যেসব মলম আমরা আগে শিশি বা টিউব থেকে নিয়ে হাত দিয়ে ঘসে মালিশ করতাম তাতে বেদনা উপশম করার ওষুধ (প্রধানতঃ মিথাইল স্যালিসাইলেট) যে পরিমাণ থাকতো স্প্রে-ক্যানের 'মালিশে' থাকে তার চারভাগের একভাগ, কারণ তাতেই কাজ হয়। আবার এই 'মালিশ' এমনকি ঘসতেও হয়না, একবার স্প্রে ছড়িয়ে দিলেই হলো।

কিন্তু একটা জিনিস কি কেউ ভেবে দেখেছো? এইসব নানান জাতের দ্রব্য, এদের সবাইকে স্প্রে অর্থাৎ ওইরকম মিহি ধোঁয়ার আকার কি ক'রে দেওয়া হয়েছে? এ রহস্য বুঝতে গেলে যে কোনো স্প্রে-ক্যানের গায়ে ক্যানের ভিতরকার নানাবিধ দ্রব্যের যে তালিকা দেওয়া থাকে সেইটা দেখে নিও। দেখবে সব কটাতেই লেখা আছে 'অ্যারোসল প্রপেলেণ্ট' (aerosol propellant)

এই কথাটি। তার মানে, 'অ্যারোসল' নামের একটা বস্তুর মধ্যে আসল দরকারী জিনিসটা (রং সুগন্ধী, ওষুধ ইত্যাদি ডোবানো আছে, 'অ্যারোসল'ই তাকে 'প্রপেল্' করছে, চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওই মিহি ধোঁয়ার আকারে। 'অ্যারোসল' না থাকলে ক্যান থেকে কোনো স্প্রে বার

হবে না।

'অ্যারোসল' বস্তুটি কি? নামটা আসলে একটা বিশেষ কোনো যৌগবস্তুর (Compound) নাম নয়। যেসব যৌগবস্তু অন্য যৌগের সঙ্গে মিলে নতুন যৌগ তৈরী করে না (রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় , নিজেরাও তাপে, চাপে, সূর্যের আলোয় বা কমশক্তির বিকিরণে নষ্ট হয় না, অথচ অনেক ধরনের বস্তুকে দ্রবীভূত করতে পারে (গুলে ফেলতে পারে) এবং চাপ কমালে মিহি ধোঁয়ার মতো অতি ছোটো তরলের ফোঁটার অথবা বাষ্পে রূপান্তরিত হয় তাদের সবাইকে সাধারণভাবে 'অ্যারোসল' বলা হতো। ইদানীং অবশ্য এদের মধ্যে একটা বিশেষ 'পরিবার'কেই এই নামে ডাকা হচ্ছে কারণ এর মধ্যে এই গুণগুলো বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে।

এই যৌগগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মিল হ'লো এরা সবাই ক্লোরিন, ফ্লুওরিন এবং কার্বন এই তিন মৌল দিয়ে তৈরী। একনম্বর ছবিতে এই পরিবারের দুই ভাইকে দেখা যাচ্ছে—'ট্রাই-ক্লোরোফ্লুওরোমিথেন' (tri-chlorofluoromethane) যার এক-একটি অনুতে একটি কার্বন পরমাণু তিন 'হাতের' বাঁধনে তিনটি ক্লোরিন পরমাণু আর বাকী হাতে একটা ফ্লুওরিন পরমাণুকে ধরে রেখেছে, এবং 'ট্রাই-ক্লোরো ট্রাইফ্লুওরোইথেন' (trichloro trifluoroethane) যার অণুতে দুটো কার্বন পরমাণু পরস্পরকে এক-এক হাতে পাকড়ে ধরেছে এবং বাকী হাতে একজন দুটি ফ্লুওরিন পরমাণুকে ধরে আছে। পরিবারের মধ্যেকার এই মিল থেকে এদের একটা ভালো নাম দেওয়া হয়েছে ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন (chlorofluorocarbon) পরিবার বা সংক্ষেপে 'সি-এফ-সি' (CFC) পরিবার। আমরাও এখন থেকে এদের এই সংক্ষিপ্ত নামেই ডাকবো কারণ এরাই আমাদের গল্পের 'নায়ক' (বলতে পারো খলনায়ক)।

'সি-এফ-সি'রা শুধু যে 'অ্যারোসল' হিসাবে অর্থাৎ স্প্রেতেই ব্যবহৃত হয় তা নয়, আজ থেকে দু'শ বছর আগে বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী জুল (Joule) দেখিয়েছিলেন কোনো গ্যাস বা তরল পদার্থকে চাপ দিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিলে সেই পদার্থ আয়তন বৃদ্ধির সময় আশপাশ থেকে তাপশক্তি টেনে নেয়, ফলে তার আশপাশের অংশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। 'ফ্রিজ' বা 'অ্যার-কণ্ডিশনার' এই পদ্ধতিতেই কাজ করে। সেখানে যে বস্তুটিকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে ছাড়া হচ্ছে তার গুণগুলিও অ্যারোসলের গুণের মতোই হওয়া দরকার। ফলে এখানেও 'সি-এফ-সি' ব্যবহার করা হয়।

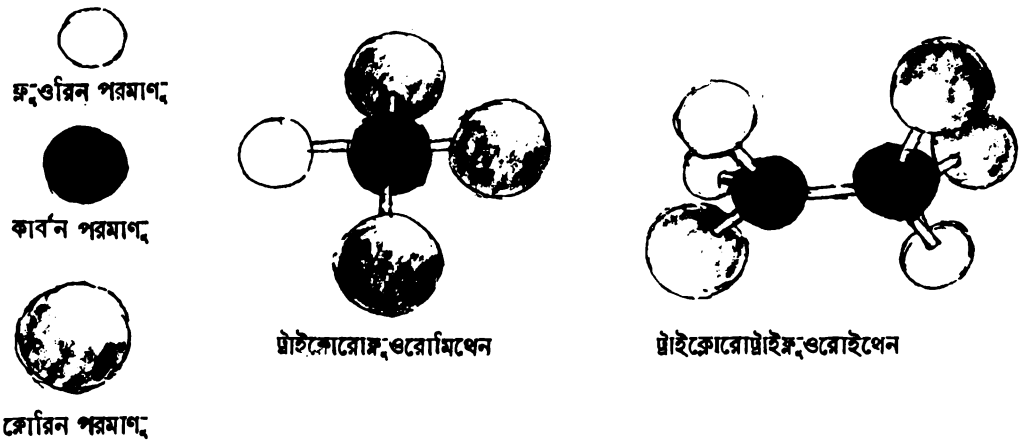

আরও আছে। 'থার্মোকিল' (thermocol) বা 'রাবার স্পঞ্জ' (rubber sponge), কে না জানে প্যাকিংয়ের কাজে এ দুইয়ের জুড়ি নেই, পালকের মতো হাল্কা, অথচ জলে ভেজেনা, তাপ বা বিদ্যুৎ যেতে দেয় না, ধাক্কাধাক্কিতে কিছুই হয় না এদের। এই দুটি জিনিসই তৈরী হয় বিশেষ বিশেষ 'পলিমার' বা অতিদীর্ঘ যৌগবস্তুর 'ফেনা' থেকে। সেই ফেনা তৈরী করতেও কম খরচের

মধ্যে 'সি-এফ-সি'রাই সেরা। এছাড়া অতি সক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ পরিষ্কার করতেও এদের খোঁজ পড়ে। এতো 'কাজের ছেলে', তাদের কিনা একটু আগে 'খলনায়ক' বলে বদনাম করছিলাম! হ্যাঁ, করছিলাম নয়, এখনও করছি কেন? সেটা বুঝতে হলে একটু অন্যদিকে চোখ ফেরাতে হবে।

ছোটবেলায় ভূগোল বইয়ে আমরা পড়েছি আমাদের চারপাশ ঘিরে রয়েছে বাষ্পের এক জগৎ, যার নাম 'বায়ুমণ্ডল'। সমুদ্র থেকে শুরু করে পাঁচশো মাইল পর্যন্ত উঠে গেছে এই বায়ুমণ্ডল। যতো উপরে ওঠা যাবে ততোই এর চরিত্র যাবে বদলে। সমুদ্রের পিঠ থেকে সটান দশমাইল উপর পর্যন্ত আছে 'ট্রপোস্ফিয়ার' (troposphere)। সমস্ত বায়ুমণ্ডলের যতো হাওয়া তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই রয়েছে এই অংশে। আমাদের আবহাওয়ার যতো কিছু খেলা, শরৎকালের আর বসন্তের পেঁজাতুলোর মতো মেঘ আর ফুরফুরে হাওয়া, গ্রীষ্মের

২

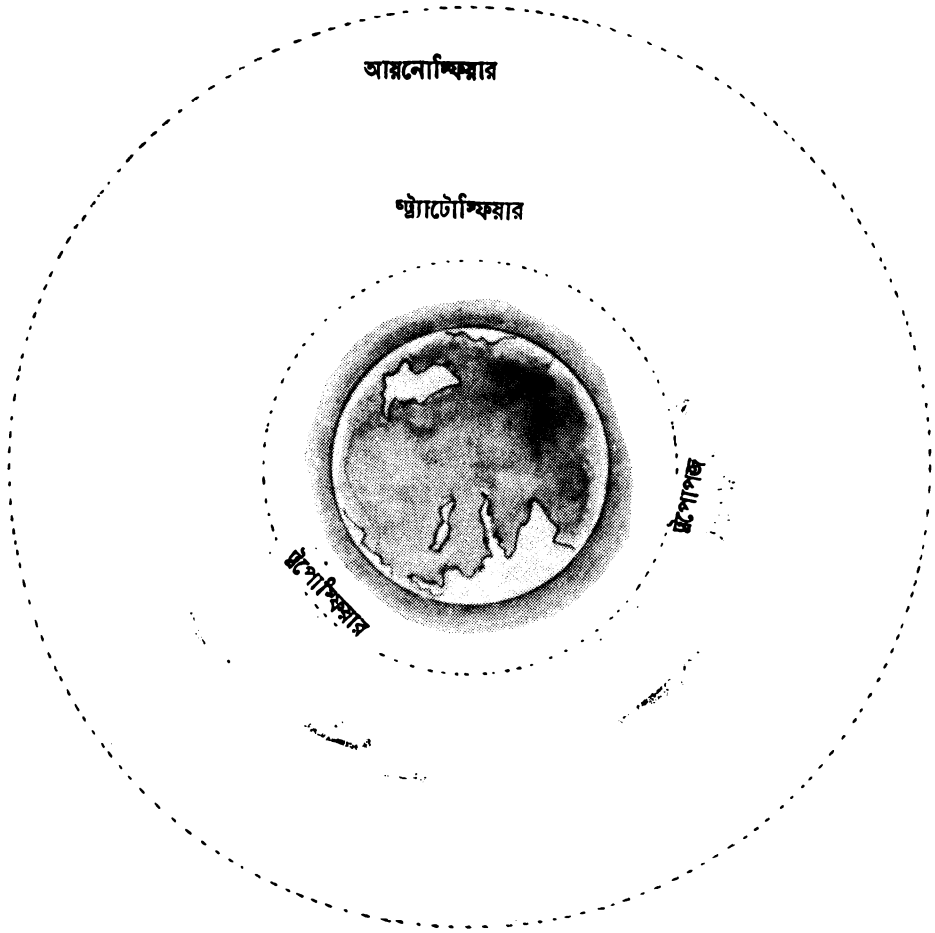

কালবৈশাখী, বর্ষার কালোমেঘ আর ঝমঝমে বৃষ্টি—সব কিছুরই উৎপত্তি আর সমাপ্তি ট্রপোস্ফিয়ারে। এতো পরিবর্তনেও কিন্তু এই স্তরের 'মালমশলার' অনুপাত একই থেকে যায় সেই শতকরা আটাত্তরভাগ নাইট্রোজেন, একুশভাগ অক্সিজেন আর বাকী একভাগের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলবাষ্প, আরও যতো রকমের ছুটকো-ছাটকা জিনিসপত্তর। ওজনে সামান্য হ'লেও এদের 'প্রতাপ' কিন্তু কম নয়!

দুই নম্বর ছবিতে আমরা বায়ুমণ্ডলের একটা মোটামুটি চেহারা দেখতে পাচ্ছি। ছবিটা অবশ্যই ঠিক ম্যাপে আঁকা হয়নি! যাইহোক, যতো পৃথিবী থেকে দূরে যাবো ততো বাতাসের চাপ আর উষ্ণতা নেমে গিয়ে দাঁড়াবে শূন্যের নীচে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এর ঠিক উপরে একটা পাতলা স্তর আছে যার নাম 'ট্রপোপজ' (tropopause)। এখানে উষ্ণতা কিন্তু ট্রপোস্ফিয়ারের চেয়ে বেশি। তার উপর আবার দশ মাইল জুড়ে আছে 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার' (stratosphere)। এর উষ্ণতাও ট্রপোস্ফিয়ারের চেয়ে বেশি— শূন্যের নীচে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখানে বাতাস খুব কমে এসেছে, উষ্ণতাও সর্বত্র সমান, এই স্তর আপাতদৃষ্টিতে খুব শান্ত, নিরুত্তাপ। 'আপাতদৃষ্টিতে' বললাম কারণ এই স্তরেই আমাদের বাষ্পের চরিত্ররা তাদের কীর্তি কলাপ দেখাবে। এর মাথায় দেখছি আরেকটা পাতলা স্তর, 'ওজোন স্তর' (ozone layer), অক্সিজেনের জ্ঞাতি-ভাই ওজোন, যার এক অণুতে দুটোর জায়গায় তিনটে অক্সিজেন পরমাণু আছে, এ স্তর জুড়ে তারাই রাজত্ব করছে। আর সবার উপরে, প্রায় চারশো মাইল প্রস্থ নিয়ে রয়েছে 'আয়নোস্ফিয়ার' (ionosphere) বা 'আয়নমণ্ডল'। এই 'প্রদেশের বাসিন্দারা হলো নানাধরনের পজিটিভ বা নেগেটিভ চার্জওয়ালা অণু আর পরমাণু যাদের 'আয়ন' (ion) বলা হয়।

সূর্যের থেকে ক্রমাগত বিকিরণ পৃথিবীতে আসছে, পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটারে দুশো ছত্রিশ ওয়াট ক্ষমতার বিকিরণ এসে পড়ছে দিনের বেলায়। এর মধ্যে সব রকমের রশ্মি আছে: 'রেডিও-তরঙ্গ', 'টিভি তরঙ্গ' বা 'মাইক্রোওয়েভ' (microwave), 'তাপরশ্মি' বা 'অবলোহিত রশ্মি' (infra-red rays), 'চোখে দেখা আলো' (visible) 'অতিবেগুনী রশ্মি' বা 'বেগনী পার আলো' (ultra-violet rays), 'রঞ্জন রশ্মি' (X-rays), 'গামা রশ্মি' (gamma rays) এবং 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic rays)। এদের মধ্যে শেষ তিনটি খুব শক্তিশালী, উদ্ভিদ সহ সমগ্র জীবদেহের উপর এদের প্রভাব মারাত্মক ক্ষতিকর। পৃথিবীতে এরা এসে পৌঁছলে এখানে প্রাণ সৃষ্টি বা প্রাণরক্ষা কোনোটাই সম্ভবপর হতো না। সুখের বিষয় এরা প্রথমতঃ সূর্য থেকে কম পরিমাণেই পৃথিবীতে আসে, এবং যেটুকু আসে সেটুকুও এই আয়নমণ্ডলে ধরা পড়ে যায়। এদের প্রভাবে আয়নগালো বেশি ছোটাছুটি করতে থাকে আর এই গতির ফলে আবার নতুন বিকিরণ ঘটে। তবে সেটা অনেক কম শক্তির, যেমন চোখে দেখা আলো। এই আলোকে আমরা 'মেরুজ্যোতি' (aurora borealis, aurora australis) ব'লি, সব মিলিয়ে বলা যায়—রঞ্জন রশ্মি, গামা রশ্মি এবং মহাজাগতিক রশ্মিগুলো আয়নমণ্ডলের প্রভাবে চোখে দেখা বা অন্য কমশক্তির আলোয় রূপান্তরিত হয়। সরাসরি পৃথিবীতে আসতে পারে না।

বেগনী-পার রশ্মির বেশ খানিকটা কিন্তু এখানে ধরা পড়ে না, আরও নীচে যায়। এরাও যথেষ্ট শক্তিশালী, যথেষ্ট ক্ষতিকর। এরা আমাদের দেহে নানারকমের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়, যার ফল বেশির ভাগই খারাপ হয়, যেমন চামড়ার ক্যান্সার অনেকগুণ বেড়ে গিয়ে অবশেষে মৃত্যু আনে। এই বেগনী-পার আলো আসে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপরের অংশে। সেখানে যা ঘটে তা তিন নম্বর ছবিতে দেখতে পাচ্ছি। বাতাসের মধ্যেকার অক্সিজেন অণুতে এই আলো এসে পড়লে এক অণু অক্সিজেন ভেঙে দু'টো অক্সিজেন পরমাণু তৈরি হয় (একে বলে 'সালোক বিভাজন' বা photo-dissociation)। রসায়ণের ভাষায় ব্যাপারটা দাঁড়াবে এইরকম ঃ

$$O_2 \xrightarrow{h\nu} O + O \text{ বা } 2O \quad (১)$$

(বেগনী পার আলোর শক্তি)

পরমাণুরা বেশিক্ষণ 'ছাড়া' অবস্থায় থাকতে পারে না, তাড়াতাড়ি অন্য পরমাণুর সাথে জুড়ে অণু তৈরী করতে চায়। আমাদের অক্সিজেন পরমাণুরাও এক একজন চট করে অন্য এক একটা অক্সিজেন অনুর সঙ্গে জোট বেঁধে ওজোন অনু তৈরী করে। অর্থাৎ কিনা

$$O_2 + O \rightarrow O_3 + Q \quad (২)$$

(তাপশক্তি)

ওজোন অণুও কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। সেই বেগনী পার আলোর

শক্তিতে সেও ভেঙে যায়। ফলে হয় ওপরের বিক্রিয়ার ঠিক উল্টো ব্যাপার। মানে—

$$O_3 \xrightarrow{h\nu} O_2 + O \qquad (৩)$$

তবে এই অক্সিজেন পরমাণুর একা থাকার জো-টি নেই!

অগত্যা সে আবার ২ নং বিক্রিয়াটায় যোগ দেয়। হয়তো আগের অক্সিজেন অণুর সঙ্গে জুড়ছে না, কিন্তু ফল তো একই—আবার ওজোন তৈরী হচ্ছে। এই 'চক্র' চ'লেছে ক্রমাগত, ফলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ওজোন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মাথায় গিয়ে জ'মে থাকছে। এরই নাম 'ওজোন স্তর'। এ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার ঘটছে,

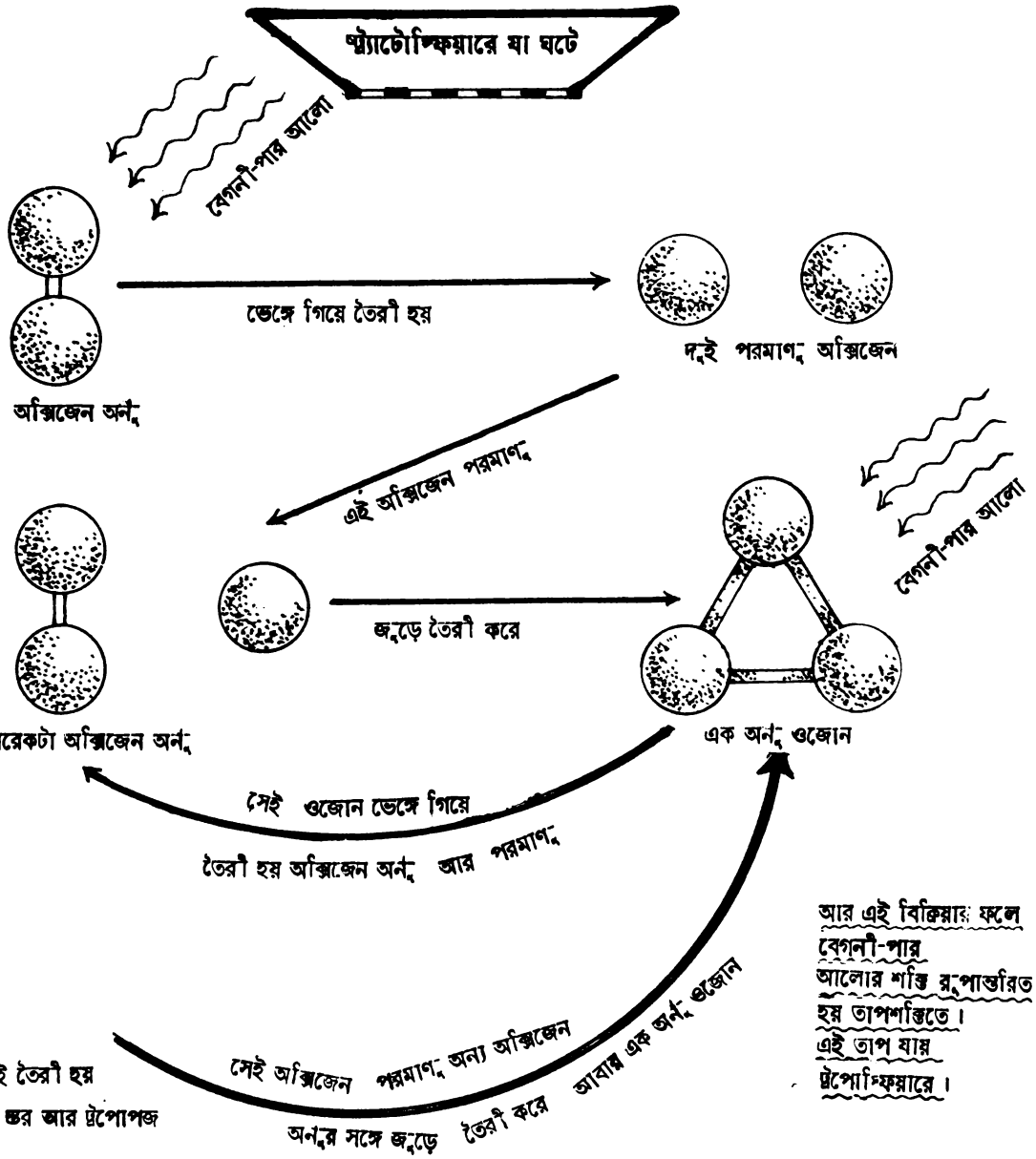

খেয়াল ক'রেছো কি ? (১) নং আর (৩) নং বিক্রিয়ায় দেখো সূর্য থেকে আসা বেগনী পার আলোর শক্তিটা খরচ হ'য়ে যাচ্ছে অক্সিজেন অণু আর ওজোন অণুদের ভাঙতে। অথচ (২) নং বিক্রিয়ায় দেখো সে শক্তিটা আলোক শক্তি হিসাবে ফেরৎ যাচ্ছে না তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হ'চ্ছে। এই তাপের ফলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নীচের দিগটা গরম হ'য়ে ওঠে, যাকে আমরা 'ট্রপোপজ' ব'লছি। যেটা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করার জিনিস সেটা হ'লো, সবকটা বিক্রিয়ার ফলেই 'বিজোড় সংখ্যার' অক্সিজেন পরমাণুর উৎপত্তি হচ্ছে, হয় অক্সিজেন পরমাণু নিজেই (সংখ্যা-১ অথবা ওজোন অণু (সংখ্যা-৩)।

আজ থেকে পনেরো বছরেরও আগে, অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে দুই মার্কিন রসায়নবিদ এফ শেরউড রোল্যান্ড (F Sherwood Rowland) এবং ম্যারিও মলিন্যা (Mario Molina) বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার'এ (Nature) একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তাঁরা এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন। তাঁরা ব'লেছিলেন, "আমাদের পরিবেশে ক্রমাগতই বেশী বেশী পরিমাণে সি-এফ-সি ছাড়া হ'চ্ছে। এই দ্রব্যগুলি রাসায়নিক ভাবে নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে চল্লিশ থেকে দেড়শো বছর পর্যন্ত র'য়ে যেতে পারে এবং এখনকার থেকে বায়ুমণ্ডলে এদের পরিমাণ দশ থেকে ত্রিশগুণ বেড়ে যেতে পারে। সালোক বিভাজনের ফলে সি-এফ-সি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমানে ক্লোরিণ পরমাণু তৈরী হবে এবং এ ব্যাপারটা ক্রমে বায়ুমণ্ডলের সমস্ত ওজোনকে ধ্বংস ক'রে ফেলবে।" অর্থাৎ সোজা কথায় আমরা যদি ক্রমাগত সি-এফ-সি ব্যবহার করতেই থাকি তবে আগামী একশো বছরের মধ্যে 'ওজোন' ব'লে কোনো কিছুই আর থাকবে না !

রোল্যান্ড আর মলিন্যা সেই প্রবন্ধে বুঝিয়েও দিয়েছিলেন এই ঘটনাটা কোন পথে ঘটে। এসো এবার সেটাই দেখি চার নম্বর ছবিতে। সি-এফ-সি-দের গুণ গুলো মনে আছে তো ? এরা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যায় না, জলে গোলে না, নীচু শক্তির কোনো আলোতেই নষ্ট হয় না, তাপে ভাঙে না। ফলে বায়ুমণ্ডলে একবার ঢুকে পড়লে এদের আটকাবার কেউ নেই, ট্রপোস্ফিয়ারের ঝড় বৃষ্টি রোদ সমস্ত কিছু এরা অবলীলায় ভেদ ক'রে এসে পৌঁছয় ওজোন স্তরে। এখানের শক্তিশালী বেগণী পার আলো, যা এর আশ পাশের ওজোন অণু নিয়ে ভাঙা গড়া চালাচ্ছিল, এবার এই সি-এফ-সি অণুকেও ভেঙে ফেললো এইভাবে

(ট্রাইক্লোরোফ্লুওরোমিথেন) সি-এফ-সি মূলক

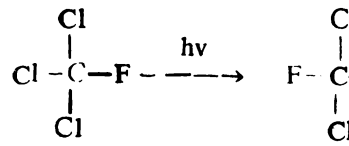

(৪) নং বিক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে সি-এফ-সি ভেঙে বেরিয়ে আসছে একটা ক্লোরিন পরমাণু। এ যাবে কোথায় ? ওজোন স্তরে এর সঙ্গে বিক্রিয়া করার বিশেষ কেউ নেই এক ওজোন অণু ছাড়া। তাই নীচের বিক্রিয়া ছাড়া এর আর খুব বেশী পথ নেই।

$$Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2 \qquad (৫)$$

ক্লোরিণ ওজোন ক্লোরিন অক্সিজেন
পরমাণু অণু অক্সাইড অণু
অণু

ক্লোরিন অক্সাইড কিন্তু ভীষণ ক্ষণস্থায়ী, সে আবার ক্লোরিন পরমাণুতে ফিরে যায় এই পথে

$$ClO + O \rightarrow Cl + O_2 \qquad (৬)$$

ক্লোরিন অক্সিজেন ক্লোরিন অক্সিজেন
অক্সাইড পরমাণু পরমাণু অণু
অণু

এছাড়া আরো কিছু কিছু বিক্রিয়ায় ক্লোরিনের কিছু ক্ষয় হয়। যেমন হাইড্রোজেনের বা জলের সঙ্গে মিশে সে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড HCl হয়ে যায়, তারপর বৃষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়ে। তবে প্রধান বিক্রিয়া হলো (৫) আর (৬)। (৫) নং বিক্রিয়ায় যে ক্লোরিন ওজোন ধ্বংস করার সময় ClO তে ধরা পড়েছিলো (৬) নং বিক্রিয়ায় যে আবার ছাড়া পায় এবং (২)-(৩) বিক্রিয়ার মতোই (৫)-(৬) নিয়ে আরেকটা 'চক্র' তৈরী হয়, তবে আগেরটা ছিলো ওজোন সৃষ্টি চক্র আর এটা হ'লো ওজোন ধ্বংস চক্র (অথবা আরও সঠিক ভাবে বিজোড়-অক্সিজেন ধ্বংসের চক্র) রোল্যান্ড-মলিন্যার তত্ত্ব অনুযায়ী—এই চক্রের দ্বারা একটি মাত্র ক্লোরিন পরমাণু এক লক্ষ ওজোন অনুকে ধ্বংস করে তবেই HCl হিসাবে বায়ুমণ্ডল থেকে সরে যায়। এর উপর নির্ভর ক'রেই বিজ্ঞানী দু'জন তাঁদের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণীটি করেন।

তোমরা ব'লবে, 'কিন্তু এতো ভয় কিসের ? আসল ব্যাপার তো বেগনী পার রশ্মির মারাত্মক শক্তিকে হজম করা। সেটা কি সি-এফ-সি-রা পারবে না ?' না, পারবে

না। এই শক্তি এখানে শুধুমাত্র হজম হয় সালোকবিয়োজন অর্থাৎ অণু ভাঙতে। ওজোনের ক্ষেত্রে (২) নং বিক্রিয়ায় বার বার ওজোন হচ্ছে আর (৩) নং বিক্রিয়ায় সেটা ভাঙছে। ফলে ক্রমাগত বেগনী-পারের শক্তি হজম হ'য়ে চলেছে। সেখানে, সি-এফ-সির ক্ষেত্রে প্রতি অণুতে শুধুমাত্র (৪) নং বিক্রিয়ার মধ্যে এই রশ্মির শক্তিটাকে খাওয়া হ'চ্ছে, তারপরে কোনমতেই সি-এফ-সি আর তৈরী হচ্ছে না, ফলে বেগনী পার আলোকে আটকাবার আর কেউ থাকছে না।

রোল্যান্ড ও মলিন্যা যখন প্রবন্ধটি লেখেন তখন তাঁদের হাতে আবহমণ্ডলে ইদানীংকালে কতটা ওজোন কমেছে বা কতটা সি-এফ-সি অথবা ক্লোরিন বেড়েছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য ছিলো না। সম্ভবতঃ সে কারণে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তাঁদের এই সিদ্ধান্তে ততটা আতঙ্কিত হ'য়ে পড়েননি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ একথাও ব'লেছিলেন যে সি এফ-সি তো বাতাসের চেয়ে অনেক ভারী, ফলে তার বেশির ভাগটাই বাতাসে উড়ে ওজোন-স্তর পর্যন্ত যাবে না, বরং মাটিতে থিতিয়ে পড়বে। তাঁরা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন – ট্রপোস্ফিয়ারে ক্রমাগত যে জোরালো হাওয়া বয় তা সি-এফ-সি'র চেয়ে অনেক বেশি ভারী জিনিসকেও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই যুক্তি ধোপে টিকলো না দেখে তখন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান বেলুন এবং অন্যান্য 'উড়োজাহাজ' চড়ে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মাথায় উঠে সি-এফ-সি, ক্লোরিন, এবং ক্লোরিন অক্সাইড খুঁজতে লাগলেন। ১৯৭৫ থেকে এখনও চলেছে এই 'হিসাব রাখা' বা monitoring এর কাজ। পৃথিবী থেকে ছাড়া সব কয়টি সি-এফ-সি, ক্লোরিন অক্সাইড, ক্লোরিন, এমনকি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও পাওয়া গেছে এখানে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিক্রিয়া (৪), (৫), ও (৬) সম্পর্কে রোল্যান্ড আর মলিন্যা কোনো ভুল করেননি। এছাড়া আরও একটা হিসাব করা হয়েছে পৃথিবী থেকে ছাড়া সি-এফ-সির কতটা বায়ুমণ্ডলে রয়ে যাচ্ছে। দেখা গেছে প্রায় ৮৫-৯০ শতাংশ সি-এফ-সি সোজা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে চলে আসছে। ১৯৭৪ সালে যেখানে গড়ে মোট হাজার কোটি বিভিন্ন অনুর মধ্যে ১৭টি সি-এফ সি অনু পাওয়া যেতো ১৯৮৮ তে সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ৩৫টিতে। ১৪ বছরে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে সি এফ সির পরিমাণ অর্থাৎ এখন দ্বিগুণেরও বেশি (প্রতি হাজার কোটিতে ৩৫ লক্ষ) ওজোন অণু ধ্বংস হচ্ছে!

এই ঘটনাতেই সারা পৃথিবী শিউরে উঠেছিলো, তার উপর আবার ওজোনের ঘাটতি মাপতে গিয়ে ভয় আরও প্রচণ্ড বেড়ে গেলো। ১৯২০ সাল থেকে পৃথিবী বক্ষে নানাস্থানে ওজোন মাপা শুরু হয়। দক্ষিণ মেরুর (Antarctica) হ্যালী উপসাগরের (Halley Bay) উপর মাপার ফলে দেখা গেলো এখানে ওজোনের পরিমাণ ১৯৭০ থেকেই কমছে। কমতে কমতে ৮০-র দশকে এসে সেটা ঝপ্ করে আরও নীচে পড়ে গেলো। আর একই সময়ে উপগ্রহ থেকে তোলা বিশেষ ধরনের ছবিতেও দেখা গেলো দক্ষিণ মেরু বৃত্তের উপরে ওজোন প্রায় নেই বললেই চলে (আগের পরিমাণের মোটে ৫ শতাংশ রয়ে গেছে)। ওজোনের এই ঘাটতিকেই বলা হলো 'দক্ষিণ-মেরুর ওজনের গর্ত' (Anarctic Ozone Hole)। এই 'গর্ত' দেখে সবার চোখ কপালে উঠলো, এরকম গর্ত হলো কি করে? বিজ্ঞানী ম্যাকর্মিক (McCormick) ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। গোটা ব্যাপারটা হচ্ছে দক্ষিণ মেরুবৃত্তের দীর্ঘ ও প্রচণ্ড শীত রাত্রির জন্য। সেই ঠাণ্ডায় (−৯০° সেলসিয়াস) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বরফের মেঘ তৈরী হয়। এই মেঘ হলো নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপযুক্ত 'প্ল্যাটফর্ম',-এর উপর HCl এবং ক্লোরিন নাইট্রেট ($ClNO_3$) ক্লোরিন অনু (Cl_2) এবং হাইপোক্লোরাস অ্যাসিডে (HOCl) পরিণত হয় এবং জমে থাকে। ClO-কে বায়ুমণ্ডল থেকে সরাবার একটি উপায় হলো নাইট্রোজেনের (N_2) সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে $ClNO_3$-তে বদলে ফেলা। সেই নাইট্রোজেনও এই ঠাণ্ডা হাওয়া আর বরফের সঙ্গে যুক্ত করে নাইট্রিক অ্যাসিডে (HNO_3) রূপান্তরিত হয়ে জমে যায়। দীর্ঘ রাত্রির শেষে বসন্তকালে সূর্যের ছোঁয়া লাগতেই ক্লোরিন অক্সাইড থেকে ক্লোরিন পরমাণু বার হয় এবং নাইট্রোজেনের অনুপস্থিতিতে বাঁধন ছাড়া ভাবে ওজোন ধ্বংস শুরু করে।

এছাড়া আরও আছে। সূর্যের বিকিরণে পৃথিবীর দেহ গরম হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। এই তাপ পৃথিবী অবলোহিত রশ্মির আকারে মহাকাশে ফিরিয়ে দেয়। মানুষের সভ্যতা যতো বিকশিত হয়েছে ততোই নানা ধরনের গ্যাস, বিশেষ করে জলবাষ্প আর কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) মানুষ আকাশে-বাতাসে ছেড়ে চলেছে, অন্যদিকে গাছপালা কেটে ফেলার ফলে এই গ্যাস হজম ক'রে নেওয়ার মতো কেউ নেই পৃথিবীতে। পৃথিবী যে অবলোহিত রশ্মি ছাড়ে তার প্রায় ৪০% এসব গ্যাস শুষে নিয়ে আবার পৃথিবীতেই ফেরৎ পাঠায়।

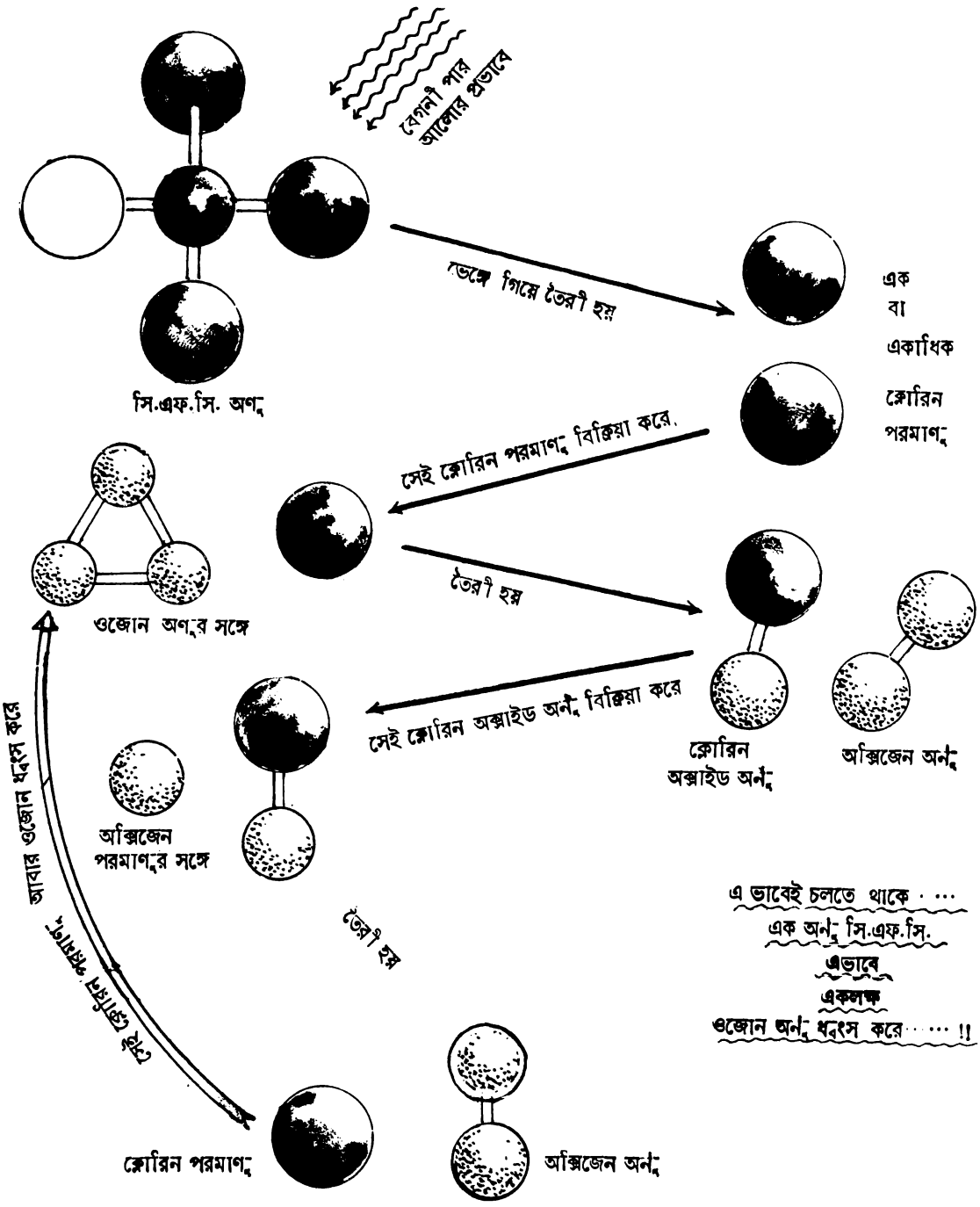

সি এফ.সি. অণু উপরে গেলে যা ঘটে

পৃথিবীর গড় উষ্ণতা এর জন্য বেড়ে আজ ১৫০০ সেলসিয়াসে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন পৃথিবী যেসব অবলোহিত রশ্মি দিয়ে তাপ ছাড়ে সেগুলোকে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড বা জল শুষে নিতে পারে না। শীতের দেশে ছোটো ছোটো বাড়ির চালে তাপশোষক বসিয়ে তাপ আটকে রাখা হয়, তারপর সেখানে গরম দেশের গাছপালা গজানো হয়। বাড়িগুলোকে বলে 'গ্রীণ হাউস' (Green house)। বায়ুমন্ডলে তাপ আটকে যাওয়ার ঘটনাটিকেও তাই বলা হ'চ্ছে গ্রীণহাউস' ক্রিয়া' (Green-house effect)। উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারছো গ্রীণহাউস ক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড বা জলের গুরুত্ব আজকাল কমে এসেছে। তাই ব'লে কিন্তু ভেবোনা যে আর ব্যাপারটা ঘটছে না। বরং এখন এর বৃদ্ধির হার অনেক বেশি হয়েছে, আর এই বৃদ্ধির মূলে এখন আছে সেই 'নাটের গুরু'রা অর্থাৎ সি-এফ-সি'রা। ভারতীয় বিজ্ঞানী রমান্যাথন ১৯৭৫ সালেই দেখিয়েছিলেন যে এক একটি সি-এফ-সি অণু এক একটি কার্বন ডাই অক্সাইড অনুর চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি অবলোহিত রশ্মি শুষে নিতে পারে এবং এরা সেসব রশ্মিকেও শুষে নেয় যাদের কাছে CO_2 বা জলীয় বাষ্প স্বচ্ছ!

আমরা দেখেছি ঠান্ডায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বরফের মেঘ জমলে ওজোন ধ্বংসের হার বাড়ে। অর্থাৎ কর্কটক্রান্তির উত্তরে আর মকরক্রান্তির দক্ষিণে সি-এফ-সি'র কুপ্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও উত্তর ইউরোপের দেশগুলি তাই ১৯৮০-৮১ থেকেই সি-এফ-সি'র ব্যবহার বন্ধ ক'রে দিতে উঠে পড়ে লাগলো। ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিলের (Montreal) এক অধিবেশনে রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ দপ্তর সি-এফ-সি ব্যবহারের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী ক'রেছেন। নিষেধাজ্ঞায় বলা আছে ১৯৯৪ এর মধ্যে পরিবেশে সি-এফ-সি ছাড়ার পরিমাণ ১৯৮৬ সালের থেকে ২০ কমাতে হবে আর ১৯৯৯ এর মধ্যে একে আরও ৩০% কমিয়ে দেওয়া চাই

তবে বড়ো বড়ো বহুজাতিক কোম্পানীর মালিকরা এতেও বাদ সেধেছেন। কারণ? সে তো প্রথমেই ব'লেছি, বহু ব্যাপারে বিশেষতঃ অ্যারোসল আর ফোম ইন্ডাস্ট্রিতে সি-এফ-সি'র বিকল্প এখনও ঠিকমত বেরয়নি। যে কয়টি বেরিয়েছে তাদের দাম অনেক বেশি। সেগুলোর ব্যবহারে এইসব শিল্পপতিদের মুনাফার পর্বতগুলো আর ততোটা তাড়াতাড়ি উঁচু হ'তে পারবে না। অগত্যা নিজেদের মুনাফার স্বার্থে গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নষ্ট না ক'রে এইসব 'মহান শিল্পপতি'রা আর কি করবেন? স্বদেশ আন্দোলনের চাপে তারা বাধ্য হ'য়েই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই সি-এফ সি চোরাপথে চালান ক'রছেন আর আমরাও সাহেবদের মতো স্মার্ট হওয়ার জন্য সবকিছুতে অ্যারোসল ব্যবহার করে একদিকে নিজেদের বারোটা বাজাচ্ছি আবার অন্যদিকে বিশ্বের কাঠগড়ায় আসামী হওয়ার বন্দোবস্তও কর'ছি। তোমরা যারা এতোক্ষণ লেখাটা পড়ছো আশাক'রি এই ভুল তোমরা নিজেরা ক'রবে না, অন্যদেরও ক'রতে দেবে না। কারণ, আমাদের সুন্দর পৃথিবীটাকে মানুষ আর অন্য প্রাণীদের বাসযোগ্য রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই।

কথার কথা শেখার নয়

শিক্ষক : বল্—সাতে পাঁচে যোগফল কত?
ছাত্র : নেই, স্যার।
শিক্ষক : ডেঁপো ছেলে। যোগফল নেই?
ছাত্র : নেই, স্যার। মা বলেছে সাতে পাঁচে থাকতে নেই।

কলেজে বেরুবার আগেই লেটার বক্স থেকে খামখানা তুলে জগুমামার হাতে দিয়েছিলাম। চোখে পড়েছিল, চিঠিখানা এসেছে ডক্টর এ. কে. মহান্তি নামে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে এবং জগুমামার ঠিকানা উল্লেখ ছিল দিল্লির। সেখান থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে শেষতক এখানে এসে পেঁছেছে।

ফলে মনের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল কিলবিল করছিল। কারণ জগুমামার কাছে চিঠি আসা মানেই

তাছাড়া ডক্টর মহান্তির নাম এর আগে শুনিওনি মামার কাছে। সেকারণেই কৌতূহলটা আরো বেশী।

হলো এমন মেতে আছি, কোনোদিকে তাকাতেও পারিনি।

তবে এবার শেষের মুখে। যদি শেষপর্যন্ত সফল হই, একেবারে হৈচৈ পড়ে যাবে।

একবার চলে এসো না। দারুণ খুশী হবো। গোপনীয়তা রাখার জন্যেই আমার মূল ঠিকানা দিলাম না। রামনগর থানায় তোমার পরিচয় দিলে থানা থেকেই তোমায় আমার ডেরায় পেঁছে দেবে।

তোমার অপেক্ষায় রইলাম। ভালবাসা নিও।

প্রীতিমুগ্ধ অবিনাশ

বাড়ি ফিরেই তাই প্রায় দৌড়ে ঢুকলাম মামার ঘরে। চিঠিটা কোত্থেকে? কে ডক্টর মহান্তি?

একটু হেসে মামা চিঠিটা বাড়িয়ে দিলেন।

প্রযত্নে ঃ রামনগর থানা, কাঁথি মহকুমা
মেদিনীপুর, ২রা জানুয়ারি ১৯৯০

প্রিয় জগবন্ধু,

অনেকদিন তোমার খবর পাই না। নিজের একটা প্রচণ্ড শক্ত ও দারুণ ইণ্টারেস্টিং কাজ নিয়ে বছরখানেক

দ্রুত চিঠি শেষ করে মুখ তুলতেই মামা হেসে বললেন, —অবিনাশকে তুই চিনিস্ না! বেশ কিছুদিন দেখা সাক্ষাৎও নেই। ও আমার বহু পুরনো বন্ধু। তা যাবি নাকি?

মনের মধ্যে খই ফুটতে থাকা আনন্দটাকে কোন মতে সামলে শুধোলাম,—চিঠির ডেটটা দেখেছো?

—হুঁ। দুমাস আগের। তাতে এক পক্ষে ভালোই। হয়তো অবিনাশ এর মধ্যে কাজটা নামিয়েই ফেলেছে।

পালা করে টানা গাড়ি চালিয়ে বেলা একটা নাগাদ রামনগর থানা চত্বরে যখন ঢুকলাম, তখন বেশ পরিশ্রান্ত লাগছিল। জাতীয় সড়ক এমনিতে মসৃণ, দুপাশে ইউক্যালিপটাস গাছে ছায়াচ্ছন্নও। তাছাড়া সময়টা ফাল্গুন মাস, তেমন গরমও নয়। তবু পথ তো কম নয়।

ও. সি.-কে নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিলেন মামা। ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জী, তারপর প্রায় দুলাইন জোড়া ডিগ্রি ও সম্মান এবং সবশেষে লেখা 'জাতীয় বিজ্ঞানী'।

মুহূর্তে ও. সি. শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বসুন বসুন স্যার।

আমরা ডক্টর মহান্তির সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি ততক্ষণে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছি।

—নিশ্চয়ই স্যার। আমি এখনই ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করছি!

বলতে বলতে ও. সি. পাশের ঘরে চলে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত বাদেই ফিরে এলেন আবার,—ডক্টর মহান্তি নিজেই গাড়ি পাঠাচ্ছেন স্যার। একটু ওয়েট করুন।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ডঃ মহান্তির মারুতি এসে হাজির।

মামা উঠে দাঁড়িয়ে কানে কানে ও. সি.-কে কি সব বললেন, তারপর বললেন আমায়,—চল! এগোনো যাক্।

ঝড়ের গতিতে ফাঁকা রাস্তা চিরে মারুতি ছুটছে। দুদিকে ছোট ছোট ঝাউ গাছ। ঝাউগাছগুলো এবার কিছু বড়। জায়গা জায়গা ফাঁকা, ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। সেখান দিয়ে দেখা যায় অসীম অপার জলধি।

ওল্ড দীঘা পেরিয়ে নিউ দীঘাও শেষ হলো। মারুতি ছুটে চলেছে সাগরের কোল ঘেঁষা সড়ক দিয়ে। এবার হঠাৎ সে বাঁক নিলো বাঁদিকে, সরু সুরকি মোড়া রাস্তায়।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিতে ভেসে উঠলো দূরের সাগরের উপর একটা ছোট জেটি, যার শেষপ্রান্তে জলের ওপরই একখানা কুঠিবাড়ি।

পথের শেষে জেটির মুখে দুই সশস্ত্র প্রহরী। তাদের পাশ কাটিয়ে মারুতি 'সাঁ' করে এগিয়ে গেলো। থামলো একেবারে কুঠির সামনে।

আমরা নামবার আগেই সোচ্ছ্বাসে ভিতর থেকে যে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, উনিই যে ডক্টর মহান্তি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—হ্যালো, জগবন্ধু! হাউ আর ইউ?

—ফাইন! তুমি?

—অলরাইট। তোমার সঙ্গে—

—আমার ভাগ্নে টুকলু, পোশাকী নাম অর্ণব ভট্টাচার্য। আমার সব সময়ের সঙ্গী।

—হ্যালো মাস্টার, এসো এসো।

আমরা ঢুকে পড়লাম কুঠির অন্দরমহলে। ঝাঁ চকচকে ড্রইংরুম। নরম গদিমোড়া সোফায় শরীর ডুবিয়ে মামা বলে ওঠেন,—এ তো এলাহী কারবার করে ফেলেছো হে।

কী যে বলো! আর কি জানো জগু, আজকের—আচ্ছা আগে এটা খেয়ে নাও। রাস্তার ধকল তো কম যায়নি।

বেয়ারা সুদৃশ্য ট্রেতে করে তিন গ্লাস গোলাপী শরবত নিয়ে উপস্থিত। দ্বিরুক্তি না করে তুলে নিলাম।

শরবত চুমুক দিয়ে মামা বললেন,—হ্যাঁ, বলো কি বলছিলে?

বলছিলাম আজকের দুনিয়াটাই টাকার বশ—অবিনাশবাবু বললেন: যার কাছে টাকা, সেই শাহেনশা। সবাই এসে তোমার পা চাটবে। এ আমি সার বুঝে গেছি।

ভুল বুঝেছো। মামা প্রতিবাদ করলেন: টাকাই সব নয়। যদি তাই হতো, তাহলে আমাদের কেউ পুঁছতো না। সম্মান দেখিয়ে মাথা নোয়াতো না।

সেও তো নিজেদের স্বার্থে। —অবিনাশ মহান্তি নিজের যুক্তিতে অনড়: আমাদের বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো নিয়ে কোটিপতি শিল্পপতিরাই তো মুনাফা লুটছে। সেজন্যেই ওটুকু সম্মান। বুঝলে?

না অবিনাশ, পৃথিবীতে শুধু কি ওরাই আছে? চীন, ভিয়েতনাম, সোভিয়েত এসব দেশের কথা ভুলে যাচ্ছো কেন?—জগুমামা রীতি মত বিরক্ত: যাক্‌গে আলোচনা থাক্। তুমি তোমার রিসার্চের ব্যাপারটা দেখাও।

এই তো: তোমার চোখের সামনেই ছড়িয়ে আছে। অবিনাশবাবু কেমন অদ্ভুত হেসে সামনের দিকে আঙুল দেখালেন: ঐ যে ঝাড়বাতির ফ্রেম, শেডল্যাম্প, অ্যাসট্রে, পুতুল ঐ সবই তো—

উনি যতক্ষণ বলছিলেন মামা ও আমি বিস্ফারিত চোখে ওগুলি দেখছিলাম। এতক্ষণ খেয়াল করিনি তো!

সহসা মামা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন অবাক গলায়, তার মানে! তার মানে ওগুলো সবই—

—হ্যাঁ। সোনার। পাক্কা চব্বিশ ক্যারাটের। দেখছো না কেমন ঝলসাচ্ছে!

ঐত এত সোনা! আমার মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত বেরিয়ে এলো।

ইয়েস মাস্টার টুকলু।—অবিনাশবাবু মাথা দোলালেন ঃ তুমি বোধহয় ঠিক জানতে না জগু, আমার রিসার্চের বিষয়ই ছিল সোনা। হ্যাঁ, সোনাকে কিভাবে সমুদ্রজল থেকে সহজ ও সুলভ পদ্ধতিতে বের করা যায়। কারণ এটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত, সাগর জলে খুব সামান্য হলেও সোনা আছে।

হুঁ।—মামা মাথা নাড়লেন ঃ তারপর ?

তো আমি সেই লবণাক্ত জল নিয়েই গবেষণা শুরু করেছিলাম। —মহান্তি বললেন ঃ হিসেব কষে দেখেছি, পৃথিবীর সমস্ত সোনার খনিতে ও বাইরে যা সোনা পাওয়া গেছে, সমুদ্রজলের সব সোনা যদি সুলভ পদ্ধতিতে বের করা যায়, তার পরিমাণ হবে বেশ কয়েকগুণ বেশী। কিন্তু মুশকিলটা ছিল নিষ্কাশন করায়। খরচ পড়ে যাচ্ছিল অসম্ভব। ঠিক যেন সেই প্রথম অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের সময়ের অবস্থা। একটা ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের ফুলদানির দাম পড়েছিল পাক্কা দুশো পাউন্ড।

আর আজ ? সচরাচর সস্তা ধাতুদের মধ্যে এসে গেছে অ্যালুমিনিয়াম। এই চিন্তাটাই আমায় সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছিল, স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

তারপর কতকগুলো জটিল বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর‍্যাম বা সোনাকে অর‍্যাম ক্লোরাইডে পাল্টে ফেলে শেষ অবধি হাইড্রোজেন আয়ন দিয়ে তাকে বিশ্লিষ্ট করিয়েছি। চেম্বারের তলায় জমা হয়েছে নিখাদ সোনা, উপরে ভেসেছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

আর এই পদ্ধতিতে ১৩ গ্রাম সোনায় দাম কত পড়ছে ভাবতে পারো ? মাত্র ১০ টাকা !

অ্যাঁ !!! —আমরা দুজনেই বিস্ময়ে বোবা বনে যাই। বিস্ময়ের ধাক্কা খানিকটা সামলে জগুমামা অস্ফুটে বলে উঠলেন,— ক-নু-গ্রা-চু-লে-শ-ন্ অবিনাশ! তোমায় অভিনন্দন জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার!

বলতে বলতে জগুমামা উঠে গিয়ে দুহাত দিয়ে অবিনাশ মহান্তির হাত চেপে ধরলেন,—ভাই, এখুনি তাহলে জানাতে হয় যে গরমেণ্টকে। পেটেণ্ট নিতে হবে। ওফ্ আমি আমি সত্যি ভাবতেও পারছি না।

একটু ধৈর্য ধরো ভাই জগু। —সামান্য হাসলেন মহান্তি ঃ গরমেণ্টকে জানাবার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা আছে। তোমার সাহায্য চাই।

—মানে ?

—আঃ বলবো সব। অত অধৈর্য হচ্ছো কেন ? অনেক কথা আছে। বেলা তো কম হয় নি। এসো, আগে লাঞ্চটা সেরে ফেলি।

গলদা চিংড়ি, চিকেন ইত্যাদি উপাদেয় সব পদ থাকলেও মামা যে তাতে মোটেই মন দিতে পারছেন না, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

খাওয়া শেষ করে অবিনাশবাবু ধীরেসুস্থে তোয়ালেতে হাত মুখ মুছলেন। তারপর মামাকে বলতে শুরু করলেন

ভারত সরকারকে আমি যখন আমার স্কীমটা পেশ করলাম, তাঁরা আমলই দিলেন না। DST বা বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তর পরিষ্কার জানালো, অ্যাবসার্ড।

কিন্তু আমিও ছাড়তে রাজি নই।

অনেক ঘোরাঘুরি করে শেষ অবধি, মাসচারেক পর, আমার প্রোপোজাল পাস হলো। টাকা মঞ্জুর হলো। তবে যা চেয়েছিলাম তার অর্ধেকেরও কম। গরমেণ্ট জানালো, আমার কাজের অগ্রগতি দেখে তবে বাকিটা দেবে।

কী হাস্যকর অপমানজনক! আমার রিসার্চের যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটারি, জেটি এসব বানাতেই তো চাওয়া টাকার সিংহভাগটা লাগবে। এত সামান্য টাকা নিয়ে আমি করবো কি ?

কিন্তু, একজন বিজ্ঞানী হয়ে তুমি তো জানো জগু, মাথায় যখন নতুন আবিষ্কারের স্বপ্ন নাচতে থাকে, তখন অন্য কোনদিকে আমরা তাকাই না। আমারও তাই হলো। যদ্দুর কম খরচে সম্ভব, আমি ঐ সামান্য টাকা দিয়েই সরঞ্জাম, ল্যাবরেটারি বানাবার কাজে লাগলাম। সাজাচ্ছি বটে, তবে প্রতিমুহূর্তেই বুঝছি একটু একটু করে পুঁজি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর দু-একদিনের মধ্যেই কপর্দকহীন হয়ে অসহায় বসে থাকতে হবে, কাজ শুরুই করতে পারবো না।

ঠিক এইসময় হঠাৎ একদিন আমার সামনে উপস্থিত হলেন এক ভদ্রলোক। কোটিপতি, একাধিক বিরাট শিল্পের মালিক। নাম বললেন কে, কে, বাজোরিয়া। সরাসরি এসে বললেন,—আমি আপনার রিসার্চের ব্যাপারে কিছু কিছু শুনেছি। আপনি টাকার জন্যে ভাববেন না। আমি আপনার পেছনে আছি। কত বাজে কাজেই তো টাকা খরচ হয়, আমি চাই আমার অর্থে আপনার এই মহৎ গবেষণা সফল হোক্।

এ যেন দেবদূত! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবু বললাম, - কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে অকারণে অনুগ্রহ নেবো কেন? না-না, তা সম্ভব না।

—আহা, আপনি একে অনুগ্রহ ভাবছেন কেন? আমি তো বলছিই,—

—না না, আপনি যাই বলুন, বিনা প্রতিদানে কারও কাছে আমি ঋণী থাকতে নারাজ।

—বেশ। আপনি যখন নাছোড়বান্দা, আপনার কাজ সফল হলে পর আপনার কাছ থেকে একটা ছোট্ট জিনিস চেয়ে নেবো প্রতিদানে! কী, এবার রাজি তো?

আমি তখন নিজের স্বপ্নে পাগল! চিন্তা যুক্তি বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে! আমি গবেষণায় সিদ্ধিলাভ করতে—

ঐ ভদ্রলোকের কথায় রাজি হয়ে গেলে? - জগুমামা এতক্ষণ পরে কথা বললেন।

হ্যাঁ। — ডক্টর মহান্তি অসহায় ভাবে মাথা নাড়লেন।

—আর তোমার রিসার্চ শেষ হলে ঐ বাজোরিয়া না জানোরিয়া তোমার কাছে এসে সবিনয়ে রিসার্চ-এর ফাইলটা চাইলেন। তাই তো?

তুমি—তুমি কি করে জানলে? —এবার বিস্মিত হবার পালা অবিনাশ মহান্তির!

— এটা বোঝা জলের মতো সোজা। তুমি তখন 'ঘোর' এ ছিলে বলেই বোঝো নি। যাক্ তারপর?

আমি বললাম, তা সম্ভব নয়। ঐ তথ্য আমি মরে গেলেও দেবো না। তখন উনি বললেন: তাহলে ঐ প্রক্রিয়ায় সোনা নিষ্কাশন করে প্রতিদিন এক কেজি করে দিতে হবে। যা লাভ হবে ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি।

বাঃ বাঃ! চমৎকার! —জগুমামার চোখমুখ কুঞ্চিত হয়ে গেলো। তীব্র শ্লেষের সুরে বলে উঠলেন: মহান্ বিজ্ঞানী অবিনাশ মহান্তি শেষ অবধি স্মাগলারদের দলে। আহা, এ আনন্দ রাখি কোথায়!

স্মা-গ-লা-র! —কথা কটি বলেই অবিনাশবাবু মুখ নিচু করলেন দুহাতের তালুতে!

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মাঝখানে একটা কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো। চমকে সিধে হয়ে বসলাম।

—ডক্টর মহান্তি, আপনি এতবড় ভুল করে বসলেন। বন্ধুকে পেয়ে গড়গড় করে সব বলে দিলেন। কি করে ভুলে গেলেন, আপনার ঘরে ক্যামেরা-মাইক্রোফোন বসানো আছে?

না - ভুলি নি! অবিনাশবাবু ছিটকে সোজা হয়ে বসেছেন। ওঁর দুচোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। উনি যেন গেঙিয়ে উঠলেন: আমি আমি ইচ্ছে করেই সব বলেছি। নিজের বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে আমি বিপর্যস্ত। আমি—প্লীজ আমায় মুক্তি দাও।

আঃ, ইল্লি আর কি! - কণ্ঠস্বর যেন ভেঙচে উঠলো: মুক্তি দাও! ছেলের হাতের মোয়া। সোনা বিক্রির টাকা পান নি অর্ধেক?

ও সব তুমি ফিরিয়ে নাও। অবিনাশবাবুর চোখ এর মধ্যেই রক্তাভ, যন্ত্রণায় উনি ছটফট করে উঠলেন: আমার কিছু চাই না! সব তোমার! আমায় যেতে দাও।

যাত্রা করছেন নাকি? থামুন! ন্যাকামি! - কণ্ঠস্বর এবার দাবড়ে উঠলো: শুধু আপনি নন, আপনার এই বন্ধু ও তার ভাগ্নেও ছাড়া পাবে না। সোনার ডিম দেওয়া হাঁস বলে, যেতে দাও। আবদার—।

দুজনের কথোপকথনের ফাঁকে হঠাৎ কথা বলে উঠলেন জগুমামা। কঠোর কঠিন কথা, শুনুন মিস্টার পাজোরিয়া না বাজোরিয়া, আমি কিন্তু মহান্তি নই। পাজি শয়তানের কাছে অমন দায়দাক্ষিণ্য কোনদিন চাইনি, চাইও না। আমরা যাবোই। চলো।

এক মিনিট। এক মিনিট। - কণ্ঠস্বর এবার খলখল করে হেসে উঠলো: --এই ঘরের পুবদিকে সমুদ্রের দিকে একবার তাকান। কী দেখছেন? সিন্ধুর বুকে বিন্দুর মতন কী একটা, তাই না? ওটা আমার জাহাজ! অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে তিন চারটে স্পীডবোটে চেপে আমার লোকজন পৌঁছে যাবে, আপনাদের সাদরে এখানে নিয়ে আসতে। তারা যে খালি হাতে যাবে না, বলা বাহুল্য। আর ততক্ষণ আপনাদের ওখানে আমার যে সশস্ত্র প্রহরীরা রয়েছে, তারাই সামাল দেবে। তাদের নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি।

সারা শরীর দিয়ে হিমস্রোত নেমে গেলো। কী করবো আমরা?

কিন্তু পরমুহূর্তেই ঠি-উ-স্—ঠিউস্! ঠি-উ-স্! সবিস্ময়ে দেখলাম মামার বাঁ হাতে চকিতে উঠে আসা রিভলবারটা অগ্নিবর্ষণ করছে। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে ঘরের আনাচে কানাচে, ঝাড়বাতির আড়ালে লুকোনো ক্যামেরার লেন্স, মাইক্রোফোন!

ডক্টর অবিনাশ মহান্তি শিউরে শিউরে উঠছেন।

মামা দ্রুত টান মারলেন ওঁর হাত ধরে, চলো, শীগ্‌গির ! টুকলু কুইক !

ছিটকে তিনজন বেরিয়ে এলাম বাইরে। কিন্তু ততক্ষণে সাইলেন্সার রিভলবারের সামান্য শব্দ এবং জিনিস ভাঙার শব্দও নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে বাজোরিয়ার লোকজনের কানে। কারণ দেখলাম, জেটির দুই সশস্ত্র রক্ষী ভুরু কুঁচকে এদিকেই এগিয়ে আসছে !

মুহূর্তে মামা আবার হ্যাঁচকা টান মারলেন মহান্তিকে, —চলো ঘরে ! ওখানে জানলা আছে ?

হ্যাঁ, ঐদিকে ! হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন মহান্তি।

আমরা তিনজনেই দৌড়ে গেলাম জানলার দিকে।

—ঝাঁপ দে টুকলু, শীগ্‌গির !

নিচে অথৈ অকূল জলরাশি ! অনেকটা নিচে। বালিগঞ্জ লেকে অবশ্য ডাইভ মেরেছি বেশ কয়েকবার। তবু সাগরে ঝাঁপ দেওয়া—

যা থাকে কপালে ! চোখ কান বুঁজে জানলা বেয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত টান করে শরীর ভাসিয়ে দিলাম হাওয়ায়। হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি !

পেছনে ও দুজনের গলা পেলাম, জগু, তুমি আগে দাও, আমি···আমি···

গোত্তা মেরে জলের নিচে অনেকটা ডুবে গেছি। ওহ্ বাবা, চোট লাগেনি। যাক্ এই তো বালি। আসলে দীঘার সমুদ্রের কূলের কাছে গভীরতা অনেকটা কম বলেই রক্ষে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই পাশে শব্দ হলো আবার— ঝ-প্পা-ং ! জলের মধ্য দিয়ে দেখলাম জগুমামা। মামাও দেখেছেন আমায়। ইশারায় বললেন, ডুব সাঁতার কেটে আস্তে আস্তে পাড়ের দিকে এগোতে।

কিন্তু অবিনাশবাবু কই ?

ভট্-ভট্-ভ···ট্ ! জলের মধ্যে আলোড়ন, স্পীডবোট আসছে এদিকেই। একটা নয়, একাধিক।

আমি মামাকে অনুসরণ করে এগোচ্ছি। শ্বাস নিতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে। উঃ আর পারছি না।

হঠাৎ—দ্রাম—দ্রাম ! রাইফেলের শব্দ ! চমকে দুজনেই সামান্য মাথা তুলে দেখলাম, গবেষণাগার আর জেটির চতুর্দিকে সশস্ত্র পুলিস। একাধিক জীপও রয়েছে।

পরক্ষণেই আমাদের বিস্ফারিত চোখের সামনে ঘটতে থাকলো অবিকল সিনেমায় দেখা লড়াইয়ের দৃশ্য। পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করেছে। ওরাও জবাব দিচ্ছে।

তবে পুলিশের লোক ও অস্ত্রবল অনেক বেশী। ক্রমেই পুলিশ বাহিনী এগিয়ে যেতে থাকে জেটি বেয়ে। বাজোরিয়ার লোক পিছু হটছে !

অকস্মাৎ বু—উ মু—ম্ ! প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ! স্পীডবোটগুলো আগেই দৌড় দিয়েছে পিছন ফিরে। থরথর করে কেঁপে উঠলাম। নিমেষে খড়কুটোর মতো উড়ে গেলো কুঠিবাড়ি, জেটি, উপরের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়লো, শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া আগুন জ্বলছে এখানে ওখানে।

অস্ফুটে মামা বললেন, শয়তানটা প্রচুর টাইম বোমা সাজিয়ে রেখেছিল বাড়িটার সর্বত্র। রিমোট কণ্ট্রোল চালিয়ে সব ধ্বংস করে দিল।

হ্যাঁ, যাতে কোনও প্রমাণ না থাকে। —আমার গলা বুঁজে এলো : কিন্তু - কিন্তু—অবিনাশবাবু ? তোমার বন্ধু ?

মামা ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়লেন। মনে হলো, ওঁর চোখের কোনার জলটুকু সাগরের নয়, সত্যি। কেননা চোখটা একবার মুছে নিলেন মামা, —অবিনাশের মতো মেরুদণ্ডহীন বিজ্ঞানীর মরাই উচিত।

আচ্ছা এও তো হতে পারে, আমি মামাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম : অবিনাশবাবু হয়তো অন্যদিকের জানলা দিয়ে ইচ্ছে করেই ঝাঁপ দিয়েছেন। স্পীডবোট তুলে নিয়ে গেছে। হয়তো সবটাই ওনার অভিনয়।

কী জানি—মামা নিজেকে সামলে নিলেন : চল্ টুকলু, ঐ দ্যাখ্, ওরা সব দাঁড়িয়ে আছেন।

তাকিয়ে দেখলাম তীর থেকে ও.সি. ও তাঁর দলবল আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন।

এ ঘটনা ঘটেছে এবছরই মার্চে। এটা আগস্ট মাস। এখনও অবধি জগুমামা 'সি বি আই', 'র', ইত্যাদি কোন গোয়েন্দা দপ্তরকে দিয়েই কে.কে. বাজোরিয়ার ঠিকানা ঠিকুজি বের করতে পারেন নি। সন্ধান মেলেনি নিখোঁজ ডক্টর অবিনাশ মহান্তিরও।

কিশোর বন্ধুদের সবাইকেও কথাটা বলা রইলো। খুব ভালো হয়, যদি বাজোরিয়াকে ধরা যেতো···

কিংবদন্তী ধন্বন্তরি

দীপক ভট্টাচার্য্য

বলতেই বলে 'ডাক্তার তো নয়, একেবারে ধন্বন্তরি।' এটা সাধারণভাবে বেশ চালু কথা। কিন্তু এই কথার প্রধান চরিত্র ধন্বন্তরিটি কে? কেনই বা ভালো ডাক্তারের প্রশংসা করতে গেলে ধন্বন্তরির নাম উচ্চারিত হয়। কিংবদন্তীর এই নায়ক সম্বন্ধে কৌতূহল বোধ করায় কিছু খোঁজ খবর করার চেষ্টা করেছিলাম। সেই অনুসন্ধানের ফলে যা বুঝতে পেরেছি, তা সবাইকে জানানোর লোভ সামলাতে পারছি না।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, যাকে আমরা এ্যালোপ্যাথি বলি, অন্যান্য বিজ্ঞান শাখার মত তার জন্মস্থলও গ্রীস দেশকেই ধরা হয়। গ্রীক পণ্ডিত হিপোক্রিতাসকে (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০) এই শাস্ত্রের জনক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। গ্রীসে এসক্লেপিয়াস ছিলেন চিকিৎসা বিদ্যার দেবতা। হিপোক্রিতাসকে গ্রীসের মানুষ এসক্লেপিয়াস-এর অবতার বলে মনে করতো। পরমাণু ধারণার প্রবক্তা ডিমোক্রিতাস-এর কাছে নাকি তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। তা কিছু অসম্ভব নয়। কারণ ডিমোক্রিতাস-এর চিকিৎসা পদ্ধতি ও চিন্তায় বস্তুকণাবাদী যুক্তি ভাবনার জোরালো প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমন নয় যে হিপোক্রিতাসই গ্রীসের প্রথম চিকিৎসক। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রে যুক্তি সিদ্ধ পদ্ধতির প্রবর্তক বলেই তাঁকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পিতার সম্মান দেওয়া হয়। গ্রীসের ছোট দ্বীপ 'কস'-এর এক যাদুকর ওঝা পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন। অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্বত্র ঐ যাদুকর ওঝারাই চিকিৎসার কাজ করতো। যাদু বিদ্যাই পরে পরমাণু চিন্তার আলোকে ও যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার জন্ম দিয়েছে। হিপোক্রিতাস অল্প বয়সে মিশরে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার চিকিৎসা প্রণালী আয়ত্ত করেছিলেন বলে জানা যায়। বর্তমানে গ্রীক এসক্লেপিয়াস ও মিশরীয় পণ্ডিত ইমোটেপ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০০)-কে অভিন্ন চরিত্র বলে মনে করা হয়।

একই ভাবে ভারতের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এ দেশেও চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন অনেক কাল আগের থেকে শুরু হয়েছে। প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা শাস্ত্রের নাম ছিল আয়ুর্বেদ। পণ্ডিতদের মতে মূলতঃ অথর্ব বেদের বস্তুবাদী যাদুধর্মী অংশ থেকেই এর উৎপত্তি। আর এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সাথেই ধন্বন্তরির নাম ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। কারো কারো মতে ধন্বন্তরিই আয়ু-

বেদ শাস্ত্রের স্রষ্টা। সে যাই হোক না কেন, ইতিহাসে কিন্তু ধন্বন্তরি চরিত্রটির সঠিক হদিশ পাওয়া ভার। বেদে দেবতাদের চিকিৎসক যমজভাই অশ্বিনীকুমার ও মানুষ কাশীরাজ দিবোদাসের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন ভাবে ধন্বন্তরি বলে কোন নাম বা শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন পুরাণ ও আয়ুর্বেদের বই থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক ধন্বন্তরি নামে পরিচিত ছিলেন। এদের মধ্যে যিনি প্রথম, তিনি আদি ধন্বন্তরি বা ভগবান ধন্বন্তরি নামে পরিচিত ছিলেন। ভগবান ধন্বন্তরি বিষ্ণুর অবতার। তিনি দেবতা ও অসুরদের সম্মিলিত সমুদ্রমন্থনের সময় অমৃত কলস হাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই অমৃত খেয়ে দেবতারা অমর হয়ে যায়। শ্রীমদ ভাগবত পুরাণ অনুসারে ইনিই আসল ধন্বন্তরি –যার থেকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের জন্ম। পৃথিবীর মানুষকে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত করে সুস্থ দীর্ঘ জীবন দান করার উদ্দেশ্যে আয়ুর্বেদের সৃষ্টি। 'হরিবংশ' গ্রন্থে ভগবান ধন্বন্তরির অন্য আরেক নাম 'অব্জ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অবশ্য অন্য কথা বলে। ভগবান ব্রহ্মা এক সময় চারটি বেদ ভালো করে পড়ে দেখছিলেন। সেই সময় তিনি দেখলেন, ঐ সকল বেদের কিছু কিছু অংশ মূল ভাবের সাথে বেমানান। বেমানান অংশগুলিকে ব্রহ্মা বাছাই করে একত্র করলেন। সেই একত্রিত জ্ঞানের অংশই আয়ুর্বেদ। ব্রহ্মা এই জ্ঞান সূর্যকে দিলেন। সূর্য এরপর সেই জ্ঞানকে তার ষোল জন শিষ্যের মধ্যে দান করেন। ঐ শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ধন্বন্তরি। তাই আয়ুর্বেদকে পঞ্চম-বেদ বলে স্বীকার করা হয়। এই ভাবে দেখা যায়, আদি ধন্বন্তরিকে বাদ দিলেও কম করে আরো অন্ততঃ তিনজন ধন্বন্তরির খোঁজ পাওয়া যায়। এরা হলেন –১। সূর্য-শিষ্য শ্রীধন্বন্তরি॥ ২। কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি ও ৩)। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার সদস্য শ্রীধন্বন্তরি।

সুশ্রুতসংহিতা, চরকসংহিতা, অগ্নিবেশসংহিতা, বিষ্ণুপুরান ও হরিবংশ ইত্যাদি পুস্তকের তথ্য মিলিয়ে কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি যে প্রাচীন ভারতের এক ঐতিহাসিক চরিত্র তা বেশ বোঝা যায়। আচার্য সুশ্রুত-এর কথা অনুযায়ী, তিনি কাশীরাজ দিবোদাসের কাছে আয়ুর্বেদ (বিশেষ করে শল্য চিকিৎসা) শিক্ষা করেছিলেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য দিবোদাসকে ধন্বন্তরি উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে ভগবান ধন্বন্তরির অবতার বলে মনে করা হত। বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ-এর খবর অনুসারে দিবোদাস চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা-র বংশে জন্মেছিলেন। সেই বংশের কাশীরাজ নামে এক ব্যক্তির তিনি নাতির নাতি। দিবোদাসের পিতামহের নামও ধন্বন্তরি। 'হরিবংশ' থেকে জানা যায়, দিবোদাসের পূর্বপুরুষ 'ধন্ব' পুত্রলাভের আশায় যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি ধন্বন্তরি অব্জকে নিজপুত্র-রূপে পাওয়ার প্রার্থনা করেন। এরপর পুত্র হলে তার নাম ধন্বন্তরি রাখা হয়। এই ধন্বন্তরি বড় হলে ভরদ্বাজ-এর কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। পরে তিনিই আয়ুর্বেদকে আটটি বিশেষ ভাগে ভাগ (অষ্টাঙ্গ) করেন। ১ কায়া বা শরীর চিকিৎসা; ২) বাল বা শিশু চিকিৎসা; ৩) গ্রহ বা মানসিক চিকিৎসা; ৪) চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ও গলদেশ চিকিৎসা (শালাক্যতন্ত্র); ৫) অস্ত্রচিকিৎসা, (শল্যতন্ত্র); ৬) বিষ চিকিৎসা (বিষতন্ত্র); ৭ ভেষজ চিকিৎসা (রসায়নতন্ত্র) ও ৮) শক্তি ও বীর্য বর্ধন চিকিৎসা (বাজীকরণতন্ত্র)। এই ধন্বন্তরিই সুশ্রুতের গুরু কাশীরাজ দিবোদাসের পিতামহ বা দাদু।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে ধন্বন্তরি রূপে কাশীরাজ দিবোদাসের কথাই বেশী গুরুত্ব পায়। সুশ্রুতসংহিতায় দিবোদাসের চিন্তা চেতনার সংহতরূপ প্রকাশ পেয়েছে। এরপর থেকে দিবোদাস প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসন্ধানকারী চিকিৎসকদের ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের বৈদ্য নামে চিহ্নিত করা হয়। আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দিবোদাস ধন্বন্তরি ও পুনর্বসু আত্রেয় আয়ুর্বেদ চর্চা করেছেন। দিবোদাস ভেষজ ও সাধারণ চিকিৎসার আওতা থেকে অস্ত্রচিকিৎসা ও চোখ-কান-নাক ও গলার চিকিৎসাকে আলাদা করেন এবং একত্রে তাদের নাম দেন শল্যশালাক্যতন্ত্র। বিশেষভাবে আলাদা বিষয়টিতে দক্ষতা সম্পন্ন অস্ত্রচিকিৎসকরাই ধন্বন্তরির বিদ্যার বৈদ্য হিসাবে গন্য হতেন। অপরদিকে প্রথাগত চিকিৎসার অন্যান্য শাখাগুলি আত্রেয়র তত্ত্বাবধানে উন্নত হতে থাকে। এই বিষয়গুলির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আত্রেয় গোষ্ঠীর বৈদ্য বলে ধরা হোত। আজকালকার দিনের মত সে যুগেও আত্রেয় গোষ্ঠীর বিশেষজ্ঞ বৈদ্যরা অস্ত্রোপোচার ছাড়া কোনভাবেই রোগ নিরাময় সম্ভব নয় বুঝলে, তবেই ধন্বন্তরি গোষ্ঠীর বৈদ্যদের কাছে রোগী পাঠাতেন।

দিবোদাস শল্য চিকিৎসায় শরীরের অস্থি-স্থান বা অ্যানাটমি শিক্ষার উপযুক্ত অনুশীলনের উপর জোর

দিতেন। বেশী বয়স হয় নি এবং বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়নি এমন মৃতদেহ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অস্থি-কঙ্কাল প্রস্তুত করে তা থেকে তিনি অস্থিতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভের নির্দেশ দিয়েছেন। পড়াশুনা করা এবং তা যতখানি সম্ভব হাতে-কলমে মিলিয়ে নেওয়া এ ছিল তাঁর শিক্ষার পদ্ধতি। অপারেশন করায় হাত পাকানোর জন্য লাউ, কুমড়া, তরমুজ ইত্যাদি ফলের উপর প্রথম প্রথম অনুশীলন করার নির্দেশ ছিল। ইনজেকশন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার প্রারম্ভিক ক্ষেত্র ছিল মৃতপশুর দেহ, তার শিরা উপশিরা এবং পদ্মফুলের ডাঁটি। হরেক-রকম কাঁটাছেঁড়া করার যন্ত্রপাতিও দিবোদাস প্রস্তুত করেছিলেন। সুশ্রুতসংহিতা ছাড়াও জার্মান পণ্ডিত জার্গন থরওয়াল্ডের "সায়েন্স এ্যান্ড সিক্রেটস্ অব আর্লি মেডিসিন ইজিপ্ট, মেসোপোটমিয়া, ইণ্ডিয়া, চায়না, মেক্সিকো এ্যান্ড পেরু" (১৯৬২ গ্রন্থে এ সকলের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। থরওয়াল্ড দিবোদাস ধন্বন্তরির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

দিবোদাস শল্যচিকিৎসায় বিশেষ দুইটি বিষয়—১) অস্ত্রোপচার দ্বারা পাতলা চামড়া কেটে বসিয়ে নূতন করে গজানোর মাধ্যমে (কাটা নাকের) ক্ষত নিরাময় করা এবং ২) মূত্রথলিতে উৎপন্ন পাথর অস্ত্র চিকিৎসায় অপসারণ করা—সফলতার সাথে প্রথম চালু করেন। ঐ প্রাচীনকালে কিভাবে এই চিকিৎসা সম্ভব ছিল—ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ ছাড়া দিবোদাসই প্রাচীন ভারতে প্রথম মানুষের শরীরে রক্ত সৃষ্টিতে যকৃত (লিভার) ও প্লিহা (স্প্লিন)-র ভূমিকা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করতে পারেন। সময়ের দিক থেকে বিচার করলে এ ব্যাপারে তিনি বোধহয় সারা বিশ্বেই পথিকৃৎ-এর কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। ব্যবহারিক চিকিৎসায় রক্তাল্পতা রোগে তিনি তাই পাঁঠার মেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রাতকানা রোগে-ও ঔষধ তৈরীতে তিনি পাঁঠার মেটে ব্যবহার করার কথা বলেছেন।

সে যুগের তুলনায় দিবোদাস নিঃসন্দেহে তাঁর চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। পূর্ব আহৃত জ্ঞান (আপ্তোপদেশ) ছাড়াও তিনি 'প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষন, অনুমান ও উপমান' অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণ চিন্তার দ্বারা প্রমাণের মাধ্যমে জ্ঞানকে সংগঠিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে আবার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার (পৃথককরণ) কথাও বলেছেন। দর্শণের ক্ষেত্রে দিবোদাস সাংখ্য দর্শনকে আদর্শ মনে করতেন। বিশ্লেষণী কাজের জন্য পরমানুবাদী ন্যায় দর্শনকে মান্য করতেন। ভেষজ-গুণের প্রশ্নে তিনি 'বস্তু' বা 'দ্রব্য'কেই বেশী গুরুত্ব দিতেন। কারণ তাঁর ধারণায়, বস্তুর-গুণ বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু হতে পারে না, বরং পরস্পর কার্য-কারণ সম্পর্কে সংযুক্ত। বস্তুর গঠন কাঠামো অর্থাৎ অনু-পরমাণুর সংখ্যা, প্রকৃতি ও তাদের অবস্থান সমস্ত মিলিয়েই বস্তু বা দ্রব্যের 'গুণ ও কর্ম''। দিবোদাসের এই যুক্তি—চিন্তা আধুনিক আনবিক জীববিদ্যা বা মলিকুলার বায়োলজি-র যথেষ্ট কাছাকাছি। দিবোদাসের পরে সুশ্রুত ও তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে দিবোদাস ধন্বন্তরির চিকিৎসা-প্রণালী আরো প্রতিষ্ঠা পায়।

কালক্রমে বর্ণভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, বাস্তব জগৎকে উপেক্ষা করে ভগবানের চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করার মত অবৈজ্ঞানিক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ সংকীর্ণ বন্ধ জলায় পরিণত হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেরও তখন থেকে অধঃপতন শুরু হয়। ভারতে ইংরাজ শাসনের হাত ধরে ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞান এ্যালোপ্যাথি এদেশে ঢুকে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ মদতে এ্যালোপ্যাথির দ্রুত আধিপত্য বিস্তার চলচ্ছক্তিহীন আয়ুর্বেদের মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। এত কথা বলার পরও যে-কথা বলার থাকে, তাহল—প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় (বিশেষ করে শল্য চিকিৎসায়) যারা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তাঁদের সবাইকেই সাম্মানিক ধন্বন্তরি উপাধিতে ভূষিত করার চল ছিল। কথাবার্তার সময়ও তাঁদের ধন্বন্তরির বরপুত্র বা অবতার বলে উল্লেখ করার রেওয়াজ চালু হয়েছিল। তাই ধন্বন্তরি কেবলমাত্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের জনক হয়েই থাকেন নি। ভারতবর্ষের চিকিৎসা শাস্ত্রের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় পরিণত হয়েছেন। ফলে ভালো ডাক্তারের প্রসঙ্গে আজো ধন্বন্তরির নাম সমান মর্যাদার সাথে উচ্চারিত হয়।

বঙ্কু গদাইয়ের পলিউশন চিন্তা

অরুনাভ মিশ্র

পলিউশনের বিপদ দেখি যাচ্ছে ক্রমে বেড়ে
ক'দিন ধরেই বঙ্কু গদাই মনমরা এর জেরে
এইতো আজই চিরতা-জল ধরিয়ে দুগ্গাস মা
বলে দিলেন, 'না খাও যদি, ব্রেকফাস্টও না।'
কে বোঝাবে মাকে ওটা 'পিওর জলদূষণ!'
ঘট্ ঘট্ ঘট্ খেতেই হল বেঁকিয়ে মুখ ও মন।

পড়ার ঘরে মেজকাকার ঘড়াৎ ঘড়াৎ নাক
থেকে থেকে জেগে উঠে, 'কি করছিস' হাঁক,
দাদুর চটির চটাস চটাস্, রান্নাঘরের চোঁ,
বৌদি দাদার হি হি হো হো থামবার নেই জো।
শব্দ দূষণ সকাল সন্ধ্যে অষ্টপ্রহর ধরে
বঙ্কুসোনা গদাইসোনার মন টন্ টন্ করে।

টিভি ঘরে ঢুকলে পরে কানটি ধরে দাদা
কেবল বলেন,—'সামনে যে তোর পরীক্ষারে হাঁদা!'
আইসক্রীমের ডাকটি শুনে ভাসলেও জিভ জলে
এই যে এমন বসে থাকা অঙ্ক খাতা মেলে,
রান্নাঘরের পাশ বন্ধ, বন্ধ টি টি খেলা
পরিবেশের দূষণ এতো নয়কো হেলাফেলা!

চিলেকোঠার ঘরে হচ্ছে বিজ্ঞান ক্লাব তাই,
লড়াই করে রুখবে দূষণ বঙ্কু ও গদাই॥

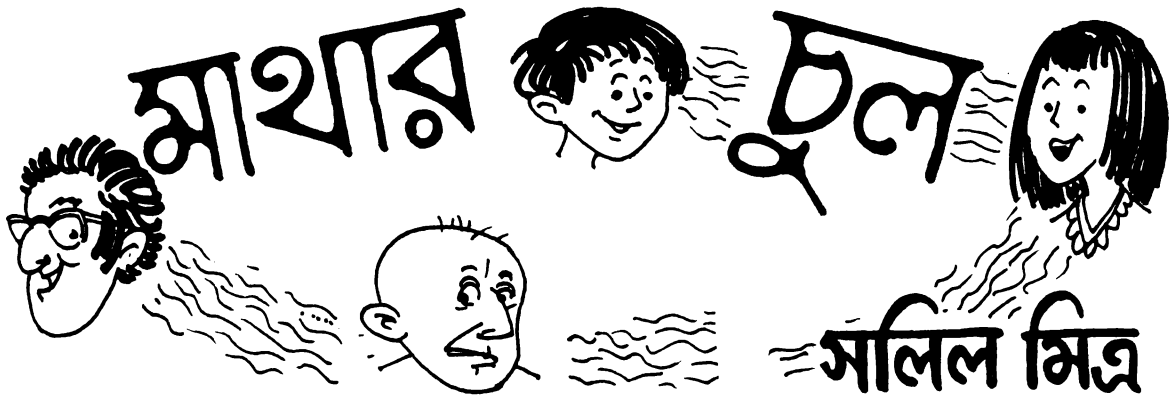

লালটুর চুল ছাঁটা নিয়ে কী ঝামেলা! কিছুতেই চুল ছাঁটতে চাইবে না—তা সে যত বড়ই হোক। মা রাগ করবে—তবুও! সেদিন কাটোয়া থেকে ছোট মামা এসেই লালটুর চুলের দিকে নজর দিল,—কি রে লালটু, মাথাতে হেভি গ্রো-মোর দিয়েছিস নাকি? চুলগুলো ছেঁটে নিতে পারিস নি?

লালটু বললে,—আমার চুল রাখা তোমরা কেউই পছন্দ করো না দেখছি। বেশ ছেঁটে ফেলবো চুল।

ছোট মামা হেসে বললে,—একটু তামাশা করলাম রে, কিছু মনে করিস না। তা দেখ্—চুল মাথায় থাকলেও দামী, ছেঁটে ফেললেও দামী। —দাম তার কমলো না!

ছোট মামার কথায় লালটু অবাক! —কি বলছো গো ছোট মামা? ছেঁটে ফেলে দিলেও চুলের দাম রইল?

—তা রইল বৈকী। তুই জানিস না, এতোদিন আমাদের দেশ থেকে মামার ছাঁটা চুল জাপানীদের দেশে চলে যেত?

অবাক হয়ে লালটু বললে,—সত্যিই আমি কিছু জানিনা মামা! তুমি ব্যাপারটা একটু খুলেই বলোনা।

ছোট মামা বললে,—চুল নিয়ে যখন কথা উঠল, তখন শুনেই রাখ্—জাপানে চুল থেকে এ্যামিনো এ্যাসিড তৈরি করা হয়; সেই এ্যাসিড নিয়ে ওরা সারা পৃথিবীতে বাণিজ্য করে।

—এ্যামিনো এ্যাসিড? মাথার চুল থেকে? —লালটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ,—ছোট মামা বললে,—ঐ এ্যামিনো এ্যাসিড আবার ওষুধপত্রে, নানারকম শিল্প কাজে ব্যবহার করা হয়। পাকা ফলকে তাজা আর সুস্বাদু রাখার কাজও হয় ঐ এ্যাসিডের সাহায্যে। সেণ্ট সাবান এই সব প্রসাধনের জিনিসেও ব্যবহার হয় এ্যামিনো এ্যাসিড।

সত্যিই অবাক ব্যাপার।

লালটু বললে—তারপর?

—তারপর আর কি,—ছোট মামা জের টানলো,—তুই তো জানিস। খাদ্যের প্রোটিন ছাড়া আমাদের দেহের পুষ্টি হয় না। ঐ প্রোটিনের একটা বিশেষ উপাদানই আছে মাথার চুলে যা থেকে এ্যামিনো এ্যাসিড হচ্ছে। অবশ্য এ-ধরণের প্রোটিন আগে তিমি মাছের শরীর থেকে আসতো।

—তুমি কি বলছো গো ছোট মামা, এ্যাতো সব ব্যাপার?

—হ্যাঁ—ছোট মামা বললে,—এখন আবার আইন করে তিমি মাছ মারা বন্ধ।

লালটু বললে,—ভালোই হয়েছে! মিছিমিছি প্রাণী মেরে আমরা প্রকৃতির ক্ষতি করবো কেন?

—তা সেই তিমি মাছের বদলে এখন বিজ্ঞানীরা মাথার চুলের প্রোটিন কাজে লাগাচ্ছেন। এবার ভারতের পণ্ডিচেরীতেও তৈরী হবে চুল থেকে এ্যামিনো এ্যাসিড তৈরীর গবেষণাগার আর কারখানা। এ-কাজে অবশ্য জাপানের বিজ্ঞানীরা সাহায্য করবেন।

—তাহলে তো ওখানে অনেক চুল চাই মামা।

…তা কাজ চালাতে বছরে অন্তত ১২০০ টনের মত চুলতো দরকার হবেই। —বলে, ছোটমামা একটু হেসে বললে,—তবে তোদের মত ছেলেদের ন্যাড়া হয়ে চুল পাঠাতে হবে না। সারা বছরে মানুষের যা চুল ছাঁটা হয়, তাতেই কাজ চলে যাবে।

—তবে চুল ফেলে দিয়ে নষ্ট করলে হবে না।

লালটুর কথার জবাবে ছোটমামা বললে—ঠিকই বলেছিস্ রে লালটু, নষ্ট করা চলবে না। চুলতো নয়ই এবং অন্য কোনো জিনিসও।

মাইকেল গ্রিজমেক

• ভবানীশঙ্কর জোয়ারদার •

বর্তমান স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্র তানজানিয়া একসময় ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে ছিল এবং তখন তার নাম ছিল টাঙ্গানিইকা। মূল ভূখণ্ডের ভিতরে প্রায় বার হাজার বর্গকিলোমিটার জায়গা নিয়ে একটি জাতীয় উদ্যান ছিল। যা পরে সেরেংগেটি ন্যাশন্যাল পার্ক নামে পরিচিত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে তখনকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন, পার্কের এলাকা সংকুচিত করা দরকার, কারণ বসবাসকারী প্রাণীকুলের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

এলাকা সংকোচনের সংবাদটি রাশিয়ান অধ্যাপক বার্ণহার্ড গ্রিজমেক ও তার পুত্র মাইকেলের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। অধ্যাপক গ্রিজমেক তাঁর সারা জীবনটাই প্রাণীদের জন্য ব্যয় করেছেন। তরুণ প্রাণীবিদ মাইকেলও পিতার মত জন্তু-জানোয়ার ভালবাসেন এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য তিনিও একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে চলেছেন। পিতা ও পুত্র উভয়েই মনে করলেন, সরকারী সিদ্ধান্তটি সঠিক নয়। কিন্তু কিভাবে তা প্রমাণ করা যাবে?

অধ্যাপক গ্রিজমেক এর আগে বেশ কয়েকবার আফ্রিকা ঘুরে গেছেন, সেরেংগেটিও দেখেছেন। তিনি জানতেন, এ্যান্টিলোপ জেব্রা ও জিরাফের জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রয়োজন। কিন্তু তার কারণই বা কি? কি জন্যে তারা এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায়? কতদূর যায় এবং যদি এলাকা ছোট করে দেওয়া হয় তাহলে কি জন্তুরা সীমানা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়বে?

মাটি ও ঘাসের নমুনা সংগ্রহ একটি প্রচলিত পদ্ধতি। এতে বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারেন যে, প্রাণীদের চলাফেরা অবিন্যস্ত নয়, বিভিন্ন ঋতুতে নানান অঞ্চলে তারা খাবার সংগ্রহ করে। এইসব এলাকার অনেকগুলির অবস্থান প্রস্তাবিত সীমানার বাইরে। এর অর্থ হল, অভয়ারণ্যের এলাকা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারদের একটি বড় অংশ নিরাপত্তাহীন হবে এবং চোরা শিকারীদের শিকারে পরিণত হবে। তাই তারা ঠিক করলেন, সেরেংগেটি অঞ্চলের প্রাণীদের গণনা করবেন এবং সংগৃহীত তথ্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে জানাবেন যাতে তারা সিদ্ধান্তটির পুনর্বিবেচনা করেন।

এই বিশাল দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু টাঙ্গানিইকার ব্রিটিশ প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছেন, সিংহ জেব্রা জিরাফ ও নু (gnus) গণনার জন্য তাদের আর্থিক সংস্থান নেই। আবার গ্রিজমেক পরিবারের অবস্থাও এমন নয় যে তারা নিজেরাই এর দায়িত্ব

নিতে পারবেন। কিন্তু যে কোন ধরনের দীর্ঘসূত্রতা বিপর্যয় ডেকে আনবে, কেননা অভয়ারণ্য ছোট করার সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়ে গেছে।

এমন সময় একটি সুখবর এল। মাইকেল নিজ ব্যয়ে ও নিজের উদ্যোগে প্রাণীজীবনের ওপর যে ছবি তুলে ছিলেন, যার জন্য তার অনেক ধার হয়ে গিয়েছিল এবং ছবিটিতে জন্তু-জানোয়ারদের শান্ত প্রকৃতি সম্পন্ন দেখানো হয়েছিল বলে জারমান সিনেমা মালিকরা তাদের হলে দেখাতে রাজী হননি, সেই ছবি এক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের

পরিবেশকরা ছবিটার প্রদর্শন শুরু করে দিলেন। মাইকেল পরিবারে যথেষ্ট অর্থের সমাগম হল। পিতাপুত্র ঠিক করলেন, এই অর্থ তারা প্রাণী সংরক্ষণের কাজে ব্যয় করবেন।

এইজন্য তারা একটি প্লেন কিনলেন, এর চালনার প্রশিক্ষণ নিলেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে নিয়মিত ভাবে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে কষ্টকর আকাশ যাত্রা করতে লাগলেন।

গণনা করার আগে এরকম একটা ধারণা ছিল যে প্রায় দশ লক্ষ বিভিন্ন প্রাণী সেরেংগেটিতে বাস করে। পিতাপুত্র বিমান থেকে গণনার কাজ শুরু করলেন। যেহেতু প্রাণীরা এক জায়গায় থাকে না ফলে বারে বারে প্লেন ঘোরাতে হচ্ছিল। এতে একটা অনিবার্য অসুবিধা হচ্ছিল – প্লেনের ইঞ্জিনের অস্বাভাবিক গর্জন। এসব সত্ত্বেও তারা কাজ করে যেতে লাগলেন। কাজ যত এগোতে লাগল ততই ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, সেরেংগেটিতে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী যে পরিমাণ সংখ্যার উল্লেখ করা হয় তার থেকে অনেক কম প্রাণী রয়েছে। তারা মোটামুটি ভাবে সিদ্ধান্তে এলেন, বর্তমান সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের মত – যা অনুমান করা সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। ইংগিত পরিষ্কার—অরণ্যের সীমানা কোন কারণেই সংকুচিত করা উচিত হবে না। বর্তমান অবস্থায় চোরা শিকারীরা যদি সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে এলাকা কমিয়ে দিলে তা আরও গুরুতর হবে।

আরও একটি প্রমাণ দরকার। সত্যিই প্রাণীরা বিচরণ কালে সংরক্ষিত অরণ্যের সীমানা অতিক্রম করে কিনা। এবার তারা একটি গাড়ী নিলেন ও তাদের কাজ হল জানোয়ার ধরা এবং কোন ভাবে তাকে চিহ্নিত করা। মাইকেল একটি বিশেষ বন্দুক তৈরী করিয়ে ছিলেন যাতে ব্যবহার করা হত মাদক মেশানো বুলেট। এই বুলেট জন্তুর কোন ক্ষতি না করে তাকে নিদ্রাচ্ছন্ন করে রাখত।

নিদ্রালুতা কেটে গেলেই জানোয়ারটি দাঁড়িয়ে উঠে সোজা হাঁটত, টের পেত না যে ইতিমধ্যে তার গলায় একটা হাল্কা অথচ শক্ত উজ্জ্বল রঙের বালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে জন্তুদের চিহ্নিত করে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন মাইকেলরা।

নু বা গ্যাজেলকে ঘুমপাড়ানি বন্দুক দিয়ে সহজেই ভূপাতিত করা যেত। কিন্তু সজাগ জেব্রা গুলি করার দূরত্বের মধ্যে কেও এগোলেই তৎক্ষণাৎ সরে যেত। তাই জীপ ছুটিয়ে তার লেজ ধরে তাকে আটকাতে হত—যেটা অত্যন্ত বিপদজনক। জেব্রার লেজের লোম ধারালো ব্লেডের মত। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল, শত শত জেব্রা রঙীন বালা পরে বিচরণ করছে। ফলে এয়ারপ্লেন থেকে লক্ষ্য করতে অসুবিধে হত না। ইতিমধ্যে মাইকেল মাটি ও ঘাস পরীক্ষার কাজ সমাপ্ত করলেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল—মূল্যবান প্রাণীদের যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে কোন অবস্থাতেই পার্কের আকার কমানো উচিত হবে না। অধ্যাপক গ্রিমেক ও মাইকেলের তথ্য সমৃদ্ধ প্রমাণের ফলে ব্রিটিশ প্রশাসন পূর্ব ঘোষণাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন।

পরের ঘটনা হল, ব্রিটিশরা টাঙ্গানিইকা ছেড়ে চলে গেছে। তানজানিয়ার নবীন সরকার সেরেংগেটি ও তার অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দর্শকগণ সেরেংগেটির মহানুভব সিংহ, বিস্ময়কর জিরাফ ও ডোরাকাটা ঘোড়াদের দেখে হর্ষচিত্তে গৃহে ফেরেন। কিন্তু সবচেয়ে যা বেদনাময় তা হল, অভয়ারণ্যের প্রাণীদের রক্ষার জন্য যিনি এত করলেন সেই মাইকেল কিন্তু পৃথিবী থেকে শিঘ্রী বিদায় নিলেন। ডিসেম্বরের এক মেঘাচ্ছন্ন সকালে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন ও বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে এবং মাইকেল মৃত্যুবরণ করেন।

সেরেংগেটির একেবারে কেন্দ্রস্থলে যেখানে তাকে সমাধিস্থ করা হয় তা সবুজ আস্তরণে আবৃত রয়েছে। সামনেই স্মৃতিস্তম্ভ যা সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাতে উৎকীর্ণ করা আছে :

মাইকেল গ্রিমেক
১২ই এপ্রিল, ১৯৩৪—১০ জানুয়ারী, ১৯৫৯
যিনি আফ্রিকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য তার যা কিছু ছিল সব দিয়েছেন, এমন কি তার জীবন পর্যন্ত।

পাখীর বিচিত্র বাসা

সুদীপ্ত বসু

পক্ষীতত্ত্ববিদরা বলেছেন, বহুযুগ আগে পাখীরা বনে জঙ্গলে, যেখানে সেখানে ডিম পাড়তো। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের ফলে শাবকদের নিরাপদস্থানে রাখার জন্য বাসার প্রয়োজন হলো। বিশেষ করে সাগর তীরে পাখীদের শাবকের প্রতি অত্যাচারের জন্য ঐ স্থানের পাখীরা প্রথম বাসা তৈরির প্রয়োজন অনুভব করেছিলো। বাসা বাধার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন জায়গা। বাসা তৈরির ব্যাপারে পুরুষ পাখীরাই ছিলো প্রধান। তবে যে সমস্ত পক্ষীকুলে স্ত্রী পাখীরাই প্রধান সেইসব পক্ষীকুলে স্ত্রী পাখীরাই বাসা তৈরি করতো। আবার যৌথভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বাসা তৈরি করতে দেখা যায় পায়রা, চড়ুই ইত্যাদি পক্ষীর ক্ষেত্রে। পুরুষ বাবুই পাখী একার চেষ্টায় একাধিক বাসা তৈরি করে আর প্রতি বাসায় একজন করে স্ত্রী বাবুইকে প্রতিপালন করে। পাখীর বাসার কথায় এলে সবার আগে বাবুই পাখীর কথা এসে পড়ে। বাসা তৈরিতে বাবুই পাখীর জুড়ি নাই। বাবুই সাধারণতঃ তাল, নারকোল ইত্যাদি গাছের পাতায় বাসা তৈরি করে। বাসার ভিতরে ঢোকার জায়গা তলার দিকে রাখে বলে জল পড়লে বাসার ভিতরে ঢুকতে পারে না। বাবুই পাখী খুব বুদ্ধিমান পাখী। এরা রাত্রে বাসায় আলো জ্বালানোর জন্য কিছু কাদা নিয়ে এসে ঘরে এক কোণে রাখে এবং জোনাকি ধরে মাথাটা কাদার মধ্যে গুঁজে দেয়। ফলে জোনাকির পিছন দিকের আলো ভালো ভাবে বাসার মধ্যে দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার বাওয়ার পাখীরা তাদের বাসা সাজায় লতাপাতার সঙ্গে ঝিনুক, শামুক, ভাঙাকাচ, পাথর জড়ো করে। লোকালয় থেকে সিগারেটের বাক্স, রঙিন কাগজ, কাপড়ের টুকরোও নিয়ে বাসার ভিতরে সাজিয়ে রাখে। বাসা সাজাবার ব্যাপারে তাদের বেশ নজর।

ওরিয়াল নামে এক জাতের পাখী ঝর্ণার প্রবাহমান জলের ধারে পাথরের খাঁজে শুকনো ঘাস, খড় দিয়ে বাসা তৈরি করে। এই পাখীরা বাসার উপরে শ্যাওলা প্রলেপ দিয়ে দেয়। তার ফলে শীত তাপ নিয়ন্ত্রণ বা Aircondition হয়। ওরিয়াল আমাদের দেশে বেনে বৌ নামে পরিচিত। এরাও বেশ সুন্দর বাসা তৈরি করে। বাসাটা গাছের দু ডালে একটা দোলনার মত হয়।

এই পাখী খুব নিরীহ। আগাছা দিয়ে জলের উপর বাসা তৈরি করে। অনেকটা নৌকার মতো হয়। তার ফলে জল ঢোকে না।

ধনেশ পাখীদের পুরুষরাই বাসা তৈরি করে। বড় গাছের কাঠের মধ্যে তুলা, ঘাস, খড় বিছিয়ে দেয় আরামের জন্য। এর পর স্ত্রী ধনেশ পাখী যখন বাসায় ঢুকে ডিম পাড়ে, তখন পুরুষ পাখীটি বাসার চারি দিকে কাদা দিয়ে বন্ধ করে দেয়। শুধুমাত্র ঠোঁট বার করার মতো ফাঁক রাখা হয়। এর কারণ স্ত্রী পাখী যেন অন্য পাখীর সাথে বেরিয়ে যেতে না পারে। পুরুষ পাখীটি খাবার সময় হলে স্ত্রী পাখীর ঠোঁটে খাবার দিয়ে যায়। আর লাজুক তাদের বন্ধু ফিঙে পাখী কাছাকাছি বাসা তৈরি করে। কেননা ফিঙে পাখী কাক চিল ইত্যাদি পাখিদের ঘেসতে দিতো না। আবার অনেক পাখী আছে যারা বাসা তৈরির কাজটা যেমন তেমন করে সারে। তারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলে খড়কুটো জোগাড় করে কোন রকমে বাসা তৈরি করে। কাকেরা অবশ্য লাইট পোষ্টে তার দিয়ে বাসা তৈরি করতে পছন্দ করে।

আবার চড়ুই পাখীরা বাড়ির ঘুলঘুলিতে বাসা তৈরি করে। তবে বাসার ধার ধারেনা। পাপিয়া পাখী ডিম পাড়ে ছাতার পাখীর বাসায়। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে এতো সবারি জানা আছে।

আঁচড় থেকে শুরু

রবার্ট শেক্‌লি

অনুবাদ: অনীশ দেব

কাল রাতে একটা ভারি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে শুনলাম কে যেন আমাকে বলছে, 'আগের স্বপ্নটায় বাধা দেবার জন্য দুঃখিত, কারণ আমি একটা জরুরি সমস্যায় পড়েছি। শুধু আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

স্বপ্নের মধ্যেই আমি উত্তর দিলাম, 'দুঃখিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আগের স্বপ্নটা সেরকম ভাল কিছু ছিল না। তাছাড়া যদি কোনওভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি—'

'একমাত্র আপনিই পারেন সাহায্য করতে', অজানা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'আর তা যদি না করেন তাহলে আমি, আমাদের সমস্ত লোকজন—সবাই একেবারে শেষ হয়ে যাবো।'

'সর্বনাশ', আমি বললাম।

নাম তার ক্রোকা। অতি প্রাচীন এক জাতির সদস্য সে। স্মরণাতীত কাল থেকে ওরা বসবাস করছে এক প্রশস্ত উপত্যকায়। তার চারদিক অতিকায় পর্বতমালায় ঘেরা। ওরা শান্তিপ্রিয় লোক। কালক্রমে ওদের মধ্যে থেকে কয়েকজন অসাধারণ শিল্পীও জন্ম নিয়েছে। ওদের আইন-কানুন আদর্শ। ছেলেমেয়েদের ওরা ভালবাসা দিয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়ে লালনপালন করে। অবশ্য ওদের দু-চারজনের মধ্যে মাতলামির প্রবণতা দেখা গেছে, আর কালেভদ্রে খুনীর সন্ধানও ওরা পেয়েছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও ওরা যথেষ্ট ভাল সম্মানীয় সচেতন জাতি। ওদের—

আমি বাধা দিলাম: 'দেখুন, সরাসরি ওই জরুরি সমস্যাটার কথা বললে হত না?'

ফেনিয়ে বলার জন্য ক্রোকা ক্ষমা চাইল। বিশদ ব্যাখ্যা করে বলল যে ওদের দুনিয়ায় আবেদন করার প্রচলিত রীতিই হল আবেদনকারীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে সুদীর্ঘ একটি বিবৃতি পেশ করা।

আমি ওকে বললাম. 'ঠিক আছে, এবারে কাজের কথা বল।'

একটা গভীর শ্বাস নিয়ে ক্রোকা শুরু করল। ও বলল যে প্রায় একশো বছর আগে 'ওদের হিসেব অনুযায়ী) আকাশ থেকে প্রকাণ্ড এক লালচে-হলুদ দণ্ড নেমে আসে

ওদের তৃতীয় বৃহত্তম শহরে। এই শহরের দরবার কক্ষের সামনে 'অজানা দেবতা'র মূর্তি রয়েছে। সেই মূর্তির খুব কাছে নেমে এসেছিল দণ্ডটা।

দণ্ডটার চেহারা মোটামুটি নলের মতো বলা যায়, আর তার ব্যাস ছিল প্রায় দু-মাইল। ওদের মাপজোখের যন্ত্রপাতি বা প্রাকৃতিক সূত্রের নাগাল ছাড়িয়ে ওটা উঠে গিয়েছিল অনেক ওপরে। ওরা বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখল যে ঠাণ্ডা, গরম, জীবাণু, প্রোটন কণার আঘাত, কোনও কিছুতেই দণ্ডটার কিছু হয় না। সুতরাং অবিচল আশ্চর্যের মতো ওটা ঠিক পাঁচ মাস ঊনিশ ঘণ্টা ছ'মিনিট দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বিনা কারণেই দণ্ডটা উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিক বরাবর নড়তে শুরু করল। ওটার গড় বেগ ছিল ঘণ্টায় ৭৮.৮৮১ মাইল (ওদের হিসেব অনুযায়ী)। তারপর ১৮৩.২২৩ মাইল লম্বা ২.০১১ মাইল চওড়া একটা গর্ত কেটে দিয়ে দণ্ডটা উধাও হয়ে গেল।

এই ঘটনা সম্পর্কে প্রথম সারির বিজ্ঞানীরা আলোচনা চক্রে বসলেন, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। অবশেষে তাঁরা ঘোষণা করলেন, এই ঘটনা ব্যাখ্যার বাইরে, অদ্বিতীয়, এবং আর কখনও হবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু মাসখানেক পরেই আবার একই ঘটনা ঘটল। এবারে রাজধানীতে। দ্বিতীয়বারে দণ্ডটা এলোমেলোভাবে মোট ৮২০.৩৩১ মাইল ঘুরে বেড়াল। এর ফলে কী পরিমাণ সম্পত্তি যে নষ্ট হল তার কোনও হিসেব নেই, আর মারা গেল কয়েক হাজার লোক।

দু-মাস এক দিন পরে দণ্ডটা আবার ফিরে এল। এবারে তিনটে প্রধান শহরই ক্ষতিগ্রস্ত হল।

ইতিমধ্যে সকলেই বুঝতে পেরেছে—কোনও অজ্ঞাত ঘটনার ফলে শুধু যে প্রত্যেকের জীবন বিপন্ন, তা নয়, গোটা সভ্যতা, জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

চতুর্থ আঘাতটা এল রাজধানীর পুব দিকের পতিত জমির ওপরে। সত্যিকারের ক্ষতি বলতে যা বোঝায় তার পরিমাণ এবারে হল খুবই কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণ আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ল, বহু লোক আত্মহত্যা করল।

পরিস্থিতি দাঁড়াল মারাত্মক। সুতরাং বিজ্ঞানের পাশাপাশি এবার লড়াইয়ে নামল অপবিজ্ঞান। কোনও সাহায্যকেই অবজ্ঞা করা হল না, কোনও তত্ত্বকেই উড়িয়ে দেওয়া হল না—তা সে জৈবরসায়নবিদ হোক, জ্যোতিষী হোক, আর জ্যোতির্বিদই হোক। এক ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের রাতে সুন্দর প্রাচীন শহর রাজ ও তার দুটি শহরতলী এলাকা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর নিতান্ত উদ্ভট কোনও তত্ত্বকেও আর অবহেলা করা গেল না।

আমি বললাম, 'মাপ করবেন। আপনাদের এত সব ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে বলে দুঃখিত, কিন্তু এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'সে-কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, 'কণ্ঠস্বর বলল।'

'তাহলে বলুন', আমি বললাম, 'তবে আমি একটু জলদি করার পরামর্শ দেব। তা নইলে মনে হচ্ছে আমি বোধহয় শিগগিরই ঘুম ভেঙে জেগে উঠব।'

ফ্লোকা আবার বলতে শুরু করল, 'এ-ঘটনায় আমার ভূমিকা বুঝিয়ে বলা একটু শক্ত। আমার পেশা হল সার্টিফায়েড পাবলিক অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। কিন্তু নেশা হিসেবে আমি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার প্রসারের নানা পদ্ধতি নিয়ে চর্চা করি। সম্প্রতি আমি "কোলা" নামের একটি রাসায়নিক যৌগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলাম। কোলার ব্যবহারে প্রায়ই গভীর অন্তর্দৃষ্টির দরজা খুলে যায়—

'আমাদেরও একই ধরনের পানীয় রয়েছে', ওকে বললাম।

'তাহলে তো আপনি বুঝতে পারবেন! যাই হোক, ওই ভেসে যাওয়া অবস্থায়—আপনারা কি এইরকম ভাবে বলেন? মানে, কোলার প্রভাবে আচ্ছন্ন অবস্থায় আমার এক উপলব্ধি হল, এক গভীর উপলব্ধি একে ব্যাখ্যা করে বোঝানো খুব শক্ত।'

আমি অধৈর্যভাবে ওকে বললাম, 'বলুন, আসল কথায় তাড়াতাড়ি আসুন—'

তখন কণ্ঠস্বর বলল, 'ঠিক আছে। আমি বুঝতে পারলাম যে আমাদের দুনিয়ার অস্তিত্ব রয়েছে নানা স্তরে—যেমন পারমাণবিক, উপ-পারমাণবিক, কম্পনের স্তরে। এই রকম অস্তিত্বের অসংখ্য স্তর। তবে এর সবগুলোই আবার অস্তিত্বের অন্যান্য স্তরের অংশ।'

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'জানি। আমাদের পৃথিবী সম্পর্কেও একই ধরনের ব্যাপার আমি সম্প্রতি টের পেয়েছি।'

ফ্লোকা বলে চলল, 'সুতরাং স্পষ্ট বুঝলাম, আমাদের অস্তিত্বের কোনও একটা স্তরে কেউ গোলমাল করেছে।'

'আর একটু পরিষ্কার করে বলা যায়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার ধারণা হল আমাদের দুনিয়ায় আণবিক স্তরে কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে।'

'উদ্ভট। তবে অনধিকার প্রবেশের জন্য কে দায়ী সেটা কি বুঝতে পেরেছেন?'

'বোধহয় পেরেছি', কণ্ঠস্বর বলল, কিন্তু কোনও প্রমাণ নেই। এর পুরোটাই অনুমান ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সংকেত।'

ওকে বললাম, 'ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ব্যাপারটা আমিও বিশ্বাস করি। বলুন কী বুঝতে পেরেছেন?'

একটু ইতস্তত করে কণ্ঠস্বর বলল, 'ইয়ে, মানে, আমি বুঝতে পেরেছি ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে আমাদের দুনিয়া হল আপনার শরীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু।'

'খোলাখুলি বলুন।'

'ঠিক আছে! আমি আবিষ্কার করেছি যে অস্তিত্বের একটি স্তরে আমাদের দুনিয়ার অবস্থান হল আপনার বাঁ হাতের মধ্যমা ও অনামিকার খাঁজে। আমাদের হিসেব অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ বছর ধরেই এর অস্তিত্ব রয়েছে -- আপনাদের কাছে এই সময়টা হয়ত কয়েক মিনিট মাত্র। আমি অবশ্য প্রমাণ-টমান কিছু দিতে পারব না, আর আপনাকে কোনও দোষও আমি দিচ্ছি না'

'ঠিক আছে। আপনার কথা অনুযায়ী আপনাদের জগৎ রয়েছে আমার বাঁ হাতের মধ্যমা আর অনামিকার খাঁজে। তো আমি তার কী করতে পারি?'

'না, মানে, আমার আন্দাজ হল সম্প্রতি আপনি হয়ত ওই জায়গাটা আঁচড়াতে শুরু করেছেন।'

'আঁচড়েছি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তাহলে আপনার ধারণা ওই প্রকাণ্ড বিধ্বংসী লালচে দণ্ড হল আমারই কোনও একটা আঙুল?'

'নিখুঁত বলেছেন।'

'আপনি আমাকে আঁচড়ানো বন্ধ করতে বলছেন?'

'শুধু ওই জায়গাটুকু', কণ্ঠস্বর তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'বুঝতে পারছি, এরকম অনুরোধ করা রীতিমতো অস্বস্তিকর। কিন্তু আমাদের জগৎকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে এ অনুরোধ না করে উপায় কী! আমি ক্ষমা চাইছি—'

'ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই', আমি বললাম, 'সচেতন প্রাণীদের কোনও কিছুতেই লজ্জা পাওয়া উচিত নয়।'

'আপনি মহানুভব', কণ্ঠস্বর বলল, 'আমরা তো মানুষ নই, জীবাণু। তাছাড়া আপনার ওপরে কোনও দাবিও আমাদের নেই।'

আমি ওকে বললাম, 'সব সচেতন প্রাণীদের একজোট হয়ে থাকা দরকার। কথা দিচ্ছি, বাঁ হাতের তর্জনি আর মধ্যমার মাঝের জায়গাটা আমি জীবনে আঁচড়াবো না।

'না, মধ্যমা আর অনামিকার মাঝে', ফ্লোকা আমাকে মনে করিয়ে দিল।

'বাঁ হাতের কোনও আঙুলের খাঁজেই আমি আর আঁচড়াবোনা! জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার এই শপথের কোনওরকম নড়চড় হবে না।'

'আপনি আমাদের জগৎকে বাঁচালেন। ধন্যবাদ দিয়ে এ-ঋণ শোধ করার নয়, তবুও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।'

'না, না, ঠিক আছে।'

কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল এবং আমি জেগে উঠলাম।

স্বপ্নটার কথা মনে পড়তেই আমি ব্যান্ড এইড নিয়ে বাঁ হাতের আঙুলের খাঁজগুলোর ওপরে লাগিয়ে দিলাম। ওই জায়গায় অনেক অস্বস্তি আমি সহ্য করেছি। এমন কি বাঁ হাতটা ধুইনি পর্যন্ত। সারাটা দিনই ব্যান্ড এইড লাগানো থাকে।

সামনের সপ্তাহের শেষে ব্যান্ড এইড খুলে ফেলব। আমার ধারণা তাতে ওদের হিসেবে দু-তিন হাজার কোটি বছর পেরিয়ে যাবে। এ-সময়টা যে কোনও জাতির পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু আমার সমস্যা তা নয়। আমার সমস্যা হল, সম্প্রতি সান আন্দ্রিয়াস চ্যুতি বরাবর যে-সব ভূমিকম্প হয়ে গেল, বা মধ্য-মেক্সিকোর ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরিগুলো নতুন করে যে আবার অগ্ন্যুৎপাত শুরু করল এ-সম্পর্কে কেমন যেন অস্বস্তিকর কু-ডাক ডেকে উঠছে মনটা। মানে, সবকিছুর বোধহয় একটা মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এতে বেশ ভয় হচ্ছে আমার।

সুতরাং, শুনুন, আপনার আগের স্বপ্নটায় বাধা দেবার জন্য মাপ চাইছি, কিন্তু আমি এক জরুরি সমস্যায় পড়েছি। একমাত্র আপনিই পারেন আমাকে সাহায্য করতে··

* রচনাকাল : ১৯৫৩। মূল গল্প : স্টার্টিং ফ্রম স্ক্র্যাচ।

জোনাকি : বাবুই পাখির টুনি বাল্‌ব্‌

এবার বর্ষা হচ্ছে খুব তেড়েফুঁড়ে। এরপর আসবে শরৎ। আকাশ হয়ে যাবে পরিষ্কার। আকাশে জ্বলজ্বল করবে অনেক তারা। আর এই শহরের বাইরে শহরতলী গ্রামাঞ্চলের ঝোপঝাড়ে গাছের মাথায় জ্বলবে নিভবে হাজার টুনি বাল্‌ব্‌। ওগুলো কি? তোমরা সবাই জানো। এগুলি হলো জোনাকি। রাশি রাশি আগুনের যেন হরির লুট। কিন্তু জোনাকি কোত্থেকে পায় এই আলো?

এই আলো তৈরী হবার উৎস হচ্ছে এক ধরণের আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া। জোনাকির ছোট্ট শরীরের পেছন দিকে থাকে লুসিফারিন নামে একটি প্রোটিন যৌগ। সঙ্গে থাকে লুসিফারেজ নামে একটি এনজাইম। এই লুসি-ফারেজ বায়ুর অক্সিজেনকে সঙ্গে নিয়ে লুসিফারিনকে ডি হাইড্রোলুসিফারিনে জারিত করে দেয়। নতুন তৈরী হওয়া এই যৌগের শক্তির পরিমাণ খুব বেশী হয় বলে অনেকটা শক্তিই আলোর আকারে বেরিয়ে যায়। এই জন্যে আমরা জোনাকির আলো দেখি।

ইলশেগুঁড়ি ইলশেগুঁড়ি ইলিশ মাছের ঝোল

এখন সময়টা ইলিশ মাছের। ইলিশ ভাতে, দই ইলিশ আরও কত কি। জিভেতে জল আসেই। কিন্তু খেতে আর পারি কই। মাছ আর তেলের যা দাম! সবাই নিশ্চয়ই জানো ইলিশ কোথায় পাওয়া যায়। গঙ্গা, পদ্মা রূপনারায়ণে। তবে কি ইলিশ মিষ্টি জলের মাছ? না। তবে এই সব নদীতে ইলিশ এলো কোত্থেকে? ইলিশ আসলে ভারত মহাসাগরের মাছ। ডিম পাড়ার সময়ে কিছু মাছ গঙ্গা পদ্মার মোহানা দিয়ে ঢোকে আমাদের দেশে। আর কিছু মাছ চলে যায় বেড়াতে বেড়াতে সিন্ধুনদে। আর আমরাতো, সে যে পারেরই বাসিন্দা হই না কেন, ওৎ পেতে বসে থাকি তাকে ধরবার জন্যে। বেচারারা ধরাও পড়ে যায়।

ধারে কাটে না ভারে কাটে

ধারে কাটে না ভারে কাটে? আসলে কিন্তু ধার আর ভার কেউ কাউকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। ধরো এক টুকরো লোহা। লোহার অণুগুলি নিজেদের মধ্যে বন্ধন তৈরী করে তবেইতো একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে থাকে। এইবার এই লোহার টুকরোর কোন অংশে যদি এমন চাপ দিতে পারি যে বন্ধনের জোরের চেয়েও চাপের জোর বেশী তবে লোহার টুকরোটি ভাঙ্গতে বাধ্য। হাতে কি আর আমরা লোহা কাটতে পারি? কোন কিছুই কি কাটা যায়? ছুড়ি, কাঁচি, ব্লেড—এসবতো চাই ই। জানোতো তোমরা, কাকে বলে চাপ? প্রযুক্ত বলকে যেটুকু জায়গার

মধ্য দিয়ে আমরা প্রয়োগ করছি তা দিয়ে যদি ভাগ করি তবেই চাপের মান পাই। এখন মনে রেখো, ঐটুকু জায়গার মান যতো কমিয়ে আনা যাবে, ততোই চাপের পরিমানও বেড়ে যাবে। এই যে ছুড়ি কাঁচি ব্লেডের ধার এতো পাতলা করা হয়, এতো এজন্যেই। একটু জায়গা জুড়ে বল প্রয়োগ হল। আর চাপের মানও গেলো অনেক বেড়ে। ছুড়ি কাঁচি ভোঁতা হয়ে গেলে ধার দেবার মানে কি বলতো? মানে হলো একটাই, ধারকে পাতলা করো আর প্রযুক্ত বলের ক্ষেত্রফলের মান কমিয়ে দাও। অবশ্যই চাপ যাবে বেড়ে। ছুড়ির চেয়ে ব্লেডের ধার অনেক বেশী হয় কেন? এজন্যেইতো।

আর্কিমিডিস কি মিথ্যে ?

আর্কিমিডিসের নাম আমরা সবাই জানি। 'ইউরেকা ইউরেকা' তো আমরা প্রায়ই বলি। একটা সমস্যার সমাধান করতে পেরে আনন্দিত আর্কিমিডিসইতো বলতে বলতে যাচ্ছিলেন, ইউরেকা, ইউরেকা। আর্কিমিডিসের সূত্রওতো আমাদের ছোটবেলাতেই পড়তে হয়। কি বলেছেন তিনি? কোন বস্তুকে তরলে ভাসিয়ে দিলে তখনই ভাসবে যখন ঐ বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ভর বস্তুর ভরের চেয়ে বেশী হবে। একটি ছোট্ট ছুঁচের কথা ভাবোতো। ছুঁচেরতো ডুবে যাওয়ারই কথা। কিন্তু একটি শুকনো ছুঁচকে খুব সাবধানে তুমি জলের উপর রাখ, দেখবে ছুঁচটি দিব্যি ভেসে আছে। আর্কিমিডিস কি ভুল তবে? ব্যাপারটা আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। এখানে পৃষ্ঠটান বলে একটি বিষয় কাজ করছে। পৃষ্ঠটান হল তরলের একরকমের ধর্ম। ছুঁচতো নিজের ভরের জন্য নীচের দিকেই যেতে চাইবে অর্থাৎ ডুবে যেতে চাইবে। কিন্তু পৃষ্ঠটানের জন্য ছুঁচের ভর ও পৃষ্ঠটান এই দুইয়ে মিলে এমন পরিস্থিতি তৈরী করবে যে ছুঁচকে ডুবে যাওয়ার উপায় নেই, ভেসে থাকতেই হবে। তবে মনে রেখো, খুব সাবধানে ছুঁচটিকে জলে ভাসাতে হবে কিন্তু।

লাল নীল সবুজ হলুদ···

লাল নীল সবুজ হলুদ কালো সাদা। আমাদের চারপাশে মনমাতানো নানা রঙের বাহার। বাহারের এই বাহাদুরী —আসে কেমন করে? কেন কেউ লাল, কেউ সাদা, কেন কেউ সবুজ, কেউ হলুদ। একটু তলিয়েই দেখা যাক ব্যাপারখানা।

সব পদার্থের অণুগুলিই এমন যে তাদের প্রত্যেকের শক্তির ধাপ থাকে। চলতি কথায় আমরা যাকে বলি - আনবিক শক্তির ধাপ। যখন কোন পদার্থের উপর সাদা আলো পড়ে তখন তার মধ্যে কতগুলো নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলো শোষিত হয় এবং অণুগুলি মই বেয়ে উপরে ওঠবার মতো উচ্চতর শক্তির ধাপে উঠে যায়। এখন যে আলো শোষিত হল, তার পরিপূরক আলোটিই ঐ পদার্থের বর্ণ হবে। কাকে বলে পরিপূরক আলো? যে দুটো আলো মেশালে সাদা হয়, এরা হল পরস্পরের পরিপূরক আলো। নিউটনের বর্ণ চাকতি থেকে কোন রঙের কে পরিপূরক— সহজে বুঝা যায়। নিউটনের চাকতিতে একটি রঙের পরিপূরক রঙ মোটামুটি ভাবে উল্টোদিকে থাকে। এখন এমন যদি হয় যে কোন পদার্থ সবগুলো আলোকেই শুষে নেয়, কোন রঙই বেরিয়ে আসে না, তখন তার রঙ হয় কালো। আর যদি সব আলোই বেরিয়ে যায় কেবল অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে, তার রঙ হয় সাদা।

ধরা যাক - আলো শোষণ করল কোন পদার্থ। কি হবে? পদার্থের অণুগুলি উচ্চতর শক্তির ধাপে উঠে যাবে। উপরে উঠে গেলে একবার, নেমে আসতে সাধারণতঃ $১০^{-৮}$ সেকেণ্ডের মতো সময় লাগে। দু'ভাবে নামতে পারে। প্রথমতঃ তাপ বের করে দিয়ে নেমে আসতে পারে। কোন আলো বেরোবে না। অথবা আলো হিসাবেই বেরিয়ে আসতে পারে। এই বেরিয়ে আসা আলোর কম্পাঙ্ক শোষিত আলোর কম্পাঙ্ক থেকে সব সময়েই কিছুটা কম হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করতে চাইছি।

ভিটামিন-বি, যার অপর নাম রাইবোফ্লেভিন, নীল আলো শোষণ করে। নীলের পরিপূরক আলো হলুদ। তাই ভিটামিনের এমনিতে রঙ হল হলদে। নীল রঙ শোষিত হবার পর যখন নীচের দিকে নামে, সবুজ রঙ বিকিরণ করে। এই ঘটনাকে আমরা বলি ফস-ফোরেসেন্স। কাজেই ভিটামিন-বিকে তখন সবুজাভ হলদে দেখায়।

—সৈয়দ সাজ্জাদ জাহির আদনান

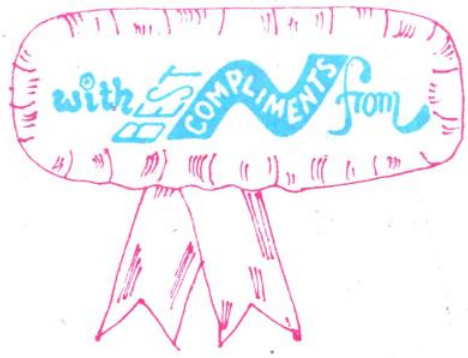

ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED

40, STEPHEN HOUSE

4, B B D BAG (EAST)

CALCUTTA—700 001 (INDIA)

TEL : 207008/09, 284071/72

TLX : 21—3112 ECL IN

FAX : 33-281803

CABLE : GRINDMEDIA